উৎসর্গ

যে মহাত্মার আবির্ভাবে, বঙ্গের জমিদার-সংসারে রাজাদর্শ উচ্চগ্রামে
আরোহণ করিয়াছে,—যাহার ব্যবহারে—সম্পদ, শীলতা ও শিষ্টাচারে
অলঙ্কৃত হইয়াছে,—যাহার সমাদরে—কমলালয়ে, বীণা-
পাণির মধুর গুঞ্জন নূতন ঝঙ্কার তুলিয়াছে,—
যাহার সেবায় নরদেবতা বিদ্যাসাগরের
দানধর্ম্ম উত্তম আশ্রয় লাভ করিয়া
ধন্য হইয়াছে,—যাহার
স্নেহদৃষ্টিপাতে,
প্রজাকুল

অন্নজল

পাইয়া নিশ্চিন্ত
হইয়াছে—যাহার উদ্যম ও
অর্থব্যয়ে দেশের শিল্প-সম্ভার নিত্য
নূতন উন্নতি লাভে, জাতীয় ধন সম্পদ
বৃদ্ধি করিতেছে,—যাহার ধর্ম্মাচরণ ও ন্যায় বিচারে
কাশিমবাজার রাজসংসারের পূর্ব্ব গৌরব সুরক্ষিত ও
বর্দ্ধিত হইতেছে; সেই সহৃদয় দীনবৎসল বরেণ্যপুরুষ বিদ্যারঞ্জন
মাননীয় মহারাজ **শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্রের** কমল-করে এই গ্রন্থ
সম্মানে সমর্পণ করিলাম। শ্রদ্ধাবনত গ্রন্থকার।

বক্তব্য

"অদৃষ্ট-লিপি" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। আমার রচিত গ্রন্থ-নিচয়ের মধ্যে এইখানি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছে। অর্থাৎ "কমলকুমার" নামক হিন্দু গার্হস্থ্য ও সমাজ জীবনের চিত্রাঙ্কিত উপন্যাস খানি প্রকাশিত হওয়ার পরেই ইহার সূচনা। সুতরাং বহু পূর্ব্বে ইহার ভূমিষ্ঠ হইবার কথা ছিল। তাহা হয় নাই। অনন্তাবিঘ্ন নিবন্ধন অদ্ধ মুদ্রিত ও অসম্পূর্ণ আকারে ইহা পড়িয়াছিল।

পরে ১ম বৎসরের "বিজয়া" নামক মাসিক পত্রিকায় সম্প্রতি ইহার অধিকাংশ খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু সমগ্রভাগ "বিজয়া"তে প্রকাশিত হয় নাই। যে শেষাংশে গ্রন্থোক্ত চরিত্র সকলের পূর্ণ পরিস্ফুটন সাধিত হইয়াছে, সে অংশ "বিজয়া"তে প্রকাশ করিবার অবসর ও সুযোগ ঘটে নাই। আপাততঃ ইহা পূর্ণ কলেবরে আমার পাঠক মণ্ডলীর করে অর্পণ করিতেছি।

আমাদের দেশের নাতিপ্রাচীন সমাজ, সে সমাজের রীতি নীতি, আচার আচরণ কিরূপ ছিল, আর সে গুলি সে পল্লীজীবন, সে পল্লী সমাজরূপ বঙ্গের অমূল্য সম্পদ, ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে, আধুনিক সমাজের কোন্ স্তরে শয়ন করিল, কে কোন্‌টিকে গ্রাস করিল, তাহার আভাস পাঠক গ্রন্থে পাইবেন। সে কালের ও এ কালের মানুষে কত প্রভেদ, তাহাও দেখিতে পাইবেন।

গ্রন্থোক্ত নায়িকা দ্বয়ের জ্যেষ্ঠার আত্মরক্ষার ভীষণ সংগ্রাম, তাহার চরিত্রের সূক্ষ্মতর রেখা গুলি পর্য্যান্ত টানিয়া বাহির করিয়াছে।

আমি মনে করি, হিন্দুনারী, নারীধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারাকেই জীবনের পরম তপস্যা—মহাব্রত বলিয়া মনে করেন, আর প্রয়োজন হইলে, সেই মহামূল্য সম্পদ রক্ষার জন্য অবস্থানুসারে কি বাচনিক কি কার্য্যগত কৌশল অবলম্বনেও পশ্চাৎপদ নহেন, ইহা তাঁহার ধর্ম্ম। বিবিধ লুপ্ত গৌরবের ধ্বংসাবশেষের অন্তরালে হিন্দুর এই পরম সম্পদ এখনও সুরক্ষিত, তাই মনে হয়, যদি এ জাতি পুনর্ব্বার গৌরবমার্গে পদার্পণ করে, তবে সে কেবল ঐ পূতচরিত্রা ও চিরবন্দনীয়া হিন্দুনারীর শুভদৃষ্টি ও শুভাশীর্ব্বাদের ফল বলিয়া বাঙ্গালী জাতি যেন অনুভব করিতে শিখে। তাহা হইলেই এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইবে।

আর এক কথা, বর্ত্তমান সময়ে ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদাজ্ঞান ও আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির পরম সম্পদ। গ্রন্থোক্ত বালক নায়ক চিত্তরঞ্জন, সুকৃতিবশে সেই বরণীয় ইংরাজের স্নেহের আশ্রয়ে ধীরে ধীরে কিরূপ বিকাশ লাভ করিল, গ্রন্থকার তাহা তাঁহার সমালোচক ও পাঠক মহাশয়দের নিকট জানিবার অপেক্ষায় রহিলেন।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪১ শিবনারায়ণ দাসের লেন,
কলিকাতা।
তারিখ ৩২ আষাঢ় সন ১৩২১।

অদৃষ্ট-লিপি

প্রথম পরিচ্ছেদ

গঙ্গার ঘাটে

শ্রাবণের প্রথম ভাগ। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। অমাবস্যার রাত্রি, অন্ধকার ঘন হইতে ঘনতর হইয়া আসিতেছে। বর্ষার ঢল নামিয়াছে। ভাগীরথীর জলরাশি উভয়কূল ভাসাইয়া, মৃদুমধুর তরঙ্গাঘাতে শ্রুতিমধুর সুস্বর উঠাইয়া, প্রবল স্রোতে নৃত্য করিতে করিতে তীরবেগে ছুটিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন কাহারও উদ্দেশে ছুটিয়াছে। বাধাবিঘ্ন মানা নাই, সম্মুখে যাহা পড়িতেছে তাহাই ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দূরে ও নিকটে নৌকার ক্ষেপণি-শব্দ ও ক্বচিৎ মানবকণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে। একে বর্ষার ঢলের জল, তাতে ভাঁটা, তাই জলস্রোতঃ প্রবলতর বেগ ধারণ করিয়াছে। রাত্রি ১১টার পর জোয়ার আসিবে, বাণও ডাকিবে, তাই পূর্ব্ব হইতে লোক সাবধান হইতেছে।

এমন সময়ে একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক একাকী বারাকপুরের বারাণসী ঘোষের ঘাটের একপ্রান্তে বসিয়া আছে। বহুক্ষণ ধরিয়া ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে জাহ্নবীর কূলে বসিয়া সে কি চিন্তা করিতেছে। বালক শীর্ণদেহ হইলেও, মনোযোগ সহকারে তাহাকে দেখিলে, দেখা যাইত, তাহার মুখখানি বড়ই সুন্দর—আরও দেখা যাইত, তাহার সে সুগঠিত মুখমণ্ডল নিরাশায় ম্রিয়মাণ, গভীর ঘন বিষাদরাশি সে মুখে বিদ্যমান, তাহার দুঃখে ও অভিমানে জলভারাক্রান্ত চক্ষু দু'টী রজনীর অন্ধকারে লুক্কায়িত। অনাদি অনন্ত সৃষ্টিরাজ্যে তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও গতির কোন পরিচয় সে অভাগা বালক জানিতে পারে না—বুঝিতেও পারে না। তাহার ভবিষ্যৎ ঘন তমসাচ্ছন্ন, অতীত আবর্জ্জনাপূর্ণ কালের ক্রোড়ে লুক্কায়িত, বর্ত্তমান অনির্দ্দিষ্ট, চঞ্চল ও দুঃখপূর্ণ। তাই সঞ্চিত জলরাশি নয়নপ্রান্ত অতিক্রম করিয়া ধারায়—ক্রমে স্রোতে পরিণত হইল। বালক বহুক্ষণ নীরবে এইভাবে বসিয়া রোদন করিল, কিন্তু কেন কাঁদিল, কাদিয়া কি হইবে, তাহার কিছুই সে বুঝে না। কেবল বুঝে না, তাহা নহে, ইহাও বুঝে যে, তাহার এ অশ্রুজল দেখিবার, দেখিয়া মুছাইবার ও তাহাকে শান্ত করিবার কেহ এ সংসারে নাই!

বালকের ইহাই মর্ম্মান্তিক দুঃখ। সংসারে মানুষের একটা না একটা বন্ধন থাকে; বালকের কোন বন্ধনই নাই। যাহার কেহ নাই, সংসারে এমন ব্যক্তিও, একটা বিড়াল, না হয় একটা কুকুরের প্রতিপালন ভার লইয়া তৃপ্তিলাভ করে; এ বালকের তাহাও নাই। আজ এই অল্পক্ষণ পরে যে বাণ ডাকিবে, সেই তরঙ্গ-মুখে আত্মবিসর্জ্জন করিলে, নিবারণ করিবার, 'আহা' বলিবার, বা এক ফোটা চক্ষের জল ফেলিবার কেহ নাই। কিন্তু তবুও কি দুর্লক্ষ্য সূত্র, অলক্ষিতভাবে বালককে সংসারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহা সে বুঝে না। অনেকবার প্রাণের পর্দ্দা তুলিয়া হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে লুক্কায়িত ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু

সে মর্ম্মগাথা শত খণ্ডে—সহস্র খণ্ডে ছিন্ন, তাহা একত্র করা এবং একত্র করিয়া তাহা হইতে অর্থ সংগ্রহ করা, বালকের সাধ্যায়ত্ত নহে—বালক কেন, কোন প্রবীণ ব্যক্তির পরিণত বুদ্ধিবৃত্তিরও অতীত। তাই বালক দীর্ঘনিঃশ্বাসভরে "হা ভগবান" বলিয়া নদীতট প্রতিধ্বনিত করিয়া অশ্রুমোচন করিল।

বালক যখন বিধাতার নাম লইয়া, অশ্রুমোচন করিয়া, অমাবস্থার ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তখন, সেই নিবীড় জলদজাল ভেদ করিয়া চঞ্চলা চপলা ধরাকে আলোকিত, চমকিত ও চমৎকৃত করিয়া তুলিল। সেই তীব্র আলোকে বালকের চক্ষু ঝলসিয়া গেল, দৃষ্টিশক্তি রোধ হইল। বালক তাকাইতে অসমর্থ হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। কিন্তু তাহার বোধ হইল যেন, সে শুভ্রালোকে তাহার প্রাণের ভিতরটা পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া গিয়াছে। আর তাহার প্রাণের ভিতরে অসীম আলোক-গোলকের মধ্যস্থলে এক দিব্যকান্তি, পক্ককেশ ঋষিমূর্ত্তি প্রকাশিত, পরিধানে পট্টবস্ত্র, গলায় শুভ্রসুন্দর উপবীত ও উত্তরীয়। শুভ্র শ্মশ্রু ও গুম্ফে সুন্দর বদনমণ্ডল শোভিত। বৃহদায়তন নয়নদ্বয় হইতে যেন বিজলী বিনির্গত হইতেছে। প্রশস্ত ললাটে যেন যুগযুগান্তরের চিন্তার রেখাপাত হইয়াছে। সে মূর্ত্তির বামহস্তে কমণ্ডলু ও দক্ষিণ হস্তে দেহ অতিক্রম করিয়া ত্রিশূল উঠিয়াছে। সেই বিরাট মূর্ত্তি তীক্ষ্ণ অথচ স্থির ধীর দৃষ্টিতে বালকের দিকে তাকাইয়া ইঙ্গিতে যেন বলিলেন, "বৎস! শান্ত হও।" সেই বিস্ময়কর বিরাটমূর্ত্তি এইমাত্র ইঙ্গিত করিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন ও অদৃশ্য হইলেন। পশ্চাৎ ফিরিতে বোধ হইল যেন, তাঁহার উত্তরীয়ের গাত্রে আলোক-রেখায় লেখা আছে "বেদাচার্য্য নাম, বারাণসী ধাম।" বালকের অন্তর্দৃষ্টিতে এই তত্ত্বটুকু পতিত হইতে না হইতে সকলই অন্ধকার হইয়া গেল। বালক ভয়ে, বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া, যখন ভিতরে বাহিরে অন্ধকার দেখিল, তখন

তাহার শরীর কণ্টকিত—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রোমাঞ্চ হইতেছে, প্রবল বেগে শোণিত সঞ্চারিত হওয়াতে, বক্ষের বামভাগে ঘন ঘন আঘাত অনুভব করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর উত্তপ্ত ও উত্তেজিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অঙ্গীকারে

এক ফোটা দু' ফোটা করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। বড় বড় ফোটা। অনাবৃত মস্তক ও পৃষ্ঠে এক ফোটা দু' ফোটা করিয়া অনেক জল পড়িল। মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ সিক্ত করিল। ক্রমে পরিধেয় আর্দ্র হইতে যায় দেখিয়া, বালক আস্তে আস্তে উঠিল। মুখে কেবল "বেদাচার্য্য নাম, বারাণসী ধাম।" বার বার এই কথা বলিতে বলিতে বালক ঘাটের উপর উঠিয়া ঠাকুরবাড়ীর বারাণ্ডায় গিয়া উপবেশন করিল। সেই ঠাকুরবাড়ীর চারিদিকে শিবের মন্দির। এখানে দেবসেবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন। তিনি ঐ দেবালয়ের পার্শ্বের এক গৃহে সপরিবারে বাস করিয়া থাকেন। দুর্য্যোগের লক্ষণ দেখিয়া, তাঁহারা সন্ধ্যার পরেই সকল কাজ শেষ করিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। বালক গিয়া ঠাকুরবাড়ীর বারাণ্ডায় বসিতে না বসিতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রিতে বালক একাকী সেই জনশূন্য দেবালয়-প্রান্তে গিয়া উপবেশন করিল। নির্ভীকহৃদয় বালক, এই অন্ধকার—এই মেঘগর্জ্জন ও বৃষ্টি—

এই জনশূন্যতা গ্রাহ্য করিল না। দেবালয়ের দক্ষিণ দিকের মন্দিরপ্রান্তে শ্মশান ঘাট, উত্তর দিকের মন্দিরপ্রান্তে বন। বৃহৎ বনখণ্ড বহুদূর ব্যাপিয়া গঙ্গার তীরভাগ অধিকার করিয়াছে। শ্মশানের শৃগালগুলি দিনের বেলায় ঐ বনের মধ্যে নিরাপদে বাস করে, রাত্রিকালে খাদ্যান্বেষণে বাহির হইয়া শ্মশানবাসী কুকুরগুলির সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয়। এই তীক্ষ্ণধার বারিপাতেও তাহাদের বিরাম নাই, ইতস্ততঃ ছুটাছুটী ও কলহ করিতেছে। কলহে পরাজিত দুই একটা তাড়িত হইয়া বালকের সহচররূপে নিকটে আসিয়া বসিতেছে। প্রথম প্রথম বালক তাহাদের সান্নিধ্যে ভীত বা বিব্রত বোধ করিল না, কিন্তু যখন তাহারা তাহাকে মৃতদেহ ভাবিয়া আক্রমণ করিতে আসিল, তখন সে ভয়ে আকুল ও আত্মরক্ষার জন্য বিব্রত হইয়া পড়িল। কিন্তু নিরুপায়,— সে তাহাদিগকে তাড়াইবার উপায়ও নিকটে কিছু দেখিতে পাইল না।

যখন শৃগাল কুকুরে তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত, ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে একদল লোক একটী গঙ্গাযাত্রার রোগী লইয়া সেই দেবালয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহকেরা অসমর্থ হইয়া বালকের অতি নিকটে আসিয়া তাহাদের ভার নামাইল। বালক এই জনসমাগমে, শৃগাল কুকুরের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়া, নিশ্চিন্তমনে উঠিয়া কিঞ্চিৎ দূরে উপবেশন করিল। দলের একজন গঙ্গাযাত্রীব বাসের ঘর খালি আছে কি না দেখিতে গেল। অপর সকলে মিলিয়া রোগীর চারি পার্শ্বে কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ঘর এখনও যোড়া—কিন্তু বৃষ্টি ধরিলেই খালি হইবে।" অনুচ্চস্বরে এই কথা সকলে বলাবলি করিতেছে শুনিয়া, পূর্ণ-জ্ঞান-সম্পন্ন রোগী অতি ক্ষীণ-স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "নারায়ণ—নারায়ণ—আমাকে কি আবার ঘরে নিয়ে রাখ্‌বে? আমি আর ঘরে যাব না। কুরুক্ষেত্রের সমরা-

বসানে মহাপুরুষ ভীষ্ম রাজ-ভবনে প্রবেশ করেন নাই। রণক্ষেত্রে শরশয্যাতেই শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন।" মুমূর্ষু ব্যক্তি ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরপি অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "গঙ্গাযাত্রীর ঘরে কে?" যে গিয়াছিল, সে বলিল, "বাসুদেবপুরের শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য্যের মৃতদেহ।" এই সংবাদ শুনিবামাত্র মুমূর্ষু ব্যক্তি ক্রোধকম্পিত অধর ওষ্ঠ দন্তে পেষণ করিয়া উত্তেজনাপূর্ণ মুখভঙ্গি ও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "সেই পামরটা দেহত্যাগ করিয়া ধরণীর ভার কমাইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সকলে ভাল লোক বলিয়াই জানিত, সেই জন্য সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তিও করিত। শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপন্ন বলিয়া লোকে তাঁহাকে বড় পণ্ডিত বলিয়া মান্য করিত। জনসমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তির অনুরূপ সম্মান ও উপযুক্তরূপ অধ্যাপক-বিদায়াদিও তিনি প্রাপ্ত হইতেন। বাসুদেবপুরের নিকটবর্ত্তী নানাস্থানে প্রধান প্রধান ক্রিয়াকলাপে তিনি কর্ত্তৃত্বও করিতেন; এবং সজ্ঞানে গঙ্গালাভও হইয়াছে। এরূপ ব্যক্তির প্রতি উপস্থিত রোগীর এইরূপ বিরূপভাব ও অশ্রদ্ধা বিস্ময়কর বলিয়া অনেকে ভাবিল। কেহ কেহ এটাকে রোগীর প্রলাপ বলিয়া উল্লেখ করিল। 'রোগীর প্রলাপ' এই কথাটা গোপনে পরস্পরে বলাকওয়া করিলেও, তাহা রোগীর কর্ণগোচর হইয়াছে। রোগী অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"প্রলাপ?—হাঁ—হাঁ, প্রলাপই বটে—সংসারে এমন প্রলাপ কত শত হইতেছে, আর তাহা প্রলাপেই থাকিয়া যাইতেছে।"

একটী লোক কেবল নীরবে বসিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন। এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই। এইবার অশ্রুপূর্ণ নয়নে পিতার পাদস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "বাবা! এখন কি এই শেষ মুহূর্ত্তে, গঙ্গাগর্ভে অন্য চিন্তা, বা দয়ার পাত্রদিগের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর উক্তি আপনাতে

শোভা পায়? আপনি ধর্ম্মাত্মা, পাপীর প্রতি—শত্রুর প্রতি, প্রসন্ন হউন এবং নারায়ণের নাম উচ্চারণ করুন, তাহা হইলেই আপনার মহচ্চরিত্রের উপযুক্ত কার্য্য হয়।" পিতা বলিলেন, "বৎস! তুমি আমার উপযুক্ত পুত্রই বটে, আশীর্ব্বাদ করি, ধর্ম্ম তোমার চিরসহায় হউন। শঙ্কর মরিয়াছে না বাঁচিয়াছে। সে ত আমার শত্রু নহে, সে জনসমাজের শত্রু, বিধাতার তুলাদণ্ডের সমক্ষে, তাহার কোন দুষ্কৃতির নিষ্কৃতি নাই জানিয়াও যে, আমি আসন্নকালে, তাহার প্রতি বিরক্তিপ্রদর্শনে বিরত হইলাম না, ইহার কারণ এই যে, সাধুতা ও সহৃদয়তা ধর্ম্মসাধনের উৎকৃষ্ট ফল। এই ফলের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করিতে গেলে, দুরপনেয় পাপকলঙ্কের আধার মানব-বিশেষের প্রতি, সত্য সত্যই যথেষ্ট ঘৃণা প্রদর্শন সকল সময়েই ধর্ম্মানুমোদিত, তাহার কালাকাল বিচার নাই। আমি কে যে, আমি আমার সদ্গতি চিন্তা করিব? আমি আমার যথাশক্তি ও যথাবুদ্ধি সৎপথে চলিতে ও সদনুষ্ঠানে নিজেকে নিয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহা সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবানের অপার করুণা, ইহা তাঁহারই মহিমা। পাত্র দোষে সকলই বিনষ্ট হয়। শঙ্করের তাহাই হইয়াছে। যাহা হউক, বহু চেষ্টা করিয়া তাহাদের কোন সন্ধানই পাইলাম না। আমি যেমন নিয়ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিয়াছি, আমার অনুরোধ এই গঙ্গাতীরে দেবালয়-সম্মুখে প্রতিশ্রুত হও, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসন্ধান করিবে এবং অঙ্গীকার কর, তাহাদের সন্ধান পাইলে, আমার অভিপ্রায়মত কার্য্য করিবে।" পুত্র বলিলেন, "পিতঃ! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আপনার আদেশে, আমি আপনার অভিপ্রায়মত 'অঙ্গীকারে' আবদ্ধ হইলাম।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেবালয়-দ্বারে

অমাবস্যার অন্ধকার রজনীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঘন বারি-বর্ষণেরও নিবৃত্তি হইয়াছে। উষার আলোকে পূর্ব্ব গগন আলোকিত হইতে না হইতে, বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট ও পত্রাবৃত পক্ষিকুল, সিক্ত দেহের বারিকণা সকল পক্ষ বিস্তার করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল ও দুঃখময়ী যামিনীর অবসানে আনন্দ কোলাহলে মেদিনী পূর্ণ করিয়া তুলিল। পূর্ব্ব গগনের প্রান্তদেশে স্তরে স্তরে মেঘমালা সজ্জিত ও রঞ্জিত হইলেও মধ্যভাগ হইতে উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত আকাশই মেঘাচ্ছন্ন ও স্থির ধীর। আকাশের দিকে তাকাইলে, বোধ হয় যেন, চারিদিকের মেঘমালা, পূর্ব্ব গগনে শত্রুসমাগমভয়ে শঙ্কিত ও ত্রস্ত হইয়া, তাহাকে বিতাড়িত করিবার জন্য রণসজ্জা করিতেছে। সেনা-বাহিনী সঙ্গে লইয়া দেবরাজ নিজেই যেন পূর্ব্ব গগনের মেঘাবরণ ও অন্ধকারের রাজত্ব রক্ষায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাই উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তাকাইলেই বোধ হইতেছে, যেন আকাশ ধীরে ধীরে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইবার আয়োজন করিতেছে। কিন্তু তবুও উষার আভা প্রতিদ্বন্দ্বী মেঘমালাকে উপেক্ষা করিয়া উঁকি মারিতেছে—মেঘব্যূহ ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইবার চেষ্টা করিতেছে—শেষে অসমর্থ হইয়াই যেন, সেই জলদজালে অগ্নি প্রদান করিয়া মন্দাকিনী-ধারাস্নাত প্রকৃতিকে অপূর্ব্ব শোভায় মনোমোহন বেশে সজ্জিত করিতেছে। এমন নীরব স্নিগ্ধ সুন্দর প্রাতঃকালে দেবালয়ের পুরোহিত-পত্নী গাত্রোত্থান করিয়া

প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার * নাম গ্রহণ করিয়া শয়নকক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন; দ্বারে কিঞ্চিৎ গঙ্গাজল সেচন করিয়া, দেবালয়ের দ্বার খুলিতে ও দেবীকে গলবস্ত্রে প্রণাম করিতে অগ্রসর হইলেন। পুরোহিত ঠাকুর গৃহের অন্য দিকে প্রাতঃকৃত্য সমাপনার্থে অগ্রসর হইয়াছেন। সংসারে এই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর আর কেহ নাই; কেবল একটী অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা। এই কন্যাটী তাঁহাদের নহে বলিয়া অনেকে সন্দেহ করে; কিন্তু তাঁহাদের আচার আচরণ ও কন্যার প্রতি স্নেহমমতা দেখিয়া সে সন্দেহের কোন মূল আছে বলিয়া বোধ হয় না। বালিকা প্রতিদিনই জননীর সঙ্গে অতি প্রত্যুষে উঠিয়া দেবীকে প্রণাম করিতে যায় এবং প্রতিদিনই গলবস্ত্রে দেবতাকে প্রণাম করিয়া প্রণামান্তে, গলবস্ত্রে, করযোড়ে মাতৃ-আদেশে বলে—

মহামায়া দয়া ক'রে দেহ মোরে বর।
তোমার প্রসাদে যেন পাই ভাল বর॥

আজ কন্যার উঠিতে ও আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে। জননী নিজ কার্য্য শেষ করিয়া দেবালয়ের দ্বারে স্নেহের পুত্তলি মালতীমালার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে দালানের প্রান্তে শয়ান ও নিদ্রিত সেই বালকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। মালতীর মা মৃদু পাদবিক্ষেপে বালকের দিকে অগ্রসর হইলেন। নিকটস্থ হইতে না হইতে তাঁহার প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন; কয়েক খানি অস্থি একখানি সমল শীর্ণ চর্ম্মে আবৃত। এই চর্ম্মাবৃত নরকঙ্কাল মৃত কি জীবিত তাহা সহসা বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে চীৎকার করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে বালক নয়ন উন্মীলন করিল। আজ

* অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা,
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্।

বালকের সুপ্রভাত! দেবসেবানুরক্তা সহৃদয়া রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার ষোলআনা নিরাশার মানচিত্রের এক প্রান্তে এক বিন্দু আশার সঞ্চার হইল। মালতীর মা বলিলেন, "বাবা তুমি কে?"

বা। আমি কে, আমি ত জানি না।

মা। তুমি কে তা তুমি জান না? তোমার নাম কি?

বা। আমার নাম কি, তাও জানি না। তবে আমি যাঁদের বাড়ীতে ছিলুম তাঁরা আমাকে চিত্তরঞ্জন বলিয়া ডাকৃতেন।

মা। তুমি কাদের বাড়ীতে ছিলে?

বা। প্রায় ছয় বছব সুবর্ণপুরের চাড়ুয্যেদের বাড়ীতে ছিলুন। তাদের [illegible] সব লোক জ্বরে মরে গেছে। কেউ নেই।

মা। তার আগে কোথায় ছিলে?

বা। তার আগে? ছেলেবেলা থেকে পথে পথে এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরে বে'ড়িয়েছি।

মা। তোমার বাড়ী কোথা?

বা। আমার বাড়ী কি কোথাও ছিল? তা ত আমি জানি না।

মা। তোমার কে আছে?

বা। তাও ত জানি না—যত দূর ভাল স্মরণ হয়, ততটা পথে পথে কাটিয়েছে।

এই কথা শেষ হইতে না হইতে, মালতী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বালককে দেখিয়া ও তাহার শেষ কথা শুনিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত মুখে, মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "মা, এ কে?" মা বলিলেন, "মা, এ কে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তোর ছেলে কোথায়? একবার ডেকে নিয়ে আয় দেখি।" বালিকা বলিল, "আগে ঠাকুরঘরে প্রণাম করে আসি।" মা বলিলেন, "যা শিগ্‌গির যা। আমি ততক্ষণ এই ছেলেটীকে তুলে বসাই। বেশ ছেলেটী, আহা! এমন ছেলের কেউ নেই।"

ব্রাহ্মণ আসিয়া সমস্ত শুনিলেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহার দেব-সেবাপরায়ণ হৃদয় আর্দ্র হইল। নয়নে অশ্রু দেখা দিল। বিষণ্ণ-মুখে গৃহিণীকে বলিলেন, "বেশ সাবধানে এই বালককে ঘরে উঠাইয়া লইয়া যাও।" দেবসেবকের দয়া দেখিয়া, বালক হাত বাড়াইয়া ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "আমাকে কেন নিয়ে যান্, আর কত দিন, কি অবস্থায় আপনার ঘরে থাকিতে পাইব, তা না জানিতে পারিলে, আমি আপনার ঘরে যাব না। এই ভাবে মরিব সেও ভাল।" অসীম দুঃখ কষ্টে পড়িয়াও বালক আত্মনির্ভর ও আত্মসম্মানবোধের পরিচয় দিল দেখিয়া, ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, "দেখ, তুমি পীড়িত, এখন তোমাকে আমার ঘরে, না হয় সরকারি হাঁসপাতালে রাখিয়া ব্যাধিমুক্ত করিব; তুমি সুস্থ ও সবল হইলে, তোমার নিজের ইচ্ছামত কাজ করিবে। ইচ্ছা হয়, আমার ঘরে থাকিবে, ইচ্ছা না হয়, অন্যত্র চলিয়া যাইবে। আমার ছেলে নেই, একটী মেয়ে, তাহার বিবাহ হইলেই, সে শ্বশুরঘরে চলিয়া যাইবে। তোমার কথায় তোমাকে ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া বোধ হইতেছে। ব্রাহ্মণ হও, বা না হও, আমার গৃহে থাকিলে, পুত্রাধিক স্নেহের পাত্র হইয়া সুখে কাল কাটাইতে পারিবে। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে, আমার কার্য্যভার তোমাকে দিয়া আমি জীবনের শেষ কয়টা দিন কাশীবাস করিব।" বালক নতমস্তকে ব্রাহ্মণের ব্যবস্থায় সম্মত হইল। গৃহিণী বালককে গৃহে লইয়া গেলেন। বালককে দেখিয়া অবধি, মালতীর এক দিকে আনন্দ ও স্নেহ উথলিয়া উঠিয়াছে, তাই বালকের সুখ ও সুস্থতা সম্পাদনে সে জননীর কার্য্যে সহায়তা করিতে আনন্দ অনুভব করিতেছে, পক্ষান্তরে তাহার পিতামাতার ষোলআনা স্নেহমমতার সম্ভোগ-ক্ষেত্রে নূতন অংশীদার জুটিল ভাবিয়া গোপনে—প্রাণের মর্ম্মস্থানে কাতরতা অনুভব করিতেছে। মালতীর মা কন্যার লুক্কায়িত কাতরতার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "মা! নূতন

ভাগে তোমার ভাগ কমিবে না। এই অনাথ ও পীড়িত বালকের সেবায় তুমি যতই মনোযোগ দিবে—যতই ইহাকে আদর যত্ন করিবে, আমার চক্ষে তোমার আদর ততই বাড়িয়া যাইবে।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসরে

বালক, ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে, বারাকপুরের সরকারী হাঁসপাতালে প্রায় চারি মাস কাল চিকিৎসাধীন থাকিয়া, সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। গায়ে বেশ জোর হইয়াছে, মুখে শ্রী ফুটিয়াছে, বালকের সুগোল সুগঠিত মুখমণ্ডলে সুখ ও স্বাস্থ্যের পরিচায়ক স্ফূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘকাল রোগভোগ ও অনাহারে পথে পথে ভ্রমণ জন্য, যে মলা পড়িয়াছিল, সযত্ন শুশ্রূষাগুণে সে মলা উঠিয়া গিয়াছে। তাহার শরীরের স্বাভাবিক কান্তি দেখা দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয় মনে শান্তির সুখসমীরও প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দেবালয়ের ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী পুত্রনির্ব্বিশেষে বালককে প্রতিপালন করিতেছেন। লালন পালনে ও স্নেহ যত্নে, তাঁহাদের প্রাণাধিকা কন্যারত্ন মালতী ও পালিতপুত্র চিত্তরঞ্জনে বিন্দুমাত্র তারতম্য নাই। বালক বালিকা উভয়ের মধ্যে কেহই আপনাকে অনাদৃত বলিয়া মনে করিতে পারে না। তাই বালকের আদর যত্নে, বালিকা ঈর্ষান্বিতা হইয়া অনেক সময়ে তাহার ক্লেশ উৎপাদন করে, কিন্তু বালক হৃষ্টমনে সর্ব্বদা বালিকার সুখসাধনে ও প্রীতিবিধানে ব্যস্ত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেজন্য নানাবিধ নিগ্রহ ভোগ করে

মা বাপের স্নেহের প্রসার এইভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া সন্তুষ্ট নহে। কিন্তু বালক যে তাহার সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত, সেজন্য, মালতী বালকের প্রতি দিন দিন অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে।

এই ভাবে পাঁচ বৎসরের অধিক কাল কাটিয়া গেল। এই নাতি-দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণের ঘরে থাকিয়া বালক বারাকপুরের ইংরাজী স্কুলে লেখা পড়া শিখিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের পুত্রতুল্য স্নেহ মমতা ও কল্যাণকামনা বালককে সুশিক্ষায় ও সৎপথে অগ্রসর করিয়া দিল। এই গৃহে অবস্থান-কালে, বালক বালিকার মধ্যে কত অপ্রিয় সংঘটন হইয়াছে, কত মনো-মালিন্য ঘটিয়াছে, সে সকলের সংখ্যা হয় না। কিন্তু এই সকল কলহ ও অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্যেও এমন একটা বন্ধন, হৃদয়ের এমন একটা টান পরস্পর অনুভব করিয়াছে যে, কেহ কাহারও সঙ্গ ছাড়া হইতে, বা দূরে থাকিতে ভালবাসে না। কেবল দূরে থাকিতে ভালবাসে না, তাহা নহে, চিত্তরঞ্জন অপরাহ্ণে সহাধ্যায়ী বালকদিগের সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়া বাড়ী আসিতে বিলম্ব করিলে, মালতী ব্যস্ত হয়—আহারের জন্য বসিয়া থাকে ও মায়ের নিকট তিরস্কৃত হয়। এমন কত দিন মালতী চিত্তদাদার জন্য অপেক্ষা করিতে গিয়া, অনাহারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—আর উঠেও নাই—খায়ও নাই। মালতী আপনার আচরণ দ্বারা চিত্তরঞ্জনকে অসুখী করিলেও, পিতা মাতা ভিন্ন, অপর কাহারও, চিত্তকে কিছু বলিবার অধিকার নাই। পাড়ার কেহ চিত্তের নিন্দা করিলে, মালতীর সহ্য হয় না। কেহ চিত্তের সহিত ঝগড়া করিলে, সে বালিকা আত্মবিস্মৃত হইয়া, আততায়ীর মুণ্ডপাত করিতে অগ্রসর হয়। তখন চিত্তরঞ্জন, মুগ্ধমনে মালতীর পানে তাকাইয়া, নীরব ইঙ্গিতে তাহাকে শান্ত হইতে বলে। উভয়ে মিলিত হইলেই, এটা সেটা, খুটী নাটী লইয়া ঝগড়া করে এবং তদ্দ্বারা গৃহের ও পিতামাতার অশান্তি বৃদ্ধি করে। পিতামাতাও অনেক সময়ে, কলহে এই পরসুখপ্রিয় বুদ্ধিমান্ বালকের

পক্ষ সমর্থন করিলে, বালিকা দুঃখে ও অভিমানে নিজের অসুখ ও অশান্তি বৃদ্ধি করে। কখন কখন অসহ্য হইলে, ক্রোধে অন্ধ হইয়া মাথা খুঁড়িয়া মনের ঝাল মিটাইয়া থাকে। মা বাপ, অনেক সময়েই, তাহার অসঙ্গত আব্দার উপেক্ষা করিয়া, বালকের হইয়া তাহাকে তিরস্কার করেন দেখিয়া, ক্রমে সে বালিকা দুঃখ, ক্রোধ ও অভিমানের বাহ্যপ্রকাশ পরিত্যাগ করিয়া ভিতরে ভিতরে ক্রোধের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

এইভাবে পূর্ণ পাঁচটী বৎসর ব্রাহ্মণের গৃহে কাটিয়া গিয়াছে, এমন সময়ে, একটী ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বনে, একদিন বালিকা, নিজের হাতের চুড়ি ভাঙ্গিয়া, তাহার দ্বারা, বাম হস্তের বাহুমূলে এরূপ ক্ষত করিল যে, সে ক্ষতনিঃসৃত শোণিতধারায় পরিধেয় বস্ত্রের কতক অংশ সিক্ত হইয়া গেল। বালিকা, কাঁদিতে কাঁদিতে জননীসদনে উপস্থিত হইয়া, নিজের অভিপ্রায়মত বিবরণ ব্যক্ত করিল। আজ ব্রাহ্মণী, এই ব্যাপার দেখিয়া, ভয়ে বিস্ময়ে আকুল হইলেন, গৃহান্তর হইতে কর্ত্তাকে ডাকিলেন; এবং কন্যার বর্ণিত সমস্ত কথা শুনাইলেন। কর্ত্তা চিত্তরঞ্জনকে ডাকিয়া সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক, বালিকার এই আত্মকৃত ক্ষত, শোণিতপাত ও যন্ত্রণাভোগ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইল—অবাক্ হইয়া ক্ষণকাল বালিকার মুখের দিকে তাকাইয়া, শেষে স্থিরদৃষ্টিতে পালক-পালিকার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আমার কোন কৈফিয়ৎ নাই। আপনারা আমাকে পাঁচ বৎসরেরও অধিক কাল, পুত্রাধিক স্নেহে পালন করিয়াছেন, কিন্তু আজ বুঝিলাম, আমি এ গৃহের উপযুক্ত নহি। এ দেবালয় আমার বাসের উপযুক্ত স্থান নহে। আমি চলিলাম।" এই বলিয়া, দ্বিতীয় পরিধেয় বা উত্তরীয় না লইয়া, বেগে গৃহ হইতে প্রাঙ্গণে, প্রাঙ্গণ হইতে গঙ্গার ঘাটে, ঘাট হইতে রাজ-পথে পদার্পণ করিল এবং বিদ্যুৎবেগে কোন

দিকে কোথায় চলিয়া গেল, ব্রাহ্মণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কাজে কাজেই তাহার অনুসরণ করিতেও পারিলেন না।

বালক যে ভাবে চলিয়া গেল, তাহাতে তাহাকে অপরাধী বলিয়াই বোধ হইল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দু'জনেই বালককে এক্ষণে দোষী স্থির করিয়া, কন্যার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন; এবং পলায়িত বালককে উদ্দেশে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। গৃহিণী কর্ত্তাকে তাহার সন্ধান লইতে এবং ধরিয়া আনিয়া সাজা দিতে বলিলেন। দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও, মায়ের এই কথায়, বালিকার মুখে আনন্দের গোপন ইঙ্গিত প্রকাশ পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ কন্যার মুখ দেখিয়া সত্যাসত্যের নির্ণয়ে সন্দিহান হইয়া নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। বালকের সন্ধানে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তিও কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইয়া পড়িল।

ক্ষণকাল পরে, ব্রাহ্মণীর পীড়াপীড়ি ও অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মণ বালকের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইলেন না। ক্রমে যখন বালকের ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা লোপ পাইল, তখন উভয়েই বালকের জন্য নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। একদিন দু'দিন করিয়া, কালক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহাদের কাতরতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বালিকা, ক্রমে ক্ষতমুক্ত হইয়া, সুস্থ শরীরে খেলাধূলা আরম্ভ করিল। কিন্তু মালতী আর সে মালতী নাই। সংসারের শান্তি ও সুখের প্রবাহে ভাসমান এই ক্ষুদ্র গৃহে, এই বালক কয়েক দিনের জন্য বাস করিয়া, এই সংসারের আনন্দের ধারা প্রবলতর করিয়া দিয়া ঐ যে চলিয়া গেল, ঐ যে পোষা পাখী "শিকল কাটা টেঁয়ার" মত উড়িয়া গেল, ঐ যে উড়িবার সময়ে, সকলের স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের উদ্যানে আগুন লাগাইয়া দিয়া গেল, ঐ যে তাহার পলায়নে দারুণ মনস্তাপের সূত্রপাত করিয়া গেল, তাহা

আর নিবিল না, তাহা আর জুড়াইল না, সে অভাবের হাহাকার আর নীরব হইল না।

মালতী কি করিল? মালতীর দুঃখ বর্ণনাতীত, সে মনে করে নাই যে, চিত্তরঞ্জন চলিয়া যাইবে। সে ভাবিয়াছিল, চিরদিন দু'জনে ঐ ভাবে ঝগড়া করিবে—কাঁদাকাটি করিবে—মা বাপের নিকট তাহার নামে "তিলকে তাল" করিয়া লাগাইবে—তাহাকে জব্দ করিবে—সুবিধা পাইলে, তাহাকে চড়টা চাপড়টাও খাওয়াইবে—এই পর্য্যন্ত; সে ইহার অধিক গুরুতর কিছু করিবে বা ঘটাইবে, এ ভাব সে কখনও মনের কোণেও স্থান দেয় নাই। সে বালিকা, তাহার ক্ষুদ্র সংসারে, ঝগড়া করিবার লোক পাইয়াই চরিতার্থ হইয়াছিল। সে ঝগড়া করিয়া বালককে পরাজিত করিতে, বিপন্ন করিতে ও কাঁদাইতে পারিত না বলিয়াই তাহার রাগ। কলহে পিতামাতা সর্ব্বদাই চিত্ত-রঞ্জনের পক্ষ অবলম্বন করিতেন, ইহাতেই তাহার অভিমান। এই অভিমানের ফলে তাহার সঙ্গী ও সহচর, সুহৃদ্ ও সখা গৃহতাড়িত, এ চিন্তা তাহার পক্ষে মর্ম্মান্তিক যাতনাদায়ক। কিন্তু বলিবার উপায় নাই, শুনিবারও লোক নাই। তাই তাহার প্রাণের যাতনা গোপনে গোপনে বানের জলের মত বাড়িয়া যাইতেছে। সে কি করিতে কি করিয়া ফেলিয়াছে, এটা যখন সে একাকী ভাবিতে যায়, তখন তাহার প্রাণে গভীর যন্ত্রণা ও ত্রাসের সঞ্চার হয়; তাই সে আত্মগোপন করিবার জন্য, আপনাকে ভুলাইবার জন্য, সর্ব্বদা পিতা মাতার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কথার উপর কথা কহিয়া, নিজেকে উপরে উপরে ভাসাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখনই বেশী বেশী চেষ্টা করিতে যায়, তখনই প্রাণের ভিতর হইতে যন্ত্রণারাশি পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়া তাহাকে চাপিয়া মারিতে যায়। তাহার হাসিখুসির মাঝখানে বিষম বিষাদ আসিয়া পড়ে, সে অমনি চারিদিক্ অন্ধকার

দেখিয়া বসিয়া পড়ে। লোকচক্ষুর অন্তরালে যখনই এরূপ অবস্থা ঘটে, তখন সে ত্বরায় জনসঙ্গ পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। কন্যার এরূপ অবস্থার সংঘটন জননীর দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র জননী আস্তে ব্যস্তে কন্যার সুস্থতা সম্পাদনে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা "মাথা ধরিয়াছে" বলিয়া জননীর হাত হইতে নিস্তার পাইবার চেষ্টা করে।

অনেক সময়ে মালতী গঙ্গার তীরে গিয়া আকাশের পাখী, তীরবেগে ধাবিত নৌকা ও তরঙ্গাঘাতে তালে তালে নৌকার নৃত্য দেখিয়া প্রাণের কথা ভুলিতে চায়—জলকল্লোলে ও বিহঙ্গকাকলিতে প্রাণ জুড়াইতে চায়, কিন্তু তাও কি হয়? তাহার প্রাণ-পুতুল আদর করিয়া যে মালা গাঁথিয়াছে, যাহার মধুর সৌরভে তাহার অন্তরাত্মা পাগল হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে চাপা দিয়া, তাহাকে হৃদয় হইতে দূরে রাখিয়া, মালতীর দিন কাটান ভার হইয়াছে। পাখীটীকে উড়িতে দেখিলে, তাহার ইচ্ছা হয়, ঐ ভাবে আকাশে উড়িয়া উড়িয়া দেখিত, চিত্তদাদা কোথায় আছে—কেমন আছে—কি করিতেছে। ঘাটের দিকে নৌকা আসিতে দেখিলে, সে মনে করিত, হয় ত ঐ নৌকায় তাহার চিত্তদাদা আছে। এইভাবে দুঃখ যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে করিতে মালতীর জীবনের দিন কাটিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অপরিচিত গৃহে

চিত্তরঞ্জন চলিয়া গেল। কিন্তু কোথায় যাইবে, কি খাইবে, কাহার আশ্রয় লইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। অনির্দ্দিষ্টভাবে বালক উত্তরাভিমুখে চলিল। মনের প্রথম উত্তেজনা ও হৃদয়ের অশান্তির আবেগে বালক বারাকপুরের ষ্টেশনের পার্শ্ববর্ত্তী পথ ধরিয়া ইচ্ছাপুর ও শ্যামনগর পার হইয়া অগ্রসর হইল। আতপুরের বাজার অতিক্রম করিয়া মাঠে রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে বসিল। অনেক দিন হইল বালক একবারে এত পথ হাঁটে নাই। তাই অনেকক্ষণ বসিয়াও বিশ্রামের আশ মিটিল না, বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বালকের দুঃখ ও অভিমানের মাত্রা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। তাই অলক্ষিতভাবে প্রতিপালক ও প্রতিপালিকা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর প্রতি প্রাণের টান অনুভব করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আদর, যত্ন ও ক্লেশস্বীকার একে একে স্মরণ-পথে উদিত হইতে লাগিল। বালক চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইতে লাগিল।

বালক অনেকক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিয়া তাহার হৃদয়ের থম্‌থমে ভাব যখন একটু শিথিল হইল, তখন তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য, তাঁহাদের নিকটস্থ হইবার জন্য, সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিবার জন্য, প্রাণে ইচ্ছার উদয় হইল। সে এই ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া উঠিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তখন তাহার মনে হইল যে, ফিরিয়া গেলে, সকল কথা বুঝাইয়া বলিলে, তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন কেন? আর যদি বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে মালতীর প্রতি বিরক্ত হইবেন, মালতীকে তিরস্কার করিবেন, তাহা সহ্য হইবে না। আমি তাকে ভালবাসি,

তাকে খুবই ভালবাসি, তার সন্তোষসাধনের জন্য সর্ব্বদাই কত অসুবিধা —কত ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, তবুও ত তাকে সন্তুষ্ট করিতে, আমার প্রতি পিতামাতার আদর যত্নে তাহাকে সুখানুভব করাইতে পারি নাই। আমার অশান্তি ও অসুবিধা বাড়াইয়াও সময়ে সময়ে তাহার প্রীতিবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি তিরস্কৃত ও অপদস্থ হইলে, সে সুখানুভব করিত বলিয়া, সময়ে সময়ে তাতেও ত সহায়তা করিয়াছি, কিন্তু কই তবুও ত তাহাকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিতে পারি নাই। আর আমি সেখানে গিয়া তার দুঃখ বাড়াইব না। উঃ, কি দুরন্ত! নিজে নিজের হাত কাটিয়া, রক্তারক্তি করিয়া আমার উপর দোষ চাপাইবে ও জব্দ করিবে! এমন ভয়ানক মেয়ে ত দেখি নাই! যখন এইরূপে মনে মনে মালতীর কথা ভাবিতেছে, তখন অলক্ষিতভাবে তাহার প্রাণের নিভৃতকক্ষে কে যেন চুপে চুপে বলিতেছে "না–না মালতীকে অত মন্দ—অত দুরন্ত ভাবিও না!" তাহার পরক্ষণেই উড্ডায়মানা বিহঙ্গিনার মধুর কাকলির ন্যায়—পলায়নতৎপর প্রিয়জনের বিরহদগ্ধা প্রেমপ্রতিমা বা প্রিয় সহচরীর কাতরতাপূর্ণ মর্ম্মগাথার ন্যায়—এক অপূর্ব্ব কাতরতামাখা মধুর সুস্বর শ্রবণগোচর হইল। বালক শুনিল, কে যেন পলকে চমকিত করিয়া —অভিমানবিদ্ধ মন আকুল করিয়া বলিয়া গেল :—

মানব উদ্যানে, সুখের ভবনে,
ফুটেছিল দু'টী ফুল।
(ঐ) ফুটেছিল দু'টী ফুল।

বালক চারিদিকে তাকাইল, কিন্তু কাহাকেও দেখিল না; কাহাকেও না দেখিয়া ত্রাসিত ও চিন্তিত হইয়া সম্মুখস্থ একটী বৃক্ষের দিকে তাকাইয়া আপনা-আপনি বলিল, "মালতীর মত মিষ্ট কণ্ঠস্বরে কে আমার হৃদয়ের নূতন মর্ম্মগাথার এক কথার অর্থ করিয়া গেল!

এখানে কি ভূত টুত আছে নাকি ? ভূত কি সত্যই আছে ?” আবার শুনিল :—

কে হানিল বাজ, কে ভাঙ্গিল গাছ ?
প্রবল পবনে লইয়া ছ'জনে,
কেন ছুঠাই করিল ?
(হায়) কেন ছুঠাঁই করিল ?

চিত্তরঞ্জনের ভীতিবিস্ফারিত মুখে কাতরতা ফুটিয়া উঠিল। সে অশ্রুসিক্ত হইয়া—ভয়ে বিহ্বল হইয়া, চারিদিকে তাকাইতে লাগিল, কোন দিকে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, ভাবিতেছে ছুটিয়া লোকালয়ের দিকে যাইবে, এমন সময়ে আবার শুনিল সেই স্বর—আবার সেই মধুমিষ্ট স্বরে অতি কাতরে বলিতেছে :—

প্রেমের সূচনা, শেষে সুখ নানা,
কে করিল নিরমূল ?
(বল) কে করিল নিরমূল ?

চিত্তরঞ্জন অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেও, তাহার শরীরে যথেষ্ট বল থাকিলেও, নানা প্রকার লোক দেখিলেও, গত পাঁচ বৎসর শ্মশানঘাটের অতি নিকটে বাস করিলেও, কখনও এরূপ দায়ে, এরূপ বিপদে পড়ে নাই। তাই আজ তাহার ভয়ে-বিহ্বল মন অবশ হইয়া পড়িল, বালক সংজ্ঞাশূন্য হইয়া অবশদেহে বৃক্ষতলে পতিত রহিল।

তাহার পর তিন দিন চলিয়া গিয়াছে। চিত্তরঞ্জনের চেতনা হয় নাই। চতুর্থ দিবস প্রাতঃসূর্য্যের কিরণকণাসকল যখন লোকালয়ের নিদ্রাভঙ্গ করিতেছে—জীব কোলাহলে ধরণীবক্ষঃ যখন শব্দায়মান হইতেছে, তখন ক্ষীণ ও ম্লান দৃষ্টিতে বালক চারিদিকের দৃশ্য দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। কোন্ দেশে, কাহার গৃহে, কিরূপ অবস্থায়

আছে," তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। যাঁহারা সর্ব্বদা নিকটে বসিয়া পরিচর্য্যা করিতেছেন, তাঁহাদের কাহাকেও কখন দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। অথচ তাঁহাদের প্রত্যেকের ব্যবহারে ব্যাকুলতা পরিচর্য্যায় স্নেহের পরিচয় পাইতেছে, আর বালকের কৌতূহল শতগুণে বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু সে এত দুর্ব্বল ও এত অসুস্থ যে তাহার ভাল করিয়া বুঝিবার ও কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার শক্তি নাই। কিছু ভাবিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে :—

"মানব উদ্যানে, সুখের ভবনে,
ফুটেছিল দু'টী ফুল।"

তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের কোন কথাই স্মরণ পথে উদিত হইতেছে না, তাই চিত্তরঞ্জন সেই রোগশয্যাতে শয়ন করিয়া, থাকিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছে, "মানব উদ্যানে" ইত্যাদি। আর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় সেই পুষ্পকলিকাসদৃশী মালতীর কথা মনে হয়। কোন কথা ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইলে, সর্ব্বাগ্রে মালতীর অনুতাপদগ্ধ, শোকক্লিষ্ট ও অশ্রুসিক্ত মুখখানি মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছে। মালতীর এইরূপ শোকজীর্ণ ও অশ্রুপূর্ণ মুখ যতই তাহার কল্পনা-পথে ছায়ার ন্যায় পতিত হইতেছে, ততই সে বালক উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কাহাকে কি বলিতেছে, কেহই তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া ও কথা শুনিয়া সকলেই তাহাকে বিকারগ্রস্ত রোগী, ও তাহার কথা রোগীর প্রলাপোক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছে।

এইভাবে প্রাতঃকাল মধ্যাহ্নে, মধ্যাহ্ন সায়াহ্নে পরিণত হইল। এইভাবে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, ক্রমান্বয়ে সপ্তাহ কাল অতীত হইল। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে চিত্তরঞ্জন আরোগ্য লাভ করিতেছে। রোগমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক শক্তিও

বৃদ্ধি পাইতেছে। পীড়ার দ্বাদশ দিবসে চিত্তরঞ্জন শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, এ কোন দেশ ?

প। তোমার কথার উত্তর দিবার অনুমতি নাই।

চি। কাহার অনুমতি নাই ?

প। এই গৃহের কর্ত্তার।

চি। তিনি কে ?

প। বলিবার হুকুম নাই। পরে জানিবে।

চিত্তরঞ্জন নীরব হইল, কিন্তু তাহার চিন্তাকুল চিত্ত অধিকতর আকুল হইয়া উঠিল। কোথায় কাহার বাড়ীতে এরূপ যত্নে সুরক্ষিত, জানিতে না পারিয়া তাহার মনে নানা ভাবনার উদয় হইতে লাগিল। সুবর্ণপুরের চাড়ুয্যেদের বাড়ীতে অবস্থান কালে, প্রবীণা গৃহিণীগণের নিকট রূপকথায় কত রাক্ষসী, দানবী, কিন্নরীর গল্প শুনিয়াছে—পলায়নের উপায়বিহীন নির্জ্জন গৃহে আবদ্ধ, অথচ সমাদরে রক্ষিত ও লালিত পালিত হইয়াও চিরদিন তাহাদেরই নিজ্জন কবলে বাস করিতে হয়—রূপকথায় শুনিয়াছে, যখন কেহ এরূপ অবস্থায় পড়ে, তখন তাহার চিরজীবনে আর কখনও লোকালয়ের মুখ দেখিবার আশা থাকে না। দৈবক্রমে সংগৃহীত ঐরূপ মানবকে, তাহারা আপন আপন আলয়ে রূপার কাটী ছোঁয়াইয়া নির্জীব করিয়া রাখিয়া, অন্যবিধ প্রয়োজনসাধনে বহির্গত হয়, আবার আপনার আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক আপনার ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত সোণার কাটী ছোঁয়াইয়া তাহাকে সজীব করিয়া, তাহার সহিত সুখে পান, ভোজন ও বাস করে। এইরূপ কত শত গল্পের তাৎপর্য্য স্মরণ হওয়াতে, চিত্তরঞ্জন আপনার অবস্থা অধিকতর শোচনীয় বলিয়া মনে করিতে লাগিল, তাই অতি কাতরভাবে—সজল নয়নে—বিনয় বচনে পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকাকে বলিল, "তুমি দয়া করে এ বাড়ীর কর্ত্তাকে একটীবার ডাকিয়া দিবে ?"

প। আমার সঙ্গে এই সকল কথা কহিলে, আমি উঠিয়া যাইব।

চি। যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর না দাও, তবে তোমার বসিয়া থাকা, আর উঠিয়া যাওয়া, আমার কাছে দুই সমান। যেতে চাও, যাও। যদি বসে থাক, তবে আমার কথার জবাব দিতেই হবে।

প। আমি উঠে গেলে, তোমাকে ঔষধ খাওয়াবে কে? তোমাকে দেখ্‌বে কে?

চি। কোথায়, কার বাড়ীতে, কি অবস্থায় আছি, যদি আমার জানিবার অধিকার না থাকে, তাহ'লে আমার ঔষধের দরকার নাই, আর আমাকে দেখ্‌বারও দরকার নাই।

প। তোমার ঔষধের দরকার আছে, তোমাকে দেখ্‌বারও দরকার আছে। কিন্তু তুমি কোথায় আছ, তাহা তোমার জানিবার দরকার নাই। আমি যেমন বলি ঠিক তাই কর। আমার কথা শুনিলে ভাল হবে।

চি। তুমি কে, তা না জেনে, তোমার কথাই বা শুন্‌বো কেন?

প। এই আড্ডা যাঁর, আমি তাঁর কাজ করি। আমার নাম মোক্ষদা।

চি। তুমি কি কাজ কর?

পরিচারিকা একটু থতমত খাইয়া—অপ্রস্তুত হইয়া, ঈষৎ রক্তিমাভ মুখে বলিল, "আমি—আমি—এই বাসার কাজ কর্ম্ম সব দেখি, সর্ব্বদাই অনেক লোক আসে যায় ও থাকে, তাদের খাওয়া দাওয়া থাকা এই সবই আমি দেখি। এই বাড়ীর সব কাজের ভার আমার উপর।

চি। এই বাড়ীর সব কাজ কর? সে ত অনেক কাজ, না? এত কাজ একা কেমন ক'রে কর?

প। আরও ঝি চাকর আছে, তারা আমার হুকুমমত কাজ করে।

চি। তুমি কত মাইনে পাও?

প। ভাত কাপড়।

চি। ভাত কাপড়ে এত থাট? তবে তুমি এত গয়না কোথায় পেলে?

পরিচারিকা আবার একটু অপ্রস্তুত হইয়া, সলজ্জ চক্ষু নত করিয়া বলিল, "তুমি বড় দুরন্ত ছেলে, তোমার সকল কথার উত্তর দেওয়া আমার কর্ম্ম নয়। অনেক দিন থেকে আমি এই বাড়ীর দাসী, তাই এই বাড়ীর কর্ত্তা আমাকে এ সব দিয়েছেন!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছোট কলিকাতায়

প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের কথা হইতে চলিল, বাঙ্গালাদেশে এক নূতন ছোট কলিকাতার সূত্রপাত হইয়াছিল। অত্যুৎকৃষ্ট ইষ্টকালয় সকল ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিতেছিল। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতার সহিত বাঙ্গালার পুরাতন রাজধানী ঢাকা নগরীর ও সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙ্গালা এবং আসাম প্রদেশের সংযোগস্থল পুরাতন কুষ্টিয়ার কথা আমরা বলিতেছি। বর্ত্তমান কুষ্টিয়া গৌরী (গোরাই) নদীর তীরে অবস্থিত, আর সাগরগামিনী বাত্যাবিতাড়িতা চিরকল্লোলিনী পদ্মা পুরাতন কুষ্টিয়ার পাদমূল বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। রাজধানীর সভ্যতাসঙ্গত রীতিনীতি ও বিবিধ বাণিজ্য দ্রব্য সর্ব্বপ্রথমে কুষ্টিয়া হইতেই বঙ্গদেশের ঐ অঞ্চলের নানাস্থানে পরিগৃহীত হইয়াছিল।

সে কালের কুষ্টিয়ার চিহ্ন মাত্র নাই বলিলেই হয়। কেবল ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের পুরাতন ষ্টেশন বাটীর ভগ্নাবশেষ পুরাতন শোভার সাক্ষ্য দিতেছে, আর রাজধানীর অনুকরণে গঠিত ক্ষুদ্র নগরীর ভগ্নাংশ 'বেঁকি দালান' নামে অভিহিত হইয়া এখনও পুরাতন শোভার শেষ পরিচয় পাড়িতেছে। আর কিছুই নাই। বর্ষায় প্লাবিতমাঠ জলস্রোত এবং অন্যান্য সময়ে পদ্মার বালুকাময়ী চরভূমি মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। এই চরভূমিই পূর্ব্বে অতলস্পর্শ পদ্মাগর্ভ ছিল এবং বিবিধ প্রকারের জলযান এই স্থান হইতে যাত্রী লইয়া নানাস্থানে চলিয়া যাইত। পদ্মার তীরবর্ত্তী এই পুরাতন কুষ্টিয়াকে ঐ অঞ্চলের লোক, ছোট কলিকাতা বলিত।

এই ছোট কলিকাতার নদীর তটে, ১২৭০ সালের মাঘ মাসের প্রারম্ভে, একদিন প্রাতঃকালে, এক লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘন কুজ্ঝটিকায় জল স্থল ও শূন্যমার্গ সমাচ্ছন্ন ছিল, তাই একটা ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়াও লোক এতক্ষণ ভাল করিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে পারে নাই। এইবার কুয়াসার গাঢ়তা কিঞ্চিৎ হ্রাস হওয়ায় সূর্য্যদেব অল্পে অল্পে জীবকুলের নয়নপথে পতিত হইতেছেন, তাই লোক ক্রন্দন-ধ্বনি ও জনকোলাহলে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া নদীতটে সমবেত হইতে লাগিল।

পুরুষ হউক আর স্ত্রীলোক হউক, যে যায়, সেই ব্যক্তিই মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে মুখ ফিরাইয়া দূরে পলায়ন করে। কেহই বহুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইতে সমর্থ হয় না। একটী অসহায় বালক কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রত্যেকের নিকট করযোড়ে নিজ স্বাধীনতা ভিক্ষা চাহিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই বালককে একখানি নৌকায় উঠাইয়া কোন্ দূরদেশে লইয়া যাইবে, বালকের তাহাতে সম্মতি নাই, তবুও তাহাকে লইয়া যাইবে। সে যাইবে না, তাহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে। এক দিকে বালকের আত্মরক্ষার চেষ্টা, অপর দিকে প্রবলের

বল প্রকাশ, এই সংগ্রামে বালকের হাত দুখানির নানাস্থান ক্ষত বিক্ষত হইয়া শোণিত নির্গত হইতেছে—ললাটে ও গণ্ডে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, ফুলিয়া উঠিয়াছে। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। যে আসিতেছে তাহারই ইচ্ছা হইতেছে বালককে ঐ অবস্থা হইতে বলপূর্ব্বক মুক্ত করিয়া দেয়, কিন্তু লোক যেই শুনিতেছে যে, বালক বৈদ্যনাথ বাবুর লোক, অমনি সকলে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইতেছে ও অশ্রুমোচন করিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বিষাদিত চিত্তে নিজ নিজ কর্ম্মে চলিয়া যাইতেছে। যাহাদের কাজের তাড়া তত বেশী নাই, তাহারা আরও ক্ষণকাল দূরে দাঁড়াইয়া বালকের অবস্থা ও পরিণাম দেখিতেছে।

বালকের অজ্ঞাতসারে বালকের নামে দূরদেশে যাইবার জন্য সম্মতিপত্র প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত ও মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে। বালক অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেও তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার বয়স বিংশতি বর্ষ হইয়া গিয়াছে। যে ব্যবস্থার বন্ধনে বালক জড়িত হইয়াছে, তাহা হইতে আজ তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে, ছোট কলিকাতায় তখন এমন এক ব্যক্তিও ছিল না। সুতরাং বালক ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া সংগ্রামে পরাজয় মানিল, এবং পরিশেষে তাহাকে নির্ব্বিবাদে নৌকায় লইয়া উঠান হইল। বৈদ্যনাথের সহচরগণ নানা উপায়ে লোক সংগ্রহ করিত। কুলবধূর কলঙ্ক রটাইয়া, বিধবার জীবনভার লঘু করিবার প্রলোভন দেখাইয়া, অর্থব্যয়ে দরিদ্র গৃহস্থের গুরুভার লঘু করিয়া এবং পথপ্রান্তে পতিত রুগ্ন পথিকের রোগমুক্ত করিয়া লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করিত। শেষ উপায়টী বৈদ্যনাথের বুদ্ধিপ্রসূত। বৈদ্যনাথ স্বার্থসাধন বৃত্তির অধীন হইয়াও এইরূপে অতর্কিত ভাবে অনেকের প্রাণরক্ষা করিতেছিলেন। এ বালক তাহাদেরই অন্যতম। যখন তাহাকে এই অবস্থায় নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হইল, তখন একটী প্রাণী নীরবে মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া নদীর তীরবর্ত্তী কোন গৃহের বাতায়নে বসিয়া রোদন করিতেছিলেন। পাঠককে বলিয়া

দিতে হইবে না যে, এই বালক চিত্তরঞ্জন, আর গৃহাভ্যন্তরে লুক্কায়িত প্রাণীটী পূর্ব্ব কথিত রোগশয্যায় শায়িত চিত্তরঞ্জনের পরিচারিকা মোক্ষদা।

বৈদ্যনাথ লোকজন সব নৌকায় উঠাইয়া দিয়া বাসায় আসিলেন। আজ নয় বৎসর হইল, তিনি, এই লোকচালানি ব্যবসায় করিতেছেন, কিন্তু কখনও এরূপ বিপদে পড়েন নাই। কখনও দশজনের সমক্ষে এরূপ অপদস্থ হন নাই। আজ পর্য্যন্ত, কেহ একটা বড় কথা বলিতে সাহস করে নাই। পথে ঘাটে, যেখানে যখন, যে ব্যক্তি সম্মুখে পড়িয়াছে, সেই নতমস্তকে পথ ছাড়িয়া, পথপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ তিনি দীর্ঘকালব্যাপী সম্ভ্রম স্মরণ করিয়া ব্যথিত, পদ্মাতীরে একটা বালকের অবাধ্যতা ও চীৎকারে উত্তেজিত ও জেদের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহার প্রথম ও প্রধান গ্লানি সম্ভ্রমহানির জন্য। তাঁহার এই প্রবল গ্লানিকর মানসিক অশান্তির অন্তরালে আরও একটা কি যেন বিদ্যমান, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সেইটাই যেন, তাঁহার অশান্তি-বৃদ্ধির ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত। সম্ভ্রমহানির জ্বালাটা তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের উপরিভাগের ফেণপুঞ্জ মাত্র। বৈদ্যনাথ সেই ফেণপুঞ্জে আপাদমস্তক আবৃত হইয়া, ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন।

বৈদ্যনাথ জাতিতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বংশজ, নিবাস সহরের নিকট। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়েও সহর বলিলে, মুর্শিদাবাদ বুঝাইত। বৈদ্যনাথের বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইবে। বৈদ্যনাথের পিতা গুরুনাথ চক্রবর্ত্তী মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে হিসাবসেরেস্তায় সামান্য মুহুরির কার্য্য করিতেন, কিন্তু অত্যধিক চতুর লোক ছিলেন বলিয়া, আপনার পদমর্য্যাদা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রভুত্ব করিবার সুযোগ করিয়া লইয়াছিলেন এবং সেই সূত্রে কিঞ্চিৎ অর্থ সংস্থানও করিয়া লইয়াছিলেন। পুত্র বৈদ্যনাথ, পিতার পরলোক-প্রাপ্তিতে ঐ যৎকিঞ্চিৎ

অর্থের উত্তরাধিকারী হন, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তিনি আর কিছুরও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। পিতার রীতিনীতি, আচার আচরণ, বুদ্ধি বিবেচনা ও পিতার চতুরতার এক এক রেণু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভের জন্য কিছু দিন সহরে পিতার নিকটে বাস করিয়াছিলেন। তাই বুদ্ধিমান বালক বৈদ্যনাথ, পিতার নিকটে থাকিয়া লোকদলন ও স্বার্থসাধনের সদুপায় সকলও শিক্ষা করিয়াছিলেন। অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের সুখবৃদ্ধি করিতে, অন্যের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া নিজে পুষ্ট হইতে কুণ্ঠিত বোধ করিতেন না, ববং প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন।

আজন্ম ও আশৈশব এইরূপ অবস্থায় লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া, বৈদ্যনাথ সংসারে কিরূপ চরিত্রের পরিচয় দিবেন, পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। তিনি তাঁহার জীবনের এই পঞ্চাশ বৎসর সময়ে পৈতৃক গুণ ও শিক্ষার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন—এ পর্য্যন্ত বিবিধ আকারে আপনার বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রকৃতির লীলা দেখাইয়া আসিতেছেন। কার্য্যবিশেষের জন্য একটী দিনও কেহ তাঁহার মুখে অবসাদ, গ্লানি বা অনুতাপের রেখাপাত হইতে দেখে নাই। বৈদ্যনাথের হৃদয় মন বিনা বিরামে স্বার্থসিদ্ধির পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছে, তাই তিনি পৈতৃক-গুণে ও পুণ্যে প্রায় সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া সুখে ও সম্ভ্রমে সংসারে বাস করিতেছেন। এক দিকে বৈদ্যনাথের নবদূর্ব্বাদলশ্যাম দেহ, সর্ব্বদাই সুস্থ ও কর্ম্মঠ—বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক মুখমণ্ডলে দৃঢ়তা সদা বিরাজিত, অন্য দিকে তাঁহার মন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্মানুরক্ত—শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বিরামবর্জ্জিত।

বৈদ্যনাথ দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ পুরুষ। শরীরের গঠন সুন্দর, সুঠাম ও দৃঢ়। দীর্ঘ হস্তপদের অনুরূপ সুপ্রশস্ত বক্ষঃ। ললাট কিঞ্চিৎ উচ্চ, তাই বৃহদায়তন নেত্রযুগল ঘন কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগলের অন্তরালে লুক্কায়িত বলিয়া

বোধ হয়, কিন্তু তাহাতেও বৈদ্যনাথের মুখশ্রী ও সৌষ্ঠবের হানি হয় নাই। এই শ্যামতনু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষের নাতি-উচ্চ অথচ সুগঠিত নাসিকার অগ্রভাগ একটু চাপা। মনোযোগ সহকারে দেখিলে, বুঝা যায়, ইহাই বৈদ্যনাথের সৌন্দর্য্য-হানির একমাত্র কারণ। যাহা হউক, এই প্রধান দোষ মুখের মধ্যস্থলে নিত্য বিরাজিত থাকিলেও বৈদ্যনাথ সুখে ও গৌরবে জীবনের যৌবনকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। এখনও তাঁহার শরীরে যথেষ্ট শক্তিসামর্থ্য আছে, মনেও অপরিমেয় উৎসাহ আছে! তিনি আপনাকে এখনও যুবাপুরুষ বলিয়াই মনে করেন—এবং যৌবনের অনুষ্ঠেয় কোন কাজেই পশ্চাৎপদ নহেন।

বৈদ্যনাথ বাসায় আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিলেন। ভৃত্য তামাক সাজিয়া আনিয়া প্রভুর হাতে দিতে দিতে দেখিল, প্রভুর মুখে গভীর বিষাদের কালিমা পড়িয়াছে—প্রভুর এমন মলিন মুখ, ভৃত্য চূড়ামণি আর কখনও দেখে নাই। প্রভু-ভৃত্যের চারিচক্ষু মিলিত হওয়াতে উভয়েরই শরীর শিহরিয়া উঠিল। বৈদ্যনাথ চূড়ামণিকে বলিলেন, "চূড়ামণি! আজ কেন আমার এমন হ'লো? যাহা কেহ কখনও পারে নাই, এই ছেলেটা আজ তাই করিল--দশজনের সাম্‌নে আমাকে যৎপরোনাস্তি অপদস্থ করিল, তাই আমার মনটা আজ খারাপ হইয়াছে, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না, যেন আরও কিছু কারণ আছে—কিন্তু কি আছে খুঁজিয়া পাইতেছি না।" চতুর চূড়ামণি বলিল, "আজ্ঞে ও রকম হয়, ওটা নাইতে খেতে সেরে যাবে।" চূড়ামণি গৌরবর্ণ খর্ব্বাকৃতি পুরুষ, জাতিতে কর্ম্মকার, কুষ্টিয়ার অন্তর্গত জগতীর নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস। সে আজ প্রায় আট বৎসর কাল বৈদ্যনাথের অনুগত ও বিশ্বাসী ভৃত্য। প্রভুর বাহিরের সকল কাজের ভার তাহারই উপর। পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিতা পরিচারিকারও বিশেষ ফয়ফরমাইস্ চূড়ামণিই খাটিয়া থাকে। বাড়ীর ভিতরের দৈনিক কাজকর্ম্মগুলি চূড়ামণির

দ্বাদশবর্ষীয় বালক মদনমোহন করে, বিশেষ বিশেষ কাজগুলি পরিচারিকার আদেশে মদনের বাপই করিয়া থাকে।

বালক মদনমোহন যখন বাটীর ভিতর হইতে দৌড়িয়া বাহির বাটীতে আসিয়া বৈদ্যনাথকে বলিল, "আপনি একবার বাড়ীর ভিতরে আসুন, বড় দরকার।" তখন বেলা প্রায় দশটা বাজিতে যায়। বৈদ্যনাথ মদনের মুখ দেখিয়া কিছু গুরুতর বিপদ গণনা করিলেন এবং শশব্যস্তে ভিতর বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রভুত্ব বিস্তারে

কতক স্নেহের তাড়নায়, আর কতক মালতীর একাকিত্বের ক্লেশ অনুভব করিয়া, মালতীর মা বাপ চিত্তরঞ্জনের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধানই পাইলেন না। তাঁহারা ক্রমে নিরাশ ও তৎপরে নিরস্ত হইয়াছেন। এখন মালতীর তের বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে। দেবসেবক গৃহিণীর ব্যস্ততায় এবং দেশকাল ধর্ম্মের অনুরোধে ত্বরায় মালতীর বিবাহের জন্য পাত্রানুসন্ধানে রত হইলেন। তাঁহার গৃহিণীর ইচ্ছা নয় যে, মেয়েটীর বিবাহ দিয়া শ্বশুরগৃহে পাঠাইয়া দেন, তাঁহার ইচ্ছা যে বিবাহ দিয়া মেয়েটীর সঙ্গে ঘরে একটী ছেলেও পান। নিজেরা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে, কন্যা ও জামাতা শেষ দশায় পুত্র কন্যার কাজ করিবে, সর্ব্বদা নিকটে থাকিবে এবং যাহা কিছু থাকিবে, তাহা তাহারাই লইবে। চিত্তরঞ্জনকে, পাইয়া তাঁহাদের সেই আশা অনেক

অল্পে বদ্ধমূল হইতেছিল। চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্মণ সন্তান কি না, শেষ দুই বৎসর দেবসেবক ব্রাহ্মণ সে বিষয়ে বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের কথা বার্ত্তার ভাবভঙ্গি—তাহার আচার ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই বোধ হইত, কিন্তু কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ সংগৃহীত হয় নাই। সুবর্ণপুরের চাড়ুয্যেদের বাড়ীতে এবং গ্রামের অন্যান্য লোকের বাচনিক যাহা শুনিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে চিত্তরঞ্জনের ব্রাহ্মণত্বের স্বপক্ষে বিপক্ষে কোন দিকেই নির্ভর করিতে পারেন না; কিন্তু ছেলেটী সর্ব্বাংশেই মেয়েটীর উপযোগী হইয়াছিল। এইভাব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী উভয়ের নিত্য চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাই আজ তাঁহাদের ক্লেশের সীমা নাই।

আবার মালতীর জন্য চিত্তরঞ্জনের এবং চিত্তের জন্য মালতীর মর্ম্মে মর্ম্মে বেদনা লাগিয়াছে। যত দিন যাইতেছে—যত তাহারা পরস্পর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ততই তাহাদের বাহিরের কলহপ্রিয়তা ও অন্য শতবিধ অপ্রিয় সংঘটনের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। ভিতরে—হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে—গোপনে গোপনে গভীর হাহাকার উঠিতেছে।—চিত্তরঞ্জন আগ্নেয় পর্ব্বতের ন্যায়, বক্ষে দারুণ আগুন লইয়া সংসারের বিবিধ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইয়াছে। আর মালতী একাকিনী বসিয়া বসিয়া, হৃদয়ের বেদনাভারে অবসন্ন হইয়া দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে, মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে, আর তাহার মায়ের অর্দ্ধেক প্রাণ শুকাইয়া যায়—হৃদয়ের ভিতর কেমন একটা "দমাস্ দমাস্" আঘাত অনুভব করে। কন্যার মুখ দেখিয়া মায়ের, আবার মায়ের মুখ দেখিয়া কন্যার মুখ ম্লান হইয়া যাইতেছে।

এমন সময়ে দেবসেবক একটী পাত্র পাইলেন, বাড়ী সাঁইমানা, কুলীনের ছেলে, বয়স ষোল বৎসর, দেখিতে মন্দ নহে। গ্রাম্য পাঠশালার লেখাপড়া শেষ করিয়া পাত্রটী নীলগঞ্জের হাটের এক দোকানে

হিসাবপত্র রাখার কাজ করে। সে চেষ্টায় আছে, যাহাতে জমিদার সরকারে কোথাও একটু ঐরূপ কাজ পায়। সংসারে ছেলেটীর কেবল মা আছেন। আর আত্মীয়ের মধ্যে, ভাটপাড়ায় এক মাসী, স্বামীপুত্র লইয়া সুখে ও স্বচ্ছলে সংসার করিতেছেন।

দেবসেবক এই পাত্র পছন্দ করিয়াছেন এবং সুযোগমত ঐ পাত্রকে গঙ্গাস্নানোপলক্ষে তাঁহাদের দ্বারে পাইয়া গৃহিণীকে দেখাইয়াছেন। ঠাকুরবাড়ী দেখাইবার উপলক্ষে তাহাকে গৃহে আনিয়া একটুকু বসাইয়া যত্ন করিয়াছেন এবং কিঞ্চিৎ জলযোগও করাইয়াছেন। ছেলেটী দেখিয়া ঠাকুরাণীরও পছন্দ হইল। ব্রাহ্মণ ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে করিতে, পাত্রটীকে বিদায় দিয়া, সেই দিনই একবার ভাটপাড়ায় পাত্রের মেসোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথাবার্ত্তা স্থির করিতে এবং পাত্রের জননীকে যাহা যাহা বলিবার বলিয়া, সমস্ত স্থির করিবার জন্য অনুরোধ করিতে গেলেন। পথে কিন্তু নানাপ্রকার অশুভ দর্শন ঘটিতে লাগিল। মনটাও ক্রমে দ্বিধাযুক্ত ও শেষে উপস্থিত কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়িল। পথ হইতে দেবসেবক ফিরিয়া আসিলেন।

রাত্রিতে আহারান্তে শয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী উভয়েই চিন্তিত। কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন না, কিন্তু কাহারও মন চিন্তামুক্ত সুখ-সুপ্তির উপযোগী নহে। বহুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ হাঁচিবা মাত্র ব্রাহ্মণী বামহস্তের "ঘাড় স্পর্শ করিয়া শুভকামনাসূচক ইঙ্গিত" করিবা মাত্র, ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তুমি কি এখনও জেগে?"

গৃ। ঘুম হয় নি। মেয়ে বড় হয়েছে, কবে কি যে হবে, তাই ভাব্‌ছি।

ব্রা। কেন? আর ২।৪ দিনের মধ্যে সবই ত ঠিক হ'য়ে যাবে। আর ভাবনা কিসের?

গৃ। ভাবনা কি আর একটা। মেয়ে একটা—ভাবনা হাজারটা।

ব্রা। না না, তুমি অত ভেবো না, তাহ'লে মেয়েও মুস্‌ড়ে যাবে।

গৃ। মেয়ে বুঝি মুস্‌ড়ে যেতে বাকি আছে?

ব্রা। তাই ত দেখ্‌ছি, মেয়েটা ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে। আর বেশী দিন এ অবস্থায় রাখ্‌লে বাঁচবে না। একটু আমোদ আহ্লাদ, লোকজন, কুটুম্‌কুটুম্বিতার মধ্যে ফেলে, অবস্থার পরিবর্ত্তন করে দিলেই, এ ভাবটা সেরে যাবে।

গৃ। অত সহজ কি? আমার বোধ হয়, অত সহজে বদ্‌লাবে না।

ব্র। কেন বদ্‌লাবে না?

গৃ। (আস্তে মেয়ের পায়ে হাত দিয়া জাগরিত কি নিদ্রিত পরীক্ষা করিয়া পরে ব্রাহ্মণের গা টিপিয়া অনুচ্চস্বরে) বোধ হয়, সেই ছেলেটার জন্য এখনও মন খুব খারাপ আছে। আর সে খারাপ ভাব সহজে যাবেও না।

ব্রা। তুমিও যেমন! ছেলে মানুষের কয়েক দিনের একটা সামান্য ভাব, তাই স্থায়ী হইয়া মানুষকে দীর্ঘকাল কখন অসুখী করিতে পারে?

গৃ। পুরুষমানুষের না হ'তে পারে, মেয়েছেলের হয়।

ব্রা। মেয়েছেলেকে আবার দু'খানা ভাল গহনা, দু'খানা ভাল কাপড় দিলে—একটু আদর যত্ন করিলেই সব সারিয়া যায়।

গৃ। সকলের অবস্থা এক রকম নয়। এমন স্ত্রীলোক আছে, যাহাদের সহস্র প্রকার সুখের মধ্যে চিরজীবন দুঃখে কাটিয়া যায়।

ব্রা। তুমিই ত বলিতেছ, সকলের অবস্থা এক রকম নয়।

গৃ। ছেলে মানুষ হ'লেও, এর মনের অবস্থা কিরূপ কে জানে?

ব্রা। এক জন যদি অনুরক্ত না হয়, তবে সে স্থলে, অন্য জনই বা কেন হবে? এই ছেলেটার যদি আমাদের উপর কিংবা ঐ মেয়েটার উপর এক বিন্দুও টান থাকিত, তাহা হইলে, সে কি এতদিন নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিত? অবশ্যই ফিরিয়া আসিত।

মালতী জাগিয়াছিল। সে সকল কথাই শুনিয়াছে, এতক্ষণ সে নিদ্রিতার ন্যায় পড়িয়াছিল। এই কথা শুনিবামাত্র তাহার হৃদয়ে যেন শত সর্পদংশনের যাতনার সঞ্চার হইল। তাহার শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। এমন হইল যে, সে আর শয্যাতে শুইয়া থাকিতে পারিতেছে না। কেন সহসা তাহার এমন হইল? তাহার বিষম যাতনার কারণ এই যে, সে তাব চিত্তদাদাকে তাড়াইয়াছে, এমন ভাবে তাড়াইয়াছে যে, আর তাহার ফিরিয়া আসিবার পথ রাখে নাই। কেবল তাহাই নহে, সেই নির্দ্দোষ ও নিরপরাধ চিত্তরঞ্জন, এই কয়েক মাসে মালতীর শরীর মনের উপর, এরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে—তাহার চিন্তাপুষ্পের প্রত্যেক দলে চিত্তরঞ্জন এরূপ মধুর শোভা ও সৌরভ বিস্তার করিয়াছে যে, তাহাকে আর কেহ নিন্দা করিলে, কিছু বলিলে, কি তাহার কাজের কোন খুঁত ধরিলে, মালতীর তাহা অসহ্য হয়, ইচ্ছা হয় তখনই তাহার প্রতিবাদ করে এবং তাহার সঙ্কল্পের মোমেগড়া—কল্পনার শুভ্র সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত হৃদয়-দেবতার মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তৃপ্তি ও শান্তি অনুভব করে। সে এখন ইহাই চায়, ইহার অধিক অন্য প্রার্থনা বা কামনা তাহার কিছুই নাই। তাই সে আত্মবিস্মৃত হইয়া, সময় ও স্থান বিস্মৃত হইয়া বলিল, "বাবা, তোমরা চিত্ত দাদার জন্যে যত কষ্ট পাচ্চ, চিত্ত দাদা তোমাদের জন্য তার চেয়েও বেশী কষ্ট পাচ্চে!

বা। সর্ব্বনাশি! তুই জেগে আছিস্?

মে। বাবা, আমি ঘুমুয়েছিলুম, তোমাদের কথায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

বা। চিত্তের যে বেশী কষ্ট হচ্চে, তা তুই কিসে বুঝ্লি?

মে। বাবা—বাবা, আমারই সব দোষ। তার কোন দোষ নেই—সে নিখুঁত।

গৃ। সে এই যে চ'লে গেল, আর এল না, এতে তার কোন দোষ নাই?

মে। না, মা, এক বিন্দু দোষ নেই, সব দোষ আমার।

বা। কিসে সব দোষ তোর হ'লো ?

মে। বাবা, আমিই ত ঝগড়া করে তাকে তাড়্'য়েছি।

গৃ। সে ত তোর হাত কেটে দিয়ে, মার খাবার ভয়ে পালালো ?

মে। আমার জন্যে সে মার খেতে কখনও ভয় পায়নি, আমার জন্যে সে অনেক কষ্ট—অনেক লাঞ্ছনা সো'য়েছে।

এই বলিয়া ত্রয়োদশ বর্ষীয়া মালতীমালা অজস্রধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সে আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি তাকে যে কষ্ট দিয়েছি, এখন সে সকল মনে হ'লে, গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌তে ইচ্ছে হয়। সে তোমাদের কাছে ধমক খেলে—মা'র খেলে, আমি খুব খুসি হতুম্ ব'লে, সে আমাকে খুসি করার জন্যে কত সময়ে আমার দোষ গোপন ক'রে—দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে, তোমাদের কাছে কত বকুনি খেয়েছে—কত মা'র খেয়েছে! সে যে কত ভাল, তোমরা জান না, তার নিন্দে কবো না। সে দেবতা—আর আমি রাক্ষসী।" মালতীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শেষ দিন যখন তুই কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া কাটা হাত—রক্তে ভেজা কাপড় দেখাইয়া বলিয়াছিলি যে, চিত্তদাদা হাত কাটিয়া দিয়াছে, আর সে তোর মুখের দিকে ক্ষণেক তাকাইয়া, শেষে নিজেকে এ বাড়ীর অনুপযুক্ত বলিয়া পালাইল, সেটাও কি তোর দোষ ?"

মালতী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হাঁ মা, সেও আমার দোষ।"

দেবসেবক ব্রাহ্মণ নীরব—নিরুত্তর। ব্রাহ্মণী মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন, "তুই নিজের হাত নিজে কাটিয়া, সেই পরের বাছাকে বাড়ী ছাড়া করিলি! তুই সত্যিই রাক্ষসী। মানুষের রক্ত তোর গায়ে থাক্‌লে, তুই কি এমন নিরপরাধ—শান্ত ভালমানুষ ছেলেটাকে চার্ পাঁচ বছর

ধরিয়া বিধিমতে কষ্ট দিয়া শেষে তাড়াইয়া দিতিস্!” ব্রাহ্মণ বলিলেন, “থাক্, আর ওকে কিছু ব'লো না। কর্ম্মফল যথেষ্ট ভোগ করিতেছে, আরও অনেক কষ্ট পাবে। আমি সেই দিন একটু সন্দেহ করিয়াছিলাম, কিন্তু এতটা ভাবিতে পারি নাই। মেয়েটার কপালে অনেক দুঃখ আছে। উহার ভবিষ্যতের যত দূর ভাবিতে যাই, সবই অন্ধকার—নৈরাশ্যময় বলিয়া বোধ হয়। এই অবস্থায় তাহার জন্য যে চেষ্টা করিতেছি, তাই বা করি কেমন ক'রে? আমি সামান্য লোক হইলেও, জ্ঞাতসারে কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিতে পারিব না।”

এই ছয় মাস কালব্যাপী যাতনা ভোগেই তাহার প্রায়শ্চিত্তের শেষ হইবে না—আরও কিছুকাল মালতী পিত্রালয়ে একাকী থাকিতে পাইবে, তাহার বাপের কথায় এই আশা পাইয়া, সে বালিকা এই গভীর যাতনার মধ্যে, এই অশ্রুজল ও দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্যে একটু আনন্দ—একবিন্দু শান্তি অনুভব করিল; কে যেন পদ্মহস্ত বুলাইয়া তাহার হৃদয়ের যাতনা জুড়াইয়া দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিবাহের চেষ্টাতে

প্রায় মাসাধিক কাল অতীত হইল, বিবিধ বিরক্তিকর চিন্তায় দিন কাটিতেছে। কিন্তু স্ত্রীলোকের মন ক্রমে শান্ত হইয়া আসিতেছে; তাই ব্রাহ্মণী একদিন অপরাহ্নে দেবসেবক ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "এমনি ভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে কি হইবে? যাহা হয়, একটা উপায় ত করিতে হইবে? মেয়ে মস্ত বড় হ'য়ে উঠ্‌লো, এর পর যে আর জাতজন্ম কিছুই থাকবে না। লোকে এমনই কত কথা বলে। একটা যা' হয় কর।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আচ্ছা পঞ্জিকাখানা দাও দেখি, কাল ভাটপাড়ায় যাওয়া যায় কি না দেখি।" পঞ্জিকা দেখিয়া ব্রাহ্মণ আগামী কল্যই ভাটপাড়া যাওয়া স্থির করিলেন। পরদিন যথাসময়ে আহারান্তে ষ্টেশনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আজ আর পথে কোন প্রকার অশুভ দর্শন নাই। ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখেন, বামদিক্ দিয়া একটী মৃতদেহ লইয়া গঙ্গাতীরে চলিয়াছে। ব্রাহ্মণ সেই শবকে মনে মনে নমস্কার করিয়া ভাবিলেন, ভালই হইল, আজিকার যাত্রা শুভ হইল। ষ্টেশনে গিয়া একখানি নৈহাটীর তৃতীয় শ্রেণীর টীকিট লইয়া বাষ্পীয় রথের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। গাড়ী আসিবামাত্র ব্রাহ্মণ অতি সাবধানে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। বসিয়া দুই একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উপস্থিত ভাবনার ভার কিঞ্চিৎ কমাইতে না কমাইতে, ঘণ্টা বাজিল, গাড়ীও "হুস্ হাস্—হুস্ হাস্" শব্দে ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে চলিল। ব্রাহ্মণ গাড়ীতে বসিয়া দুই একবার দক্ষিণে ও বামে তাকাইতে না তাকাইতে, গাড়ী ইছাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন,

কি আশ্চর্য্য! চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে কোথাকার লোক কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কি কল-ই করেছে, এমন না হ'লে কি বুদ্ধি! বলিহারি যাই! গাড়ী শ্যামনগর পৌছিবার পূর্ব্বক্ষণে বামদিকে গ্রামপ্রান্তে—এক শৃগালের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণ মনে মনে শুভলক্ষণ সকল স্মরণ করিয়া খুব জোরের সহিত মনে মনে বলিলেন, "অদ্যকার যাত্রা শুভ, একে দিন ভাল, তাহাতে বামে শবশিবা রাখিয়া চলিয়াছি, অদ্যকার কার্য্য অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।" এই চিন্তা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ নৈহাটীর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত।

পাত্রের প্রদত্ত নাম ও পরিচয় ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া, দুই একজন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র ব্রাহ্মণ গন্তব্যস্থান প্রাপ্ত হইলেন। গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া, "ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ী আছেন" বলিয়া একাধিকবার ডাকিতে না ডাকিতে খোদ শ্রীযুক্ত হলধর বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক বৃহৎ শামুকের মুখের পুঁটুলি খুলিয়া নস্য বাহির করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া নস্যের টিপ্‌টী নাসিকার ছিদ্রদ্বয়ে সবলে প্রবিষ্ট করাইয়া, প্রবল উৎসাহে সশিখা মুণ্ডিত মস্তক আন্দোলিত করিয়া, অপরিচিত ব্রাহ্মণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। নস্যের প্রথম রাগটা কাটিয়া গেলে পর, বর্গের পঞ্চমবর্ণবর্জ্জিত ভদ্রোচিত শিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যাগতের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরস্পর অভিবাদনান্তর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, বাহির বাটীতে উভয়ে আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপর বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অভ্যাগত দেবসেবকের এরূপ ক্লেশস্বীকার ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত অবগত হইলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পাত্রপক্ষীয় অভিভাবকের ন্যায় সকল কথা দেবসেবককে বলিয়া, পরে পাত্রীর রূপগুণের কথা কিছু কিছু শুনিতে চাহিলেন। তৎপরে ক্ষণকালের জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র ভোলানাথকে ব্রাহ্মণের নিকট রাখিয়া, এবং তাঁহার পরিচর্য্যার্থে সর্ব্বপ্রকার উপকরণে সজ্জিত একটী হুঁকা হাতে

দিয়া, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একবার গৃহিণীর দরবারে বিদ্যার পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলেন। গৃহে অপর কেহ নাই। ঠাকুরাণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "অয়ি শঙ্করি! আজি একটী সুসংবাদ লইয়া আসিয়াছি, অগ্রে কি বিদায় দিবে দাও।" গৃহিণী একগাল হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সংবাদ না শুনিয়া —সু কি কু, না বুঝিয়া—সু হইলেও তার ওজন কতটা তার মাপ না করিয়া কি বিদেয়ের ব্যবস্থা হয়? না জেনে না শুনে, তোমরা যেমন ব্যবস্থা দিয়ে, লোক ঠকিয়ে বিদেয় আদায় কর, এখানে ত আর তা হবে না। এখানে যেমন আয়োজন, তেমনি পরিণাম, এখানে যেমন কাজ, তেমনি বিদেয়, জান ত, আজ ত আর নূতন নয়। কি খবর বল দেখি, কাজ বুঝে বিদেয় পরে দিব।" কর্ত্তা বলিলেন, "নমুনাটা না হয় এখনই দেখ'য়ে দাও না।" গৃহিণী বলিলেন, "তথাস্তু"।

পুনরায় বাহির বাটীতে ফিরিয়া গিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয় দেবসেবক জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলেন, "আমি গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, আগামী রবিবার জননীসহ পাত্রকে আমাদের বাড়ীতে আনাইব। তাহার পর সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া যেরূপ স্থির হয়, সেই দিন কিংবা তাহার পরদিন পত্রের দ্বারা আপনাকে জানাইব। আপনার প্রস্তাবে আমার এবং আমার গৃহিণীর আপত্তি নাই। ইত্যবসরে আপনি কন্যাটীর গণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় স্থির করিয়া রাখিবেন। আলাপে আপনার যেরূপ পরিচয় পাইলাম, তাহাতে আপনার সহিত কুটুম্বিতা করিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আপনি অতি মহাশয় লোক" বলিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয় আর একবার দ্বিগুণিত উৎসাহের সহিত শামুকের মুখ খুলিয়া বৃহৎ এক টিপ নস্য নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া বিকটাকার মুখ ভঙ্গিমায় জগন্নাথের দিকে তাকাইয়া রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সায়াহ্নে সায়ংসন্ধ্যা ও তৎপরে আহারাদি সমাপন, না হয়, অন্ততঃ কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে গেলে হয় না?" জগন্নাথ

ধূম পান করিতে করিতে বিষম খাইয়াছেন, ধূম-গোলক নিষিদ্ধ পথে পদার্পণ করিয়া এই গোলটী বাঁধাইয়াছে। ব্রাহ্মণ বহুকষ্টে আত্মস্থ হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তাহা হইলে, মহামায়ার সেবা হইবে না। গৃহে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, আমি তাঁহার সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করিতে পারিব না। ফলকথা এই যে, আহারাদি বিষয়ে আমি চিরদিনই আপনার দ্বারস্থ থাকিব।" বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সমধিক সম্মানিত হইয়া মুদ্রিত নেত্রে দন্তে জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "নারায়ণ! নারায়ণ! এমন কথা কি মুখে আনিতে আছে? আপনি অতি বড় মহাশয় লোক, আপনার সহিত আত্মীয়তা পরম সৌভাগ্যের কথা—ইহাতে সুখী হইব—সুখী হইব।" জগন্নাথ বলিলেন, "কন্যার গণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় না পাইলে, এ কার্য্য সম্পন্ন করায় কি ব্যাঘাত পড়িবে?" বিদ্যাবাগীশ বলিলেন, "আজ কাল লোকে ক্রমে ওগুলা ছাড়িয়া কেবল স্বঘর দেখিয়া এবং সাংসারিক অবস্থাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু শাস্ত্রাদির অনুসরণ করিলে, এ সকল বিষয় দেখা নিতান্ত আবশ্যক। কেন, আপনার কি সুবিধা হইবে না?" জগন্নাথ বলিলেন, "মেয়ে ব'লে আর কোষ্ঠী করান হয় নাই। এখন কি হয়?" বিদ্যাবাগীশ বলিলেন, "কেন হবে না? তেমন অভিজ্ঞ লোক হ'লে এখনও করিয়া দিতে পারে।" এই বলিয়া পরস্পরে কোলাকুলি করিয়া বিদায় লইলেন।

পাত্রীর পরিচয় ইত্যাদিতে কিছু খুঁত থাকিয়া যায় এবং গণ ইত্যাদি প্রস্তুত করান আবশ্যক, এইরূপ চিন্তায় ব্রাহ্মণ কয়েক দিন কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে ভাটপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত হলধর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পত্র আসিল। পত্রার্থ অবগত হইয়া জগন্নাথ অধিকতর বিব্রত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পত্রখানি এই :—

শ্রীশ্রীহরিশরণম্।

সম্মান ও নমস্কার পুরঃসর নিবেদনম্।

গত রবিবার লোকনাথ ও তাঁহার জননী আমার সমভিব্যাহারে মদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন। আমাদের সকলেরই সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, জানিবেন। নিম্নলিখিত প্রশ্ন দুইটীর সন্তোষজনক উত্তর দান করিয়া আমাদের অমূলক সন্দেহ ভঞ্জন করিলে, আমি দিন স্থির করিয়া ও আপনাকে সংবাদ দিয়া পাত্রীটাকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিব। অনুগ্রহ করিয়া ত্বরায় পত্রের উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

১। লোকনাথের মা বলিতেছেন যে, তিনি গঙ্গাস্নানে গিয়া আপনার কন্যাটী দেখিয়া আসিয়াছেন। কন্যাটী পরমা সুন্দরী বলিয়া তিনি পুত্রবধূ করিবার মানসেই সংবাদ লইয়া অবগত হইয়াছিলেন যে, মেয়েটী আপনার, কিন্তু আপনার প্রতিবেশীমণ্ডলীমধ্যে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কন্যাটী আপনার নহে। এ জনশ্রুতির কি কোন মূল আছে? বলা বাহুল্য যে, আপনার কথাই প্রামাণ্য হইবে।

২। কন্যাটী যদি আপনার ঔরসজাত না হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই, যদি তাহার পিতৃপরিচয় আমাদের করণীয় ঘর হয়, আর তাহার গণ ও রাশি ইত্যাদি অন্তরায় না হয়, তাহা হইলেও আমরা এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি। পাত্রের জননী কন্যাটী দেখিয়া পছন্দ করিয়াছিলেন, তাই তিনি পুত্রের বিবাহে, প্রয়োজন হইলে, এস্থলে কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত আছেন।

আপনার পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত লোকনাথ ও তাঁহার জননী আমার এখানেই থাকিবেন।

অত্রপত্রে আমার সবিনয় নমস্কার জানিবেন, জ্ঞাতার্থে নিবেদন ইতি,

সন ১২৭১ সাল ৩রা বৈশাখ। একান্ত বশংবদ

শ্রীহলধর শর্ম্মা।

নবম পরিচ্ছেদ

কুম্ভীরের মুখে

উপযুক্ত রক্ষক পরিবেষ্টিত হইয়া বৈদ্যনাথের চালান পদ্মা পার হইয়া যমুনা—যমুনা হইতে ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়া আসাম অঞ্চলে অগ্রসর হইতেছে। চিত্তরঞ্জনও ঐ দলভুক্ত হইয়া চলিয়াছে। প্রথম দিনটা তাহার বড়ই অসুখে কাটিয়াছে। শরীরের যাতনা ও মনের গ্লানি দুয়ে মিলিয়া তাহাকে একেবারে নির্জীব করিয়া রাখিয়াছিল। সে নীরবে এক স্থানে পড়িয়া অনাহারে সমস্ত দিনটী কাটাইয়া দিয়াছে। সন্ধ্যার সময়ে মাথা তুলিয়া একটীবার চারিদিকে তাকাইতে সে দৃশ্য তাহার ভাল লাগিয়াছিল। বৈদ্যনাথের এক ভৃত্য ঠিক সেই সময়ে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কিছু খাবে"? চিত্তরঞ্জন আহারের সংপক্ষে মাথা নাড়িয়া মুখ ধুইবার জন্য একটু জল দিতে বলে। তখন সেই ভৃত্য শশব্যস্তে জল—তৎপরে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনিয়া দেয়। চিত্তরঞ্জন মুখ ধুইয়া অতি কষ্টে জলযোগ করিতে তাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। দেখিয়া সেই ভৃত্যটী নিকটে গিয়া বসে ও ক্রমে ক্রমে বালকের সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে আর কোন কথাই কহে নাই, কেবল অনিমেষ নয়নে অকূল জলস্রোতের শোভা দেখিতেছিল।

একদিকে নদীতট নিকটে হইলেও, নদীর অপর পার নয়নগোচর হয় না। বোধ হয়, যেন আকাশ জলে ডুবিয়া গিয়াছে, আর উভয়ের সন্ধিস্থলের একটী কৃষ্ণকায় সূক্ষ্ম রেখা কল্পনা করা যায় মাত্র, আর কিছুই বুঝা যায় না। এইভাবে রাশীকৃত জল স্রোতমুখে প্রবলবেগে

পশ্চাদ্দিকে চলিয়াছে—চিত্তরঞ্জন ভাবিতেছে এত জল কোথায় চলিয়াছে! সে পুস্তকে পড়িয়াছে অনেকগুলি ক্ষুদ্র নদী মিলিত হইয়া একটা বড় নদীতে পরিণত হয়—আর এইরূপ বড় বড় নদী আবার সমুদ্রে গিয়া দেহপাত করিয়াছে। আবার ভাবিতেছে অনবরত জল সমুদ্রে গিয়া পড়িলে সমুদ্র ত বড় হইয়া যাইবে। পরক্ষণে তাহার স্মরণ হইল, যেমন অসংখ্য নদীমুখে রাশি রাশি জল সমুদ্রগর্ভে গিয়া পড়িতেছে, আবার সমুদ্র হইতে তদ্রূপ রাশি রাশি জল নিয়ত বাষ্পাকারে আকাশে উঠিয়া মেঘে পরিণত হইতেছে। তাই "হরে দরে হাঁটু জল।" এমন সময়ে অন্ধকারে চারিদিক আবৃত হইয়া আসিল। ক্ষণকাল সেই অন্ধকারে নীরবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে চিত্তরঞ্জন ঘুমাইয়া পড়িল।

শীতকালের রাত্রি দিনের দ্বিগুণ বলিয়া বোধ হয়। তাই রাত্রি শেষে চিত্তরঞ্জনের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল, শরীরের বেদনাও অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। জাগরিত অবস্থায় অনেক ক্ষণ শয়ন করিয়া ক্লান্ত হইল, অন্য যাহারা জাগিয়াছিল, তাহারা তামাক খাইয়া আবার শয়ন করিল ও ঘুমাইল। কেবল বৈদ্যনাথের একটী বিশ্বাসী ভৃত্য জাগিয়া চৌকিদারী করিতেছে। চিত্তরঞ্জন দেখিল, কেহ যদি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, সে সামান্য চেষ্টায় পলায়ন করিতে পারে। চিত্তরঞ্জনের ইচ্ছা হইল, সে সুযোগমত একবার পলায়নের চেষ্টা করিয়া দেখিবে। কিন্তু আজ নহে। নৌকাখানি কতদূর আসিয়াছে, কোন্ নদী দিয়া চলিয়াছে, নিকটবর্ত্তী দেশ কোন্ দেশ, সেখান হইতে আসামের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিতে কত সময় লাগিবে, অদ্যকার প্রাতঃকালের মত সুবিধা আর কতবার আসিতে পারে, তাহা আগে জানিয়া তারপর পলায়নের চেষ্টা করিবে।

পরদিন সে সমযাত্রিদিগের নিকট কোন সন্ধানই পাইল না। ঐ সকল পথের এবং পথের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের, প্রকৃত সংবাদ নৌকার

উপর কেবল বৈদ্যনাথের কর্ম্মচারীরা ও মাঝি মাল্লারা জানে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কোন কথার উত্তর দিবে না। চিত্তরঞ্জন বুদ্ধিমান্, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাও করিবে না, কারণ তাহা হইলে বৈদ্যনাথের ভৃত্যবর্গ তাহার উপর সন্দেহ করিতে পারে। সুতরাং তাহার কোন সংবাদই লওয়া হইল না। কিন্তু সে পথের মধ্যে পলায়নে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে। একদিকে সে ক্রমে ক্রমে সকলের সঙ্গে একটু মেলামেশা আরম্ভ করিয়াছে, অপর দিকে পলায়নের সুযোগ খুঁজিতেছে। এইভাবে সুযোগের অপেক্ষায় কয়েক দিন কাটিয়া গেল। সুযোগও হইতেছে না, অভীষ্টও সিদ্ধ করিতে পারিতেছে না।

ভড় নৌকায় গৌহাটী পৌছিতে একবেলা লাগিবে, এমন স্থানে নদীর তীর হইতে কিঞ্চিদ্দূরে চিত্তরঞ্জনদের নৌকাখানি রাত্রিতে নঙ্গর করা আছে। ইচ্ছা করিলেই তথা হইতে পলায়ন তত সহজ নহে। কারণ সেখানে চারিদিকে অনেক নৌকা আছে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন জানিতে পারিয়াছে যে, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌছিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পলাইতে না পারিলে, আর সুযোগ ঘটিবে কি না সন্দেহ। এই ভাবিয়া চিত্তরঞ্জন ভাগ্যে ভর করিয়া মাঘ মাসের রজনী শেষে প্রভাতের অনতিপূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের জলে অবতরণ করিল। বৈদ্যনাথের ভৃত্য শয়ন করিয়াই "কি শব্দ হইল, কি শব্দ হইল" বলিয়া দু'টীবার জিজ্ঞাসা করিয়াই উঠিয়া বসিয়া প্রদীপ জ্বালিয়াছে, কাহারও পলায়নের সন্দেহ আদৌ তাহার মনে উদিত হয় নাই। তাহার ভয় হইয়াছে যে, কেহ হয়ত পড়িয়া গেল। আলো জ্বালিয়া যখন দেখিল চিত্তরঞ্জন নাই, তখন সে নৌকার বাহিরে আসিয়া দেখিল, দূরে সন্তরণ শব্দ হইতেছে। তখন তাহাকে ধরিবার জন্য নিজের লোকজন সব জাগাইল। কেহই সাহস করিয়া মাঘ মাসের ব্রহ্মপুত্রে সাঁতার দিয়া পলায়নপর চিত্তরঞ্জনকে ধরিতে

অগ্রসর হইতেছে না, দেখিয়া ভৃত্য অধিকতর ব্যস্ত হইয়া, পাঁচ টাকা বক্‌সিস্ প্রচার করিল। তাহার চীৎকারে ও বক্‌সিসের প্রলোভনে চিত্তরঞ্জনের সন্তরণপথের পার্শ্ববর্ত্তী নৌকা সকলের মাঝি মাল্লা ও যাত্রিগণ জাগরিত হইল। ক্রমে উষার আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। চিত্তরঞ্জনের নৌকার ও অন্যান্য নৌকার কেহ কেহ পুরস্কারের লোভে আলস্য ত্যাগ করিয়া পলায়িত ব্যক্তিকে ধরিবার চেষ্টাও করিল, কিন্তু সন্তরণপটু চিত্তরঞ্জন সকল শত্রুকে পশ্চাতে রাখিয়া পলায়ন করিতেছে। দূরে একটা বৃহৎ কুম্ভীর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে, এমন সময়ে একখানি বজরা হইতে একটী ক্ষুদ্রকায় কুকুর এই ব্যাপার দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সে ডাকিতে ডাকিতে, বজরার ভিতর যাইতেছে, আবার দৌড়িয়া বাহিরে আসিতেছে। কুকুরের এই হাঁক ডাকে ও দৌড়াদৌড়িতে এক সাহেব ত্বরিত পদে বাহিরে আসিয়া তাঁহার ন্যাকের (Nack) চীৎকার ও ছুটাছুটীর গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন। সাহেব, এই ব্যাপার এবং সঙ্গে সঙ্গে বালকের সাহস ও সন্তরণপটুতা দেখিয়া আনন্দিত হইয়া, তাহাকে ইঙ্গিতে বজরায় উঠিতে বলিলেন। চিত্তরঞ্জন একদিকে স্বদেশীয় আততায়ীর অত্যাচার হইতে, অপর দিকে কুম্ভীররাজের মুখগহ্বর হইতে রক্ষা পাইবার প্রত্যাশায় এই বিদেশীয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া বজরার দিকে অগ্রসর হইল। প্রভুর আদেশের মর্ম্ম বুঝিয়া এবং আপনার চীৎকারের ফল ফলিল দেখিয়া, ন্যাক্ আনন্দে তাহার সলোম ক্ষুদ্র পুচ্ছটী নাড়িয়া বজরার উপর অতিমাত্র ব্যস্ততার সহিত ছুটাছুটী করিতে লাগিল। সে একবার বালকের সন্তরণ পথের দিকে, আরবার প্রভুর চরণপ্রান্তে, এই ভাবে ছুটাছুটী করিতে ও মাঝে মাঝে আনন্দের পরিচায়ক সূক্ষ্ম স্বরে ডাকিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে সাহেবের আদেশে সাহেবের লোকেরা কুম্ভীরের গ্রাস হইতে বালককে বজরায় উঠাইয়া লইল। বজরায় উঠিবামাত্র ন্যাক্ অগ্রসর হইয়া

তাহার অভ্যর্থনা করিল। উৎসাহে ও আনন্দে ন্যাকের সুরসাল জিহ্বার অগ্রভাগ অমৃতবর্ষণ করিতে লাগিল। এই অপরিচিতের প্রাণ রক্ষা পাওয়াতে, ন্যাকের বিমল আনন্দ, সাহেবের হৃদয় আর্দ্র করিল। সাহেবের ওজন করা দয়ার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সাহেব সস্নেহ দৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

যে পাঁচ বৎসর, বালক দেবসেবকের বাটীতে বাস করিয়াছিল, সে সময়টা সে কেবল আহার বিহারে ও মালতীর সহিত খেলা ধূলায় কাটায় নাই। কিছু লেখা পড়াও সে শিখিতেছিল। চিত্তরঞ্জন বারাকপুরের ইংরাজি স্কুলে চারি বৎসরের অধিক কাল লেখা পড়া শিখিতেছিল, যখন সে চলিয়া আসিল, তখনও সে বিদ্যালয়ের ছাত্র। বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছিল। শ্রমশীলতা ও বুদ্ধিমত্তাগুণে বালক বেশ কিছু শিখিয়াছিল। কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটিলে, হয় ত বালক এক এক করিয়া উচ্চ পরীক্ষা সকলে উত্তীর্ণ হইয়া সে সময়ের বিদ্বান্‌গণের প্রধান একজন হইতে পারিত। তাহার ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটিল না। কিন্তু, সে ভদ্রতাসঙ্গত সাধারণ রীতিনীতি শিখিয়াছিল, আশ্রয়দাতার আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়, উপকারীজনের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে হয়, এ সকল শিক্ষা তাহার হইয়াছিল। বজরায় উঠাইবামাত্র চিত্তরঞ্জন সাহেবের সম্মুখে গভীর কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক মুখে নীরবে নত দৃষ্টিতে দাঁড়াইল। ন্যাক্ বড় বেশী বাড়াবাড়ি করিতেছিল, তাই একটু ইঙ্গিতে তিরস্কার করিবামাত্র সারমেয়-তনয় পুচ্ছ নত করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে উপবেশন করিল এবং সাগ্রহে বালকের প্রতি প্রভুর ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। চিত্তরঞ্জনকে দেখিয়াই সাহেব স্থির করিলেন যে, এ বালক এ দেশীয় ভদ্রসন্তান। তাই সাহেব নিজ বাবুকে ডাকিয়া পরিবার ও গায়ে দিবার কাপড় দিতে বলিয়া আর্দ্রহৃদয়ে বালকের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "টুমি কে আছ ?"

চি। আমার নাম চিত্তরঞ্জন।

সা। টোমার ঘর কোঠায় ?

চি। বারাকপুরের ঠাকুরবাড়ীতে।

সা। টুমি লিখ্‌টে পড়্‌টে জান ?

চি। হাঁ জানি।

সা। কি জান ?

চি। ইংরাজি বাঙ্গালা দুই কিছু কিছু জানি।

সা। You are a good boy, (১) আচ্ছা টুমি কাপড় বডল্‌ করো।

চি। উহারা যদি আমাকে আবার ধরিতে আসে ?

সা। হাম্‌ সব বড্‌মাস্‌কো ভাগায় ডেঙ্গে—কুচ্‌ ডর নেহি হায়। মজাসে বৈঠ্‌ রহো।

চি। Thank you, Sir (২)

সা। Oh ! you can speak English, I am glad of your boldness. (৩)

চিত্তরঞ্জন রক্তিমাভমুখ নত করিয়া সাহেবের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সাহেব বজরার মধ্য হইতে একখানি চৌকি বাহিরে আনিয়া বসিয়া, খোস মেজাজে চুরুট টানিতে লাগিলেন। জ্যাক্‌ প্রভুর পদতলে শয়ন করিল। চিত্তরঞ্জন কাপড় ছাড়িয়া, গায়ে কাপড় দিয়া বাবুর নিকট গিয়া বসিল। বাবু সাহেবের মুহুরী। নাম পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গালা জানেন। ২৫৲ টাকা বেতনে সাহেবের

(১) তুমি ভাল ছেলে।

(২) আপনাকে ধন্যবাদ।

(৩) তুমি ইংরাজীও বল্‌তে পার, আমি তোমার সাহসে খুসী হইলাম

চাকরি করেন। সাহেব আপনার কর্ম্মচারীদের মধ্যে পঞ্চাননকে একটু বেশী ভালবাসেন, তাই আড্ডার বাহিরে যাইতে হইলে, পঞ্চাননকেই সঙ্গে লইয়া যান। আর এক কথা, পঞ্চানন সাহেবের ধাত বুঝেন। সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়াও সর্ব্বদাই সাহেবের মনের মত কাজ করিতে পারেন, তাই সাহেব পঞ্চাননের প্রতি একটু বিশেষ অনুরক্ত। পঞ্চাননের প্রধান অভাব ইংরাজী জানেন না,—তাঁহার মহৎ দোষ, সাহেব বার বার বলিয়াও তাঁহাকে ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত করাইতে পারেন নাই। পঞ্চাননের বিশ্বাস ইংরাজী শিখিলে খৃষ্টান হইয়া যায়—তাই সাহসে কুলায় না। কিন্তু ইংরাজী না শিখিয়াও সাহেবের প্রীত্যর্থে সময়ে সময়ে খৃষ্টানের অধম আচরণও তিনি করিয়া থাকেন। তাই সাহেব পঞ্চাননের এই গুরুতর দোষ ভুলিতে পারেন না।

পঞ্চানন অদ্যকার সূর্য্যোদয় ঘোর অমঙ্গলের বার্ত্তাবহ বলিয়া অনুভব করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তাই তিনি দ্বাদশ বার ইষ্টদেবতার নাম জপ করিলেন এবং অবসর মত কোষ্ঠীর ফলাফল গণনা করাইয়া গ্রহশান্তির আয়োজন করিবেন, মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন।

পঞ্চানন চিত্তরঞ্জনকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বসিতে বলিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নাম কি ?"

চি। আমার নাম চিত্তরঞ্জন।

প। চিত্তরঞ্জন কি ?

চি। আর কিছুত জানি না।

প। আপনি ব্রাহ্মণ ?

চি। আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই আমার বোধ হয়, কিন্তু আমি আশৈশব পথে পথে, তাই নিজের পরিচয় জানি না।

পঞ্চানন ক্ষণকাল অভ্যাগতের মুখের দিকে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া

তাকাইয়া নীরবে নিকটে বসিয়া রহিলেন। কেহ কাহারও সহিত কথাই কহিল না। বেলা প্রায় নয়টার সময়ে, সাহেব ছোট হাজিরার পর, চিত্তরঞ্জনকে আপনার কামরায় ডাকাইয়া লইয়া গেলেন। সাহেবের বজরা চলিতেছে—ক্রমে গৌহাটী আসিয়া পৌছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

ভীষণ পণে

মদনমোহন অগ্রে অগ্রে, বৈদ্যনাথ তাহার পশ্চাতে ত্বরিত পদে গৃহে প্রবেশ করিলেন। বৈদ্যনাথ মোক্ষদার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে পরিচারিকাকে ভূশয্যায় শায়িত দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারেন নাই। নিকটে গিয়া দেখেন পরিচারিকা হৃতচৈতন্যা—অবশ দেহে শায়িতা, আরও নিকটে গিয়া দেখেন, একখানি বস্ত্রের কিয়দংশ গলদেশে রজ্জুর ন্যায় সংলগ্ন। ভয়ে বিহ্বল, বৈদ্যনাথের শ্বাসরোধ হইয়া আসিল, প্রাণ ভরিয়া নিঃশ্বাস ফেলিবার মানসে বৈদ্যনাথ গৃহের উপর দিকে তাকাইতে, দেখিতে পাইলেন, গললগ্ন বস্ত্রের অপরার্দ্ধ উপরে লম্বমান। তখন পরিচারিকার কার্য্যের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া মদনকে বলিলেন, "তোর বাবাকে ডাক্।" পরে নিকটে গিয়া অতি আর্ত্তভাবে—অতি স্নেহভরে "মোক্ষদা—ও মোক্ষদা" বলিয়া ডাকিলেন। মোক্ষদা তখন সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মৃতের ন্যায় পতিতা, কে বৈদ্যনাথের কথার উত্তর দিবে? বৈদ্যনাথ ক্ষিপ্রহস্তে মোক্ষদার গলার বস্ত্র-বন্ধন মোচন করিলেন, মুখে ঘন ঘন জলের ছাট দিয়া, পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। ষোলআনা মৃত্যুকামনা

মোক্ষদার হৃদয় অধিকার করিলেও তাহার মৃত্যু হয় নাই। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড মোক্ষদার দেহভার সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। তাই সামান্য পরিচর্য্যাতেই মোক্ষদার চৈতন্যোদয় হইল। বৈদ্যনাথ অতি ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোক্ষদা! বিনা মেঘে এ বজ্রাঘাত কেন? আমি সহসা এমন কি অপরাধ করিলাম যে তুমি এমন গর্হিত কাজ করিলে?"

মোক্ষদা অনেকক্ষণ বৈদ্যনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার সে মর্ম্মভেদীদৃষ্টিতে যেন ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের মিলন হইল। মোক্ষদা কি ছিল, কি হইয়াছে এবং কি হইবে, সবই যেন তাহার নয়নসমীপে চিত্রিত বলিয়া বোধ হইল। তাই মোক্ষদার শুষ্ক ও সন্তপ্ত নয়নপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল, বিন্দু ক্রমে বৃহৎ হইল। ক্রমে সেই মুক্তাফলসদৃশ অশ্রুগোলক মুক্তালতায় পরিণত হইয়া গণ্ড অতিক্রম করিল ও ক্রমে ধারায় পরিণত হইল।

মোক্ষদা সুগঠিত খর্ব্বাকৃতি—তন্বঙ্গী—সুন্দরী—প্রৌঢ়া-যুবতী। তাহার বয়ঃক্রম দ্বাত্রিংশ পার হইয়া ত্রয়োত্রিংশ চলিতেছে। মাথায় মাথাভরা চুল। এই শয়নে, সেই ঘনকৃষ্ণবর্ণ কুন্তলরাশি গৃহতলে লুটাপুটি খাইতেছে, দেখিলে তুলিয়া ধরিতে ইচ্ছা হয়। পাখার বাতাসে তাহারা ক্রীড়া করিতেছে, কেহ কেহ সেই তালবৃন্ত-তাড়নায় সঞ্চালিত হইয়া দল বাঁধিয়া মোক্ষদার ম্লান মুখে আসিয়া পড়িতেছে। বৈদ্যনাথ অমনি বাম হস্তে বাতাস করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তে সযত্নে ও সাদরে সেগুলি সরাইয়া দিতেছেন। বৈদ্যনাথের ব্যবহার কাতরতাব্যঞ্জক; মোক্ষদার মুখের ভাব, ঘনবিষাদ ও গভীর শোকের পরিচায়ক। তাহা হইলেও, সে মুখে শোভা ও সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। বৈদ্যনাথ আত্মবিস্মৃত হইয়া সুখে সে মুখের দিকে তাকাইয়া, বসিয়া বাতাস করিতেছেন এবং মোক্ষদার নয়নপ্রান্ত হইতে বার বার প্রবলবেগে প্রবাহিত অশ্রু মুছাইয়া দিয়া

কৃতার্থ বোধ করিতেছেন। কিন্তু মোক্ষদার হৃদয়ের গুরুভার বুঝিতে চেষ্টা করা তাঁহার অভ্যাস নহে। তিনি জানেন, স্ত্রীলোক অতি তরল প্রকৃতিবিশিষ্ট, সহজেই বিচলিত হয়, আবার সময়ে আপনা আপনি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। অন্ততঃ মোক্ষদাকে দেখিয়া তাঁহার এই জ্ঞান হইয়াছে। তাই তিনি বুঝেন, তাহার হৃদয়ভার লঘু করিবার চেষ্টা অপেক্ষা তাহার সেবা করা ও তাহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শনই প্রশস্ত। এই ভাবেই বৈদ্যনাথের গৃহে মোক্ষদার আট বৎসর কাটিয়াছে।

মোক্ষদা আর কখনও এরূপ ভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা করে নাই। কিরূপ আয়োজনে আত্মহত্যার চেষ্টা সফল হয়, তাহা সে জানিত না। তাই আজ চেষ্টা করিয়াও তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। মোক্ষদা ভাবিতেছে, শেষ হ'য়ে গেলে, সংসারের অনন্ত দুঃখ কষ্ট হইতে নিস্তার পাইত। আরও যে কত লাঞ্ছনা—কত যাতনা সহ্য করিয়া এরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া আজ তাহার হৃদয়ে গভীর ক্লেশ ও আক্ষেপের সঞ্চার হইতেছে, আর সেইজন্য অবিরল অশ্রুধারা গণ্ড প্লাবিত করিয়া কেশভার সিক্ত করিতেছে। আজ আট বৎসর মোক্ষদা নিজের হৃদয়ের ক্লেশের ভার গোপন করিয়া, অতি সন্তর্পণে তাহা হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে লুকাইয়া রাখিয়া বৈদ্যনাথের গৃহে বাস করিতেছে এবং নিজের শৈশব, বাল্য ও প্রথম যৌবন বিস্মৃত হইয়া—পিতামাতার স্নেহ মমতা—আত্মীয় স্বজনের অনুগ্রহ—সংসার জীবনের পরম সম্পদ, সংসারের বিষম বিপাকে ডুবাইয়া দিয়া—ভবিষ্যৎ চিন্তা—নিজের ভাগ্য—ভাগ্যের পরিণাম—ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই জলাঞ্জলি দিয়া বৈদ্যনাথের গৃহে বাস করিতেছে। মোক্ষদা কোথা হইতে আসিয়া কেন এরূপ অবস্থায় বৈদ্যনাথের আলয়ে আত্মগোপন করিয়া বাস করিতেছে, তাহা কেহই জানে না। বৈদ্যনাথও জানেন না। বৈদ্যনাথ যাহা জানেন, তাহা সমস্তই কল্পিত কাহিনী।

অদ্যকার আত্মহত্যার চেষ্টার মূলে কোন গুরুতর কারণ আছে ভাবিয়া এবং অদ্যকার ব্যাপার তত সহজ নহে মনে করিয়া, বৈদ্যনাথ বার বার অনুনয় বিনয় করিয়া মোক্ষদাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মোক্ষদা নিরুত্তরে—কাতর-দৃষ্টিতে—অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে, কোন কথার কোন উত্তরই দেয় না। কেবল থাকিয়া থাকিয়া এক একবার চারিদিকে তাকাইতেছে, চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া, সে আশ্রয়জ্ঞানে বৈদ্যনাথের মুখের দিকে তাকাইতেছে, আর চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছে। বৈদ্যনাথ পুনরপি অতি কাতব ভাবে বলিলেন, "মোক্ষদা! তুমি বল তোমার কি হ'য়েছে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, তোমার জন্য আমি তাহাই করিব।"

মো। তুমি আমার জন্য কি না করিয়াছ? সবই ত করিয়াছ। আমি পাগলের মত উলঙ্গপ্রায় অবস্থায় পথে পথে বেড়াতুম। তুমি আশ্রয় দিয়া, দীর্ঘকাল চিকিৎসা করাইয়া আমাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছ। তুমি আমার পেটের ভাত ও পরিবার কাপড় দিয়াছ। যে সব দ্রব্য কখন চাই নাই, তাহাও দিয়াছ। আর কি করিবে?

বৈ। এখন দেখিতেছি তাহা যথেষ্ট নহে। কি করিলে তোমার এ দুঃখ দূর হয়?—বল।

মো। তোমার সাধ্যের অতীত। তোমার নিকট আমার চাহিবার কিছুই নাই।

বৈ। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যাহা চাহিবে, আমি তোমাকে তাহাই দিব।

মো। তুমি ভিখারীকে ভিক্ষা দাও না, তবে আমার মত কাঙ্গালিনীকে তুমি আর কি দিবে?

বৈ। ভিখারীকে ভিক্ষা না দিলেও, তোমাকে ত দিতে ত্রুটি করিনি।

মো। কি দিয়েছ—এই সব?

বৈদ্যনাথ, অপ্রস্তুত হইয়া, সেই সবের দিকে তাকাইয়া, নীরব ইঙ্গিতে সায় দিলেন।

মো। এই বই ত নয়,—এই নাও। আর রোগে সেবার ফলে, স্নেহের কৌশলে ফেলিয়া তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছ, তাহা ফিরাইয়া দাও।

এই বলিয়া মোক্ষদা অঙ্গের বহুমূল্য আভরণ সকল উন্মোচন করিয়া বৈদ্যনাথের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "ইহার অধিক আর কিছু দিয়াছ কি?" বৈদ্যনাথ চকিত, ভীত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আমি কি তাই বলিলাম?"

মোক্ষদা বলিল, "মানুষ মানুষকে আর কি বলিবে? বলিলে, 'তোমাকে ত দিতে ত্রুটি করিনি!' আর কথা কহিও না, আমার সর্ব্বস্ব তুমি দিবে? আমি কি জন্য কি করিতেছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসা করিওনা—অনুসন্ধানও করিও না।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "তোমাকে বিচলিত ও বিরক্ত হইতে দেখিলেও কখনও ত এমন হও নাই। আজ এমন হ'লে কেন? তুমি বল, তোমার জন্য আমার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে আমি প্রস্তুত, রাগ করিও না—বল।

মো। তোমার যথাসর্ব্বস্ব তোমার টাকাগুলি ত? সে পাপের ধনে আমার কুলাইবে না। আমি আর কিছু চাই।

বৈ। আর কি চাই, বল—তাও দিব।

মো। তোমার আর যাহা ছিল, সে পাপও ত আমাকে স্পর্শ করিয়াছে। এখন আমার আর যাহা প্রয়োজন, তাহা তুমি কোথায় পাইবে?

বৈ। কি জিনিস্ বল?

মো। সে বস্তু তোমার নাই। আর যদি থাকিত, তাহা হইলেও, আজ হইতে তাহা, আমার এ ঘৃণা ও এ অভিমানদগ্ধ হৃদয়ের নিকট অস্পৃশ্য।

. . . .

এই কয়টী কথায় হৃদয়ের দৃঢ়তার পূর্ণ অথচ ক্ষুদ্র ছবিখানি দেখাইয়া মোক্ষদা নীরবে বৈদ্যনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া অজস্র ধারে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

বৈ। এ কি ভীষণ পণ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহের পরিণামে

মালতীমালার বিবাহের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীমণ্ডলীর মধ্যে পূর্ব্ব জনশ্রুতির নূতন আলোচনা আরম্ভ হইল। যাহারা নিষ্কর্ম্মা লোক, আলোচনায় তাহাদেরই উৎসাহ সমধিক প্রবল। এরূপ একটী সুযোগে তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। এই ভাবে আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক চলিতে চলিতে এক স্থানে বাদপ্রতিবাদকারীদের মধ্যে এক দিন হাতাহাতির আয়োজন হইয়া গেল। আর এক দিন আর এক স্থানে, প্রকৃত প্রস্তাবেই ধনঞ্জয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। দেবসেবকের গৃহের কথা লইয়া—মালতীর জন্ম কথা লইয়া, যখন পাড়ার লোকের ঘরের শ্রাদ্ধ বাহিরে গড়াইতে আরম্ভ করিল, তখন দেবসেবক জগন্নাথের দুঃখের অবধি রহিল না। গভীর আক্ষেপ ও পরিতাপে জগন্নাথ নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার গৃহিণী, এমন কি তাঁহাদের স্নেহের মালতীমালার নিকটও এই সকল সংবাদ পৌঁছিল। তের বছরের মেয়ে মালতী এই সকল গণ্ডগোলের কারণ বুঝিতে না পারিয়া এক দিন তাহার মাকে বলিল, "মা, পাড়ার লোক সব কি

কথা নিয়ে এত গোল করিতেছে? গাঙ্গুলীপাড়ার যোগমায়া বলিতেছিল, পরশু বিকেল বেলা বাঁড়ুয্যে বাড়ীর সদর বাড়ীতে, আমার কি কথা নিয়ে নাকি মারামারি হ'য়ে গিয়েছে?" মা বলিলেন, "পোড়া লোকের খেয়ে দেয়ে ত আর কোন কাজ নেই, কেবল পরের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রেই দিন কাটায়।" মালতী বলিল, "কেন মা, আমাকে নিয়ে এত গোল কিসের?" মা বলিলেন, "কি ক'রে জান্‌বো মা, আমি ত তাদের কোন কথা শুনিনি।"

অপরাহ্নে জগন্নাথ গৃহে আসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া মালতী ও মালতীর মা চকিত ও চিন্তিত হইলেন। দুজনেই সভয়ে জগন্নাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মালতী অতি মিষ্ট অতি কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তোমার কি অসুখ হ'য়েছে?"

ব্রা। হাঁ মা, আমার শরীর ভাল নয়।

মা। কেবল শরীরটাই ভাল নয়?

ব্রা। না, মনটাও খারাপ আছে।

মা। কেন বাবা, কেউ কি কিছু বলেছে?

গৃহিণী মালতীকে সাবধান করিয়া দিয়া, নিজেই বলিলেন, "পাড়ার লোকগুলা বুঝি তোমাকে বড় জ্বালাতন করে তুলেছে, না? এই কথা বলিতে না বলিতে, ব্রাহ্মণের চক্ষে জল আসিল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্লাবিতনেত্রে বলিলেন, "আমার জিনিস্—আমি লালন পালন করিলাম—আমি তাহার সুখ দুঃখের চিন্তা করিব—তাহার ভাল মন্দ বিচার করিব—তাহার সম্বন্ধে যাহা ভাল বুঝি, তাহাই করিব, তোদের কি, তোরা পরের কথায় থাকৃবি কেন—তোদের এত মাথা ব্যাথা কেন?"

মালতী ও মালতীর মা ব্যাপারটা বুঝিয়া আর কোন কথা বলিলেন না। মালতী কেবল পূর্ব্বের ন্যায় মিষ্টস্বরে বলিল, "বাবা, আমি তোমাকে

তামাক সাজিয়া দিতেছি, তুমি হাত মুখ ধু'য়ে ব'সো।" এই বলিয়া কন্যা তামাক ও হুঁকা কলিকা লইয়া পাকশালার দিকে চলিয়া গেল। এবং অনতিবিলম্বে হুঁকার জল বদলাইয়া ও তামাক সাজিয়া আনিয়া মালতী পিতার হাতে দিতে দিতে বলিল, "বাবা, তুমি ত লোকের কথায় সহজে রাগ করো না, তবে আজ কেন এমন হ'লো ?"

ব্রা। মা! তুমি এখনও ছেলে মানুষ আছ, তোমার মুখে সবই সাজে, যখন ছেলে মেয়ের মা হবে, তখন বুঝিবে, তোমার মত অত বড় আইবড় মেয়ে নিয়ে মা বাপের কত ভাবনা, আবার তার উপর লোকে কোন কথা বল্লে আরও কত কষ্ট হয়।

মা। তা তোমরা এত ব্যস্ত হ'য়েছ কেন ?

ব্রা। মা! আর দুদিন পরে জাত যাবে যে।

মা। তোমাদের মেয়ের বিয়ে না হ'লে জাত যাবে? আর ওপাড়ার মুকুয্যে বাড়ীর ভুতোর যে অত বড় বে'ান আইবড় আছে, তাদের জাত যায় না? কুলীনের ঘরে মস্ত বড় মেয়ে রয়েছে, এমন কত ঘরে কত আছে, তাদের কি জাত যায় ?

ব্রা। তাদের 'ঘর বর' পায় না বলে, বিয়ে হয় না, জাতও যায় না। বর না পেলে ভিন্ন কথা। আমার ত আর তা নয়।

মা। আমার যদি এমন কোন রোগ থাকতো, যাতে কেউ বিয়ে করতে চাইত না, তাহ'লে কি হ'তো ?

ব্রা। আমি তা হ'লে তোমার বিয়ের চেষ্টা করতুম না।

মা। তাই কেন মনে কর না ?

ব্রা। কেন তা মনে করবো? তোমার ত কোন রোগ নেই, আমিও আমার সোণার মালতীর জন্য বর পেয়েছি। লোকে কেন বাধা দিবে!

এই বলিয়া, ব্রাহ্মণ বহুক্ষণের লুক্কাইত ক্লেশ ও ক্ষোভের পরিচায়ক

অশ্রু ধারায় মুখমণ্ডল ও বক্ষ ভাসাইয়া দিলেন। "বাবা—বাবা—ও কি বাবা—তুমি কেন"—বলিয়া মালতী সত্বর নিজের অঞ্চলে বাপের অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে চীৎকার করিয়া মাকে ডাকিল। মা এক ডাকেই পাকশালা হইতে ছুটিয়া আসিলেন, আসিয়া স্বামীর অশ্রুজল—গ্লানিভরা মুখ দেখিয়া, নিতান্ত কাতর ও বিষাদিত হইয়া বলিলেন, "কেন তুমি এই সব ছোট লোকদের কাছে যাও, দরকার কি? তিনটে প্রাণী বই ত নয়। না হয়, মেয়েটার বিয়ে হবে না। কি করবো তুমি কেঁদ না। না হয়, যা আছে, বেচে কিনে এদেশ ছেড়ে চল কাশী যাই। মেয়ের বরাতে থাকে, বিয়ে হবে, না থাকে হবে না। আমাদের জিনিস্ আমরা সুখী করতে পারি ভালই, না পারি গলায় বেঁধে গঙ্গায় ডুবে মরবো, সেও ভাল, তবু লোকের কথা শুন্‌বো কেন? না—তুমি আর ঐ সব লোকের কাছে যেও না।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণীও নিজ অঞ্চলে ব্রাহ্মণের অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন। ক্ষণকাল প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে কর্ত্তার মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া বলিলেন, "কি জানি, তোমাকে আজ বড়ই খারাপ দেখাচ্ছে। তুমি যাও—একটু শুয়ে থাক। ওবাড়ীর গোবিন্দ ঠাকুরের আরতি করিবে। তোমাকে দেখে বোধ হ'চ্চে তোমার অসুখ হবে।"

ব্রাহ্মণীর কথাই সত্য হইল। সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মণের জ্বর আসিল। ব্রাহ্মণ শয়ন করিলেন। মালতী তাড়াতাড়ি চারটী ভাত নাকে মুখে গুঁজিয়া দৌড়িয়া বাবার কাছে গেল। শিয়রে বসিয়া কন্যা পিতার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। গৃহিণীও ইত্যবসরে ঠাকুরবাড়ীর ও পাকশালার কাজ শেষ করিয়া বাটীর অন্যান্য দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণের জ্বর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মালতীর মায়ের ভাবনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অর্দ্ধ রাত্রিতে কন্যাকে শয়ন করাইয়া ব্রাহ্মণী নিজে ব্রাহ্মণের সেবা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "দেখ, এই জ্বরই

আমার কাল হইবে, এতেই আমি চলিলাম। যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া মেয়েটীকে নিয়ে কাশীতে তোমার কাকার কাছে গিয়ে থাকিবে। আর ত এমন নিকট আত্মীয় কেহ কোথাও নাই, যেখানে থাকিতে পার, তাই জ্ঞান থাকৃতে থাকৃতে বলিয়া রাখিলাম, কেবল সেই খানেই মেয়েটীকে নিয়ে নিরাপদে থাকৃতে পারবে। আর যাহাকে বিশ্বাস করবে তাহারই হাতে ঠকিবে।

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে, প্রেমপূর্ণ উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া, ব্রাহ্মণকে কিছু তীব্র ভৎর্সনা করিলেন, কিন্তু এই স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ এই যে, নিজের ভাবী বিপদ ও অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া একটী বারও দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। ব্রাহ্মণ যেখানে অর্থ ছিল, তাহা দেখাইয়া দিলেন। টাকাকড়ি ও অলঙ্কারাদিতে যে অর্থ মজুত ছিল, তাহা নিতান্ত অল্প নহে, তখনকার দিনে সেগুলি অনেক টাকা। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণ কন্যাসহ পত্নীটীকে রাখিয়া পীড়ার ত্রয়োদশ দিবসে সকল যন্ত্রণামুক্ত হইয়া পরলোক গমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চা বাগানে

যে সাহেব চিত্তরঞ্জনের সন্তরণপটুতা ও সৎসাহস দেখিয়া খুসি হইয়া ব্রহ্মপুত্রের ক্রোড় হইতে তাহাকে আপনার বজরায় তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার নাম বেল সাহেব। পুরা নাম (Mr. George Bell) মিষ্টার জর্জ্জ বেল। তিনি গোহাটী হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী সুম্না নামক এক চা বাগানের ম্যানেজার। সাহেব বালককে নিকটে ডাকিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমার হাটে কিসের ডাগ আছে ?"

চি। যে নৌকায় আমি ছিলাম, ঐ নৌকার মালিক আমাকে নৌকায় তুলিবার সময় মারপিট ও টানাটানি করিয়াছিল, ও সব তাহারই দাগ।

সা। কেনো মারিয়াছিল ?

চি। আমি আসিতে চাই নাই।

সা। টবে কেনো আসিয়াছ ?

চি। আমি কি এসেছি, আমাকে পাঁচ ছয় জনে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে।

সা। টোমার কট ডিনের এগ্রিমেণ্ট ?

চি। কিসের এগ্রিমেণ্ট ?

সা। কাজ কর্‌বার ?

চি। তা ত কিছুই হয় নাই।

সা। What do you mean—boy ? (১)

চি। কই, আমি ত জানি না।

---

(১) বালক, তুমি কি বল্‌ছ ?

সা। Is the statement correct ? (১)

চি। I am not in the habit of telling tales, Sir. (২)

সা। All right—What will you do now ? (৩)

চি। আপনি আমাকে ঐ সকল দুষ্ট লোকের হাত থেকে, আর ঐ কুমীরটার মুখ থেকে বাঁচাইয়াছেন, এখন আমি আপনার, আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।

সা। You speak English well, do you know how to square accounts ? (৪)

চি। A little bit of it—not much. (৫)

সা। You are a smart boy, I can make a square man of you, if you follow my advice. (৬)

এইরূপ কথার পর মস্তক নত করিয়া সেলাম বাজাইয়া কৃতজ্ঞতা জানান কর্ত্তব্য, চিত্তরঞ্জন তাহা কখন শিখে নাই; কিন্তু কি পুণ্যফলে বলা যায় না, বা কি কারণে তাহাও নির্দ্দেশ করা কঠিন হইলেও, সাহেবের কথা শুনিয়া অতি উচ্চ অনুগ্রহ লাভের আশা পাইয়া চিত্তরঞ্জনের মুখখানি অতি সহজেই নত ও রক্তিমাভ হইল। সুন্দর বালকের সুগঠিত মুখের সলজ্জ সরাগ নত দৃষ্টি সাহেবের নিকট বড়ই মিষ্ট বোধ হইল। সাহেব ঈষৎ গম্ভার অথচ হাসিমুখে চিত্তরঞ্জনকে বলিলেন, Then, you

(১) এ কথা কি ঠিক্?

(২) মহাশয় আমার গল্প বলা অভ্যাস নাই।

(৩) বেশ, তুমি এখন কি করিবে?

(৪) তুমি বেশ ইংরাজী বল, হিসাব পত্রের কাজ ভাল জান?

(৫) বেশী না, অল্প স্বল্প জানি।

(৬) তুমি বেশ ধারাল ছেলে, আমার পরামর্শে চলিলে, আমি তোমাকে কাজের লোক করিতে পারি।

come along with me? (১) চিত্তরঞ্জন নীরবে মাথা নাড়িয়া সাহেবের অভিপ্রায়ের স্বপক্ষে সম্মতি জানাইল।

গৌহাটীর ঘাটে যথাস্থানে বজরা লাগান হইলে পর, সাহেব, পঞ্চানন ও চিত্তরঞ্জনকে লইয়া নিজের টম্‌টমে উঠিতে যাইতেছেন, ন্যাক্‌ সাহেবের পাদানে উঠিয়া বসিয়াছে; এমন সময়ে বৈদ্যনাথের লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়াইয়া আসিয়া গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল এবং প্রায় চৌদ্দপোয়া বহরের এক লম্বাচওড়া সেলাম বাজাইয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার এই পলাতক আসামী আমাদের গ্রীমেণ্টের কুলি।"

সা। টোম্‌ কিস্‌কা আড্‌মি হায়?

চা। হাম্‌ সরকারকো গোলাম, বৈদ্যনাথ বাবুকো তাঁবেদার হায়।

সা। কোন্‌ বাগিচাকা ওয়াস্‌টে ইস্‌কো লে আয়া?

চা। সরকারকো নক্‌রি করে গা?

সা। উস্‌কো এগ্রিমেণ্ট ডেখ্‌লাও।

বৈদ্যনাথের ভৃত্য গ্রীমেণ্টখানি খুলিয়া সাহেবের হাতে দিয়া বলিল, পুলিষে এই লোক না পেয়ে নৌকা আটক করেছে, আপনি একটা চিঠি দিন যে, এই এগ্রিমেণ্টের লোক আপনার সঙ্গে আছে। তা না হ'লে আমাদের ছাড়ে না।

সা। টোম্‌ শালালোককো ছোড়না আচ্ছা নেহি। বৈড্‌নাথকা সব আড্‌মিকো পঁচাশ পঁচাশ চাবুক লাগানেসে টব ঠিক হোই।

চা। ধর্ম্মাবতার! গোলামকো কুচ গোস্তাগি হুয়া?

সা। D—d you,—Scoundrel (২) তোমরা বাবু জালিয়াট্‌

(১) তবে তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

(২) তুই। বদ্‌মাইস।

হায়? টোম্ বি জালিয়াট্ হায়, সব বড্মাহাস হায়। (চিত্তরঞ্জনের দিকে তাকাইয়া) "Is this your signature?" (১)

চি। Sir—I had no knowledge of it before this. (২) বেল সাহেব বৈদ্যনাথের ভৃত্যের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "টোমারা নাম ক্যা হায়? টোমরা মনিবকো কহো হাম উস্‌কো জেল ডে ডেঙ্গে।" ভৃত্য অশ্রুপূর্ণ নয়নে করযোড়ে বলিল, "সরকারকো কাম্‌নে যো কুচ্ কসুর হুয়া, মাপ্ কিজিয়ে, আউর মেহেরবাণী কর্‌কে গোলামকো ছোড় দিজিয়ে। এসা গল্‌তি আউর নেহি হোগা।"

সাহেব এক টুক্‌রা কাগজে ছাড় লিখিয়া ভৃত্যের হাতে দিয়া বাগিচার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সাহেব বাগিচায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার বড় বাবুকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন, "এ বাচ্ছা আচ্ছা হায়। Teach him all the works of the garden, and accomodate him comfortably. (৩)

বড় বাবু, বেশ মিঠে রকমের এক সেলাম বাজাইয়া, চিত্তরঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া, আফিসে গেলেন। বড় বাবু, ত্রিগুণাচরণ দাস, লোক মন্দ নহেন, তবে নিজের কাজটী একটু বেশী বুঝেন, তা সংসারে কে না বুঝে? অল্পাধিক সকলেরই সে ব্যাধি আছে। তবে ত্রিগুণা বাবুর একটু বেশী। তাঁহার প্রধান দোষ, কোন কাজকর্ম্মে কোন দোষ হইলে, প্রাণপণে অন্যের স্কন্ধে চাপাইয়া থাকেন। আর সুযোগ হইলে, নিজের ভিন্ন অন্য কাহারও সুখ সুবিধার প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করেন না। এই দুইটী বিষয়ে তিনি সুকদেবের ন্যায় মাতৃগর্ভ হইতে, শিক্ষা লাভ করিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া-

(১) এ কি তোমার সহি?

(২) মহাশয়, আমি ইহার পুর্ব্বে ইহার কিছু জানিতাম না।

(৩) ইহাকে বাগানের সমস্ত কাজ শিখাইবে আর ইহার সচ্ছন্দে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

ছিলেন। এইজন্য সকলে তাঁহার উপর কিঞ্চিৎ নারাজ, কিন্তু তবুও তিনি বড় বাবু বলিয়া, লোক তাঁহাকে সম্মান করে এবং আপনার জনের ন্যায় সকলে তাঁহার চারি পার্শ্বে দাঁড়ায়। বাগিচার কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে পঞ্চাননই কেবল ব্রাহ্মণ, সুতরাং চিত্তরঞ্জনের আহারের ব্যবস্থা তাঁহার পাকশালাতেই হইল। পঞ্চাননের ইচ্ছা না থাকিলেও, চাকরির ভয়ে, সাহেবের হুকুম্ তামিল করিতে হইল। পঞ্চানন প্রতিদিন নিজের কর্ম্মদোষ স্মরণ করিয়া বালককে মনে মনে শত শতবার অভিসম্পাত করিলেও চিত্তরঞ্জন খোস মেজাজে ও বাহাল তবিয়তে বিচরণ করিতে লাগিল। আর পঞ্চানন ক্রমে ক্রমে যেন ভাবনাযুক্ত ও নির্জীবের মত হইতে লাগিল। পঞ্চানন দিন দিন চিত্তরঞ্জনকে প্রফুল্ল, কর্ম্মনিরত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ দেখিয়া মরমে মরিয়া যাইতেছে। চিত্তরঞ্জনের ইচ্ছা সে পঞ্চাননকে ভালবাসে ও আপনার জনের ন্যায় ব্যবহার করে, কিন্তু পঞ্চানন তাহার বিরোধী। পঞ্চানন চিত্তরঞ্জনের সহিত প্রথম পরিচয়ের দিন হইতেই এমন দারুণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে, সময়েও তাহার খর্ব্বতা হইল না। ঈর্ষার ভাবে মানুষ মানুষের প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করিলে, তাহা আর সহজে যায় না। চিত্তরঞ্জনের ভদ্রতা, আত্মীয়তা ও আনুগত্যের ভাব পঞ্চাননের হৃদয় মুগ্ধ করিতে পারিল না। এই ভাবে প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল। এতদিন চিত্তরঞ্জন কেবল ২৫৲ টাকা মাসহারা পাইত মাত্র, এইবার বেল সাহেব পঞ্চাশ টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া দিলেন। চিত্তরঞ্জন প্রাতঃকালে সাহেবের সঙ্গে বাগিচায় চায়ের কাজ দেখিয়া বেড়ায়। আহারান্তে মধ্যাহ্নে আফিসে হিসাব পত্র রাখে এবং সকল কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ শিক্ষা লাভের চেষ্টা করে। এখন তাহার প্রধানলক্ষ্য কাজ শিখিবে—নিত্য নূতন কাজ শিখিবে। বাগিচায়, কি আফিসে কোথাও সে এক মুহূর্ত্ত অলস ভাবে বসিয়া থাকে না। বড় বাবু যখনই দেখেন, তখনই দেখিতে পান, চিত্তরঞ্জন কাজ করিতেছে। সাহেব

তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাগানে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখেন, চিত্তরঞ্জনের চক্ষু সর্ব্বদাই পার্শ্বস্থ চা পাতা, না হয় গাছের অবস্থা, না হয় কাজে নিযুক্ত কুলিদের উপর রহিয়াছে। সঙ্গে চলিতে চলিতে সাহেব, যে কাজ যে ভাবে বুঝাইয়া দেন, চিত্তরঞ্জন সে কাজ ঠিক সেই ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, এজন্য সাহেব চিত্তরঞ্জনের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট। এই কর্ম্মসূত্রে চলাফেরা, দৌড়াদৌড়ি, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি কার্য্যেও চিত্তরঞ্জন বেশ পটুতা প্রদর্শন করিতে লাগিল। একদিকে সুস্থ ও সবল দেহ, আর একদিকে সদাপ্রফুল্ল চিত্ত, চিত্তরঞ্জনের সুখ শান্তি বৃদ্ধি করিলেও, চিত্তরঞ্জনের মর্ম্মগত উদাস ভাব লক্ষ্য করিলে, বুঝা যাইত যে, সে যুবক তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তু বা ঘটনা নিচয়ের মধ্যে বাস করে না। সে আছে আসামের চা বাগানে, কিন্তু বাস করে ভিন্ন স্থানে, কোথায় কে জানে ?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আত্ম-পরীক্ষায়

চিত্তরঞ্জন কাজকর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিলেও, সাহেব এবং বড় বাবুকে সদা সন্তুষ্ট করিতে যত্নবান হইলেও, মালতীই নিয়ত তাহার হৃদয়মন অধিকার করিয়া আছে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, আবার সন্ধ্যা হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত, সমগ্র সময় সজনে ও নির্জ্জনে, শয়নে ও স্বপনে মালতী সমান ভাবে চিত্তরঞ্জনের চিন্তাপথ অধিকার করিয়া আছে। মানুষ দেখুক আর না দেখুক, বুঝুক আর না বুঝুক, বায়ু যেমন বিনা বিশ্রামে—বিনা ব্যাঘাতে মানুষের শ্বাসকার্য্য সম্পাদন করাইতেছে, ঠিক সেই ভাবে মালতী চিত্তরঞ্জনের সুখস্মৃতির কস্তূরী হইয়া নিয়ত সুবাস বিতরণ করিতেছে। চন্দন-বন-বিহার-বিভোর বসন্তের বিমল সমীর-হিল্লোল অঙ্গ স্পর্শ করিলে, মানুষ যেমন প্রাণ পায়, তাহাকে যেমন সজীব প্রফুল্ল ও প্রীতিমাখা করিয়া তুলে, মালতীও তেমনি বহু যোজন দূরে থাকিয়াও চন্দন-চামর-চালিত মলয়ানিলরূপে চিত্তরঞ্জনের চিত্তের বিকাশ সাধন করিতেছে। মালতী মালা হইয়া শত বন্ধনে—সহস্র বন্ধনে চিত্তরঞ্জনের হৃদয় বাঁধিয়াছে, তাহাতেই সে সুখী। তাহাতেই চিত্তরঞ্জন সবল ও সুস্থ, শান্ত ও সানন্দ। কিন্তু তবুও সে থাকিয়া থাকিয়া কেমন সহসা এক একবার এক একটী ঘনবিষাদপূর্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সোজা হইয়া বসে, বসিয়া সম্মুখের দিকে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে একটীবার এক, দুই বা তিন মিনিটের জন্য তাকাইয়া কি চিন্তা করে, কেহ তাহাকে দেখিলেও বুঝিতে পারে না। কেবল পঞ্চানন তাহাকে চিন্তিত দেখিলে চিন্তাকুল হইয়া উঠে। চিত্তরঞ্জনকে হাসিতে দেখিলে, উল্লাসভরে

কাহারও দিকে ঢলিয়া পড়িতে দেখিলে, বা তাহার সুগঠিত মুখকমল মুকুলিত করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিলে, পঞ্চানন অন্তরে অন্তরে গোপন ঈর্ষানলে যেমন পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হয়, তেমনি তাহাকে চিন্তিত, বিষাদিত ও কাতরভাবাপন্ন দেখিলে, ভয়ে বিহ্বল হয়, নিজেকে বিপন্ন ভাবিয়া শতবিধ অশুভ কল্পনা করিয়া বিষাদিত চিত্তে কালহরণ করে।

চিত্তরঞ্জন পঞ্চাননকে ভাল বাসিতে গিয়া, তাহার সহিত আত্মীয়তা করিতে গিয়া, বাধা পাইয়াছে। একবার নহে, কত শতবার চেষ্টা করিয়াছে, কোন ফল হয় নাই। প্রীতির আদান প্রদানেই মানুষে মানুষে আত্মীয়তা হয়, পঞ্চানন ও চিত্তরঞ্জনে ঠিক তাহার বিপরীত। পঞ্চানন সুযোগ পাইলে চিত্তরঞ্জনের সর্ব্বনাশ করিতে, এমন কি সুবিধা হইলে, ধরা পড়িবার সম্ভাবনা না থাকিলে, চিত্তরঞ্জনের চিহ্ন পর্য্যন্ত সংসার হইতে মুছিয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত বা ভীত নহে, সুযোগ হইলে, এরূপ কাজ করিবার কল্পনাও তাহার মনে উদয় হইয়াছে, কখনও কখনও উপায়ও চিন্তা করিয়াছে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন কি করে? চিত্তরঞ্জনের সমবয়স্ক বন্ধু, ভালবাসার পাত্র, মন খুলিয়া দুটী কথা কহিবার লোক সেখানে কেহ নাই, তাই সে পঞ্চাননের সঙ্গে কথা কহিতে আত্মীয়তা করিতে, সুখে ও সদ্ভাবে দুজনে একত্র বাস করিতে কত শত চেষ্টা করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে পঞ্চানন গৌরবর্ণ, উজ্জ্বলকান্তি, সুপুরুষ, মুখে সাহস ও সৌজন্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সুগঠিত মুখমণ্ডল লাবণ্যে ঢল ঢল করিতেছে; তাই তাহাকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। চিত্তরঞ্জন দৃঢ় প্রকৃতির যুবক হইলেও তাহাতে কমনীয়তা আছে, সৌজন্য আছে, মধুর সরল ভাব আছে, তাই পঞ্চাননের মুখের দিকে তাকাইলেই চিত্তরঞ্জন আত্মবিস্মৃত হয়, পঞ্চাননের দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া, তাহার শতবিধ নির্দ্দয় ব্যবহার ভুলিয়া, তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া

থাকে, তখন পঞ্চানন এই অনাথ বালকের অবাক্ দৃষ্টিতে কত কি কল্পনা করে ও আপনা আপনি জ্বলিয়া মরে, জ্বালা অসহ্য হইলে বিষয়ান্তরে চলিয়া যাইতে উদ্যত হয়, তখন চিত্তরঞ্জন তাহার চরণ ধরিয়া অতি কাতর ভাবে বলে, তুমি দাঁড়াও, এই বন্ধুহীন দেশে, তোমার মুখের দিকে তাকাইয়াও আমি যে সুখ—যে আনন্দ—যে তৃপ্তি সম্ভোগ করি, আমাকে তাহাতে বঞ্চিত করিয়া তোমার কি লাভ? পঞ্চানন অমনি কুপিতকণ্ঠস্বরে বলে, "তোমারই বা আমাকে এরূপ ভাবে বিদ্রূপ করিয়া এরূপ ভাবে টিট্‌কিরি দিয়া কি সুখ হয় বুঝি না। তুমি ইংরাজী জান, পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাও, তাই এত ঠাট্টা? তুমি আমার চেয়ে দেখ্‌তে ভাল, তাই এত বিদ্রূপ? সাহেব তোমাকে বেশী বালবাসে, তাই এত অহঙ্কার? এ সব কিছুই থাকৃবে না। শিগ্‌গিরই যাবে। আমারও ছিল—গিয়াছে। তোমারও যাবে।" এই কথা শুনিয়া চিত্তরঞ্জন চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে পায়ে ধরিয়া বলে, "তোমার প্রতি আমার ঠাট্টা, বিদ্রূপ, অহঙ্কার কিছুই নাই। তোমাকে ভালবাসিতে ও তোমাকে দাদা বলিয়া ডাকিতে আমার সাধ যায়।"

এরূপ অবস্থায়ও পঞ্চানন মূঢ়ের ন্যায় চিত্তের হাত হইতে নিজের পাদুখানি ছাড়াইয়া লইয়া রোষকষায়িত-নেত্রে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়া যায়, চিত্তরঞ্জন নীরবে অশ্রুপূর্ণ নয়নে একাকী বসিয়া থাকে।

এই ভাবে প্রায় দেড় বৎসর কাল চলিয়া যায়, এমন সময় চিত্ত সংবাদ পাইল যে দেবসেবক জগন্নাথ ভট্টাচার্য্যের কাল হইয়াছে। দেবসেবিকা ব্রাহ্মণী কন্যা লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন কেহ ঠিক বলিতে পারে না। এই সংবাদ চিত্তরঞ্জন এক পত্রের প্রত্যুত্তরপত্রে প্রাপ্ত হইল। চিত্তরঞ্জন আসামে আসিয়াই বারাকপুরের বারাণসী ঘোষের ঘাটের দেবালয়ের ঠিকানায় একখানি পত্র লিখিয়াছিল, যখন সে পত্র পৌছায়, তখন দেবসেবক পীড়িত ও শয্যাগত। তাহার ২।৩

দিন পরেই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। সুতরাং অনেক দিন ধরিয়া সে পত্র কেহ খুলে নাই—দেখেও নাই। দীর্ঘকাল সে পত্র মালতীর মায়ের বাক্সের ভিতরে এক উপেক্ষিত স্থানে পড়িয়া আছে। কাহার পত্র তাহাও কেহ জানিত না। তাহার পর ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচখানি পত্র লিখিয়া চিত্তরঞ্জন কোন উত্তর না পাইয়া, শেষে বিদ্যালয়ের এক সমপাঠী প্রতিবেশী বালককে পত্র লেখে। সেই পত্রের উত্তরে উপরিউক্ত সংবাদ আসিয়াছে। চিত্তরঞ্জন আসামে চা বাগানে ৫০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম পাইয়াছে শুনিয়া, অনেক বালক বাগ্দেবী বীণাপাণির শ্রীচরণপ্রান্তে বদ্ধাঞ্জলি বিদায় লইয়া, আসাম যাত্রা করিতে এবং পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরী করিতে মনস্থ করিল। "সে বেশ দেশ", বলিয়া এক, দুই, তিন করিয়া প্রায় ছয় সাতটী বালক ক্ষেপিয়া উঠিল। পত্রোত্তরে চিত্তরঞ্জনের জ্ঞাতব্য সংবাদ যথাসম্ভব লিখিয়া, পরে নিজেদের আসাম যাত্রার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া চাক্রীর যোগাড় করিতে বলিল।

ব্রাহ্মণের মৃত্যু সংবাদে বালকের মস্তকে যেন অশনিসম্পাৎ হইল। চিত্তরঞ্জন পত্র পাঠে কাতর হইয়া বহু অশ্রুপাত করিল। মালতীর জন্য, মালতীর মায়ের জন্য, অসীম ভাবনার ভার পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়া তাহাকে যেন চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরিল। বহুক্ষণ ধরিয়া ইহাদের বিষয় চিন্তা করিল। বার বার মালতীর জন্য অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া চিত্তের রক্তিমাভ গণ্ড সিক্ত করিল, সে আজ ভাবিতেছে—সেই প্রখরা মুখরা বালিকা আজ চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, না জানি সে আজ দেখিতে কত সুন্দর হইয়াছে। তাহার সেই সুগঠিত বাদামে মুখখানি আজ হয়ত আরও ভারি হইয়াছে, তাহার সেই বড় বড় পটলচেরা চোখের প্রান্তভাগ কাণের দিকে আরও অগ্রসর হইয়াছে—তার সেই দুষ্টামিভরা চোখের চঞ্চল চাউনি এখন আরও কত সুন্দর হইয়াছে—আবার তারই উপরে চখের প্রান্তভাগ ছাড়াইয়া সেই ভ্রূ দুটীর অগ্রভাগ আরও অগ্রসর

হইয়াছে—আমাকে জব্দ করিয়া সে হাসিলে, তাহার মুখে যে বিদ্যুতের আলো ফুটিত, বেদানার সাদা দানার মত সাজান দাঁতগুলি সে আলো আরও উজ্জ্বল করিয়া দিত, সে দৃশ্য কেমন সুন্দর! আমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সে কাঁদিলে, উত্তেজনাভারে তাহার মুখে চাঁপার রংএ যেন কে আল্‌তা ঢালিয়া দিত—সে চোক-ঝলসান রং এখনও মনে হ'লে আনন্দ হয়। হায়! হায়! সেই চিরচঞ্চলা—মুখরা, দুষ্টামির প্রতিমূর্ত্তি মালতী আজ পিতৃহীন ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে, আজ কে তাকে দেখ্‌বে? হায়! বিধাতা, কি করিলে! আমার এমন মোমের পুতুল—আদরিণী মালতীকে সংসারের অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিলে? তাহাকে দেখিতে—তাহার কোন অভাব থাকিলে, তাহা দূর করিতে আমার যে ইচ্ছা হইতেছে। সে কি আর এ হতভাগার কথা ভাবে? বোধ হয় এতদিনে তার বিয়ে হ'য়ে গেছে। এ কি! কেন এমন হ'লো! তার বিয়ে হ'য়েছে ভাবিতে, আমার গায়ে কাঁটা দিলে কেন? তাই ত, কাঁটা দেবেই না বা কেন? আমার মুখ তার বিয়ের কথা বলিতেছে, সত্য, আমার প্রাণটা ত কই সে কথায় সায় দিতেছে না? অন্যের সঙ্গে তার বিয়ে হবে? আমার অসহ্য।

"মানব উদ্যানে, সুখের ভবনে,
ফুটেছিল দুটী ফুল"

না—না, ফুটেছিল কেন ব'ল্‌বো, 'ফুটিয়াছে দুটী ফুল'। কে 'ফুটেছিল' করিল? আমি ত করিনি? আমি দেখ্‌তে চাই 'ফুটিয়াছে দুটী ফুল'।

'ফুটেছিল' এ ভুল কথা। আমি শিশু অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় সে গৃহের বক্ষঃস্থলে বসিয়াছি। কাহার সাধ্য আমাকে উঠাইয়া ফেলে—আমাকে উঠাইতে গেলে, গৃহের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলিতে হইবে। গৃহের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আমারই জীবনের স্থূল সূক্ষ্ম মূল সকল প্রবেশ করিয়াছে।

আমাকে উঠাইয়া দূরে ফেলিতে গেলে, বাড়ী ভাঙ্গিতে হইবে। না—না, মালতী আমার সঙ্গে যতই ঝগড়া করুক না কেন, আমাকে ভুলিবে না, আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে সম্মত হইবে, ইহা কিছুতেই আমার বিশ্বাস হয় না। বরং আত্মহত্যা করিবে। বাপ্ রে ভাবিতে ভয় হয়, আত্মহত্যা। না—না, তার চেয়ে সে বিয়ে করুক, ক'রে বেঁচে থাক। আমি যতদূরেই থাকি না কেন, সে সুখে আছে শুনিলেও সুখ পাব। অন্যের হাতে তাহার সুখ হবে? ঝগড়ার বেলা দুঃখ কষ্টের বেলা—তাড়িত হওয়ার বেলা আমি—তাহার সুখ সম্পাদনে প্রাণপণ করিয়া, শেষে আমার বেলা চির নির্য্যাতন—নির্ব্বাসন, আর সুখের বেলা—সংসারের বেলা, অন্য জন, তাও কি হয়? তাহাও হউক, তবু যেন সে না মরে, সে দুঃখ না পায়, ক্লেশ না পায়, ইহাই আমার একমাত্র—একমাত্র—একমাত্র—প্রার্থনা। তাহাকে সুখী করিতে অত কষ্ট পেলুম, এখন কি তাকে অন্যের হাতে সুখী দেখিয়া, সুখী হইতে পারিব না? কেন পারিব না? কই, আমার মন ত ভাল করিয়া সায় দিতেছে না, আমার বাহিরের পীড়নে আমার মনটা ভীরুর মত "আজ্ঞে হাঁ তা বই কি" গোচ একটা মরা মরা সায় দিতেছে, কিন্তু আমার হৃদয় নীরব। আমার মন আমার মুখের দিকে তাকাইয়া, সাহসে ভর করিয়া, কিছু বলিতে পারিতেছে না। আশ্চর্য্য! এইখানেই স্বার্থ, এই স্বার্থেই মানুষ মরে, আমি কি আমার এই স্বার্থের কালী ধুয়ে ফেলে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার সুখে সুখী হইতে পারিব না? চেষ্টা করিব। অসহ্য হয়, চির দিন এইরূপ দূরদেশে থাকিয়া একাকী জীবনের যন্ত্রণাভার বহন করিব, আরও অসহ্য হয়, ছেলে বেলা যেমন ফুলের গাছ তুলিয়াছি, ঠিক তেমনি ক'রে হৃদয় মন, দেহ হইতে উপ্ড়াইয়া ফেলিব—নিজের হৃদয় মন, দেহ হইতে পৃথক করিয়া ফেলিব। নিজে মরিব তবু তাহাকে অসুখী করিব না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যুমুখে

চিত্তরঞ্জন বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া একাকী অশ্রুজল মোচন করিয়া—বহু বিলাপ করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিণাম চিন্তা করিয়া অবশ ও কাতর হইয়া পড়িল, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ভরে—অনুচ্চ স্বরে বলিল, "হৃদয় মন, দেহ হইতে পৃথক করিলেই কি মালতী সুখী হইবে? তাহার কি প্রাণ নাই, হৃদয় নাই? সে কি আমাকে ভালবাসে নাই? আমি মরিলে তাহার সুখ বাড়িবে না, বরং দুঃখের সীমা থাকিবে না। আমি মরিব না, বাঁচিয়া থাকিব, আর প্রয়োজন হইলে, পূর্ব্বের শত নির্যাতন বিস্মৃত হইয়া, তাহার সুখ সাধন করিব—তাতেই আনন্দ পাইব। আর যদি জানিতে পারি যে, তাহার নিকটে গেলে, তাহার সংসার সুখের ব্যাঘাত হইবে, দূরে দূরে থাকিয়া দুর হইতে সংবাদ লইব, আত্মগোপন করিয়া দূর হইতেই তাহার সুখ সাধন করিব। সে জানিতে পারিবে না যে তাহার চির-পরিত্যক্ত সুহৃদ্ চিত্তরঞ্জনই নানাবিধ সুখ সুবিধার মুল। এই ত সুখ, এই মাটীর সংসারে ইহার অধিক উচ্চ সুখ আর কি আছে, তাহা ত জানি না।" "আমি এই পথে চলিব।"—চিত্তরঞ্জন এই পণ করিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং প্রাপ্ত পত্রের উত্তর দিতে বসিল :—

শ্রীশ্রীহরিশরণম্।

ভাই নলিন্ :—

তোমার পত্র পাইয়া পিতৃতুল্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদে আমার মন বড়ই অধীর হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার জন্য অনেক কাঁদিয়াছি, এখনও কাঁদিতেছি, কিন্তু কাঁদিয়া আর আশ মিটে না, মনের ক্ষোভও

যায় না। তিনি আমার জীবনরক্ষা করিয়া, পরে চারি বৎসরের অধিক কাল আমাকে লালন পালন করিয়া ও লেখা পড়া শিখাইয়া আমাকে চিরক্রয় করিয়াছিলেন, আমার দুঃখ এই যে, তাঁহার শেষ দশায় আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতে, ও নিজ হস্তে শেষ কার্য্য করিতে পাইলাম না, পাইলে, কথঞ্চিৎ সুখী হইতাম। আমি নিতান্ত মন্দভাগ্য, তাই সে সুখটুকুও আমার ভাগ্যে ঘটিল না। যাহা হউক, ভাই! তোমার পায়ে ধরিয়া—বিনয় করিয়া বলিতেছি, যদি একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া মালতীর ও তাহার মায়ের ঠিক সংবাদ লইয়া ঠিকানাসহ আমাকে একখানি পত্র লিখিতে পার, তাহা হইলে, পরমাত্মীয়ের কাজ করা হইবে। আমি ইহাদের প্রত্যেকের নিকট চিরঋণী, সংবাদ পাইলে, এবং তাঁহাদের কোন উপকার করিতে পারিলে, ধন্য হইব, তুমি আমার এই উপকারটী করিও।

তোমার পিতা মাতা বর্ত্তমান, তাঁহাদিগকে ফেলিয়া, এই সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, এত দূরে আসিবার কি দরকার? ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিলে দেশেই ভাল চাকরী পাইবে। আমি নিতান্ত হতভাগ্য, আমার, আমার বলিবার কেহ কোথাও নাই, তবুও এত দূর দেশে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া কত যে ক্লেশ বোধ হয়, তাহা বুঝাইবার নহে। তবে কতক বিষয়ে আমি এখানে ভালই আছি। আমি যে সাহেবের চাকুরি করি, তিনি আমাকে নিজের ছেলের মত ভালবাসেন, বোধ হয় শীঘ্র আরও ভাল হবে। তবে তোমার বাপ মা যদি তোমাকে এতদূর আসিতে দেন, আর আসা হয়, তাহা হইলে, তখন তোমার জন্য যাহা আবশ্যক, সবই করিব। কিন্তু বাপ মায়ের অমতে কোন কাজ করিও না। তোমার আছে, তাই তুমি তাঁহাদের মূল্য বুঝ না, আমার নাই, ছেলেবেলা হইতে নিয়ত কল্পনায় তাঁহাদের স্মরণ করিয়া চক্ষের জল ফেলি ও উদ্দেশে পূজা করি।

আমার বন্ধু গোবিন্দ ও গোপাল, সুধীর ও নেপাল, বিপিন ও সুশীল ইত্যাদি সকলকে আমার কথা বলিবে ও আমার ভালবাসা জানাইবে। তাহাদিগকে বলিবে, এই দূর দেশে আসিয়া, এখন তাহাদের সকলের কথা সর্ব্বদা মনে পড়ে। একা একা বসিয়া তোমাদের কথা ভাবি, আর নিজে নিজে কত সুখ পাই। ভাই! আমার অনুরোধটী ভুলিও না। হাত তারিখ ২রা জ্যৈষ্ঠ সন ১২৭৩ সাল

তোমাদেরই চিত্তরঞ্জন।

চিত্তরঞ্জন বাসায় বসিয়া পত্রখানি লিখিয়া আবার একবার পড়িল, যেখানে যাহা ভুল ছিল, তাহা সারিয়া দিল। অপরাহ্নে ডাকের বাক্স খুলিবার সময় হইয়া আসিয়াছে, তাই তাড়াতাড়ি চিঠিখানির উপর শিরোনামা লিখিয়া লইয়া আফিসের বারাণ্ডায় গিয়া, দেখে ডাকপিয়ন বাক্স খুলিতে আসিয়াছে, তখন চিঠিখানি বাক্সে ফেলিয়া দিয়া চিত্তরঞ্জন চলিয়া আসিতেছে, এমন সময়ে সাহেব উপরের বারাণ্ডা হইতে "চিত্তরঞ্জন" বলিয়া ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র চিত্তরঞ্জন উপরের দিকে তাকাইয়া সাহেবের ইঙ্গিত মত উপরে চলিয়া গেল। সাহেব তাহাকে বসিতে বলিয়া একটু কাজের জন্য ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তাহার পর একখানি ডাকের খামেপোরা চিঠি হাতে লইয়া, চুরুট টানিতে টানিতে সাহেব বাহিরে আসিয়া এক গাল হাসি হাসিয়া বলিলেন, "Here is a news for you." (১) বলিয়া সখাম পত্রখানি চিত্তরঞ্জনের হাতে দিলেন। চিত্তরঞ্জন সভয়ে খামখানি সাহেবের হাত হইতে লইয়া, অলক্তাভ মুখে পত্রখানি বাহির করিল। ক্রমে স্থির হইয়া ধীর ভাবে পত্র পাঠ শেষ করিয়া সাশ্রুনয়নে একটীবার সাহেবের মুখের দিকে তাকাইয়া পরে নত দৃষ্টিতে বলিল, "I don't know, how to thank my benefactor.

(১) তোমার একটা খবর আছে।

Your fatherly affection has bound me down under an everlasting debt of obligation, which I can never redeem. No pleasure shall be greater to me, than to bear cheerfully the burden of this heavy debt. (১) সাহেব বলিলেন, you are not only a businessman, there is a bit of poety in you. Do go on, as I wish, and you will develop into a man—in proper sense of the word. (২) চিত্তরঞ্জন অশ্রুসিক্ত নয়নে, নত দৃষ্টিতে বসিয়া রহিল। সাহেব বলিলেন, Now I congratulate you as my future assistant. Good bye. (৩) চিত্তরঞ্জন উঠিতে উঠিতে আর একবার সাহেবের দিকে তাকাইয়া মাথা হেঁট করিল। সাহেব হাত বাড়াইয়া চিত্তরঞ্জনের সরল অথচ শিথিল হাতখানি ধরিয়া সাদরে ও স্নেহভরে বলিলেন, Boy, I will do you good, be good and faithful (৪)।

চিত্তরঞ্জন সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, নীচে নামিতে, সহসা বিষণ্ন হইল, কেমন একটা অবসাদ—কেমন একটা অশান্তি চিত্তরঞ্জনের হৃদয় অধিকার করিল, চক্ষে বিষাদের অশ্রু কণায় কণায় মিলিত হইতে

(১) আমার শুভানুধ্যায়ীকে কিরূপে ধন্যবাদ করিব, জানি না। আপনার পিতৃস্নেহ আমাকে আমরণ ঋণপাশে বদ্ধ করিল। আমি এই ঋণ পরিশোধে অক্ষম, ইহার গুরুভার সানন্দে বহন করিতেই গভীর তৃপ্তি অনুভব করিব।

(২) তুমি কেবল কাজের লোক নও, তোমাতে বেশ লালিত্য আছে। তুমি আমার পছন্দমত চল, তা হ'লেই মানুষের মত হবে।

(৩) এখন আমি তোমাকে আমার ভাবী সহকারীরূপে সম্ভাষণ করিতেছি। আচ্ছা এখন বিদায়।

(৪) আমি তোমার ভাল করিব, তুমি সৎ ও বিশ্বাসী হইবে।

লাগিল। চিত্তরঞ্জনের দুঃখ—দারুণ মনস্তাপ এই যে, এমন একটা সুখের সংবাদ, এমন একটা আপনার লোক নাই, যাহাকে বলিয়া—যাহাকে জানাইয়া হৃদয়ের আনন্দের আদান প্রদান হয়—এমন একটা লোক নাই যে নিকটে আসিয়া হাসিয়া প্রাণের প্রীতি বৃদ্ধি করিয়া দেয়। এমন একাকিত্ব, এমন বনবাস মানুষের জীবনে সচরাচর ঘটে না। আজ আবার সেই অমাবস্যার রাত্রিতে বারিধারাসিক্ত দেহে বারাকপুরের গঙ্গার ঘাটের এক প্রান্তে উপবেশন স্মরণ হইল, সেই অন্ধকার, সেই বিদ্যুৎ, সেই "বেদাচার্য্য নাম, বারাণসী ধাম" আজ আবার অতি উজ্জ্বলভাবে মানসাকাশে ভাসিয়া উঠিল! আজ সুখের সংবাদ দিবার লোকাভাবে নিজের একাকিত্বজাত বিষাদ ঘনতর আকার ধারণ করিয়া চিত্তরঞ্জনকে ক্লেশ দিতে লাগিল। তাহার উপর বাল্যকালের দুঃখকষ্টপূর্ণ মনের মধ্যে এক কল্পিত বেদাচার্য্য মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া যে আশার ইঙ্গিত করিয়াছিল, তাহার সহিত সংসারের কোন জীবিত ব্যক্তির কোন সম্বন্ধ আছে কি না, এ প্রশ্নেরও উদয় হইল। একবার কাশী গিয়া এই সংবাদ লইবার উপায় করিলে, বড় ভাল হইত, কিন্তু সংবাদ লইবার কোন উপায় নাই। ক্রমে গভীর ঘন অবসাদ আসিয়া চিত্তের চিত্ত অধিকার করিল, সে সে দিন সন্ধ্যার সময়ে আর আহারাদির আয়োজন করিল না। অনাহারে উদ্বেলিত হৃদয়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল ও নিরুত্তরে শয্যায় গিয়া শয়ন করিল, ভৃত্য আহারের আয়োজন করিতে যায় দেখিয়া, তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, "আমার শরীর ভাল নয়, কিছুই খাব না, যদি বেশী রাত্রিতে ক্ষুধা হয়, তবে কেবল একটু দুধ খাইব।"

পরদিন প্রাতঃকালে চিত্তরঞ্জন সাহেবের নিকট সংবাদ দিল যে, সে আজ আর সাহেবের সঙ্গে বাগানে বাহির হইতে পারিবে না। রাত্রি একটা হইতে তাহার ভেদবমি হইতেছে, শরীরও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সাহেব এই সংবাদ পাইবামাত্র সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চিত্তরঞ্জনের ঘরে

আসিয়া উপস্থিত। আসিবার সময় বাগানের ডাক্তার বাবুকে আসিবার জন্য সংবাদ দিয়া আসিলেন।

চিত্তরঞ্জনের ঘরে আসিয়া সাহেব ভৃত্যকে সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করিতে, নিজে না পারিলে, লোক ডাকাইয়া তখনই সমস্ত পরিষ্কার করিতে হুকুম দিয়া নিজে বাহিরে একখানা চৌকিতে বসিয়া ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করিয়া বিরক্ত হইলেন এবং আবার লোক পাঠাইলেন। রাত্রিতেই ডাক্তারকে সংবাদ না দেওয়ায়, সাহেব চিত্তরঞ্জনকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। ডাক্তার আসিবামাত্র তাঁহাকে বলিলেন, "You should have come at once, first see what it is, and say whether your help is enough, if not, I can send for the Civil Surgeon (১)

ডাক্তার বাবু নীরবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় প্রবেশ করিলেন, ডাক্তার বাবু ও সাহেব দুজনেই সমস্ত আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া কিছু ভাল বুঝিতে পারিলেন না। কলেরা কি না ডাক্তারের সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ হইল! কিন্তু সন্দেহের কারণ যাহা, তাহা সাহস করিয়া সাহেবকে বলিতে পারিতেছেন না। তখন ডাক্তার বাবু সাহেবকে বলিলেন, "কলেরা কি না, ঠিক বুঝিতেছি না, কিন্তু জীবন রক্ষার সম্ভাবনা অল্প। আপনি সিভিল সার্জ্জনকে একবার আনিয়া দেখাইতে পারেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফললাভ হইবে না।" সাহেব বলিলেন,"A curious assertion,you can't diagnose the disease but you are certain as to the result. You don't try the case, but give your verdict. Then there must be something

---

(১) ডাকিবামাত্র তোমার আসা উচিত ছিল। আগে দেখ ব্যাপার কি, আর বল তোমার সাহায্য যথেষ্ট কিনা, নাহ'লে আমি সিভিল সার্জ্জনকে আনাইতে পারি।

wrong." (১) সাহেব গৌহাটির সিবিল সার্জ্জনকে আনিতে লোক পাঠাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী বাগিচার ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিবার অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন, "I have been led to suspect mischief, see and let me know what you think of it. (২)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অজ্ঞাতবাসে

বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া, নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, পাগলিনীর বেশে, কুষ্টিয়াতে বৈদ্যনাথের গৃহে, মোক্ষদা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে আজ আট বৎসরের কথা। মানসিক গ্লানি ও শারীরিক ব্যাধির শান্তির সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষদার জীবনের পরিণাম ভিন্ন আকার ধারণ করিল। ব্যাধিমুক্ত করিয়া চা-বাগানে পাঠাইবে বলিয়া বৈদ্যনাথের লোক পথ হইতে পাগলিনীকে কুড়াইয়া আনিয়াছিল। কিন্তু আরোগ্য লাভে, মোক্ষদা বৈদ্যনাথের গৃহবাসিনী হইতে বাধ্য হইল। আত্মরক্ষা ও আত্মবিক্রয়ের ভীষণ সংগ্রামে জীবনের অর্দ্ধেকের অধিক কাল, বিশেষ ভাবে বিগত আট

---

(১) এ মজার কথা বটে, কি অসুখ বলতে পারনা, কিন্তু পরিণাম নির্দ্দেশ করিতেছ, বিচার না করেই দণ্ড দিতেছ দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে।

(২) কোনরূপ দুর্ঘটনার সন্দেহ আমার মনে উদয় হইতেছে, তুমি দেখ এবং আমাকে বল ব্যাপার কি।

বৎসরেরও অধিকাংশ, তাহাকে কত যে পরীক্ষা ও পীড়নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, সে সকলের সংখ্যা হয় না। ভাল হউক আর মন্দ হউক, সুখে হউক আর দুঃখে হউক, মোক্ষদা জীবনের এই শেষ আট বৎসর বৈদ্যনাথের গৃহেই কাটাইয়াছে।

আজ পরের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিনী মোক্ষদা নিজের আশ্রয় খুঁজিতে বাহির হইতেছে। আপনার আশ্রয় না পাইলে, সে স্থির করিয়াছে, আবার ভিখারিণী হইয়া পথে পথে দিন কাটাইবে, বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিবে, এই ভাবে মরিবে, তবুও আর পরের গৃহে, পরের আশ্রয়ে বাস করিবে না। আজ তাহার এই সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, দৃঢ়চেতা বৈদ্যনাথকেও বিচলিত করিয়াছে, আজ কি সূত্রে, মোক্ষদার চিন্তার প্রবাহ কোন্ পথে ধাবিত, বৈদ্যনাথ তাহার লেশমাত্রও বুঝিতে পরিতেছেন না। সুতরাং মোক্ষদার উপস্থিত সংকল্পের গুরুত্বও বৈদ্যনাথের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ধারণ করিতে অক্ষম, তাই বৈদ্যনাথ বহু অনুনয় বিনয় করিয়া, কাঁদা-কাটি করিয়া, ক্রমে ক্রমে নিজের যথাসর্ব্বস্ব মোক্ষদার পায়ে অঞ্জলি দিয়া, মোক্ষদার সঙ্কল্প উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু মোক্ষদা আজ অটল অচল, আজ তাহার চিত্তের চঞ্চলতা নাই। আজ মোক্ষদার কোমল কমনীয় হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এমন ভাবে আশ্রয় লাভ করিয়াছে যে, আট বৎসর ধরিয়া বৈদ্যনাথের গৃহবাসিনী মোক্ষদা আর আজকার মোক্ষদা, দুই ভিন্ন লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। এই দীর্ঘকালে বৈদ্যনাথ যথেষ্ট অনুগ্রহ ও আনুগত্যের পরিচয় দিলেও, বৈদ্যনাথ স্বাধীন প্রকৃতির পুরুষ, কখনও কাহারও নিকটে আপনাকে খর্ব্ব করিতে সম্মত নহেন, খর্ব্ব হওয়ার ভাবটাই বৈদ্যনাথে নাই। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুচতুর বৈদ্যনাথ, এতই আত্মপ্রধান পুরুষ যে, কোন মতে কাহারও নিকট এক বিন্দু নত হইতেও সম্মত নহেন। আজ কিন্তু, বৈদ্যনাথ আত্মপ্রধান্ত ভুলিয়া, আপনার স্বভাব ত্যাগ করিয়া, মোক্ষদার নিকট জীবন ও

জীবনের সমগ্র ঐশ্বর্য্য বিক্রয় করিতে অগ্রসর। এই আত্মবিক্রয়ে বিন্দু-মাত্র দ্বিধা নাই। সমগ্র সম্পদসম্বলিত বৈদ্যনাথ, মোক্ষদাকে গৃহদেবতা, আপানর গৃহের একমাত্র কর্ত্রী, সমগ্র সম্পদের অধীশ্বরী করিয়া রাখিতে উদ্যত, টাকা কড়ি, সিন্দুক ও সম্পদ সমস্ত মোক্ষদাকে দিতে উদ্যত, কিন্তু কি দারুণ পণ মোক্ষদার প্রাণ অধিকার করিয়াছে যে, এ সকলের কিছুতেই মোক্ষদা বিচলিত হইতেছে না।

বৈদ্যনাথ একদিন দুদিন করিয়া দশ দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, মোক্ষদার স্তব করিলেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের উপর মোক্ষদার আর প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িল না। বৈদ্যনাথ নানা উপায়ে মোক্ষদার জীবন পথের গতিরোধ করিয়া পড়িয়া অছেন। মোক্ষদা এই অশান্তিকর অপ্রিয় সঙ্ঘ-টনের মধ্যে শান্ত ও সমাহিক ভাবে, আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধির উপায় চিন্তা করিতেছে।

এক দিনের সামান্য অসাবধানতার ফলে, মোক্ষদা বৈদ্যনাথের গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। মোক্ষদার গৃহত্যাগের অল্পক্ষণ পরেই, বৈদ্যনাথ জানিতে পারিলেন যে, মোক্ষদা গৃহে নাই। প্রভুর আদেশে চূড়ামণি চারিদিকে সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু মোক্ষদার সন্ধান পাইল না। বৈদ্যনাথ লোক পাঠাইয়া দূরদেশের পথ সকল অবরোধ করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মোক্ষদা বৈদ্যনাথের অভিপ্রায় বুঝিত, তাই কুষ্টিয়া হইতে কলিকাতা, ঢাকা, কুমারখালি, পাবনা, রাজসাহী, সহর ইত্যাদির কোন পথে না গিয়া, এক ধীবরকে কয়েকটী পয়সা দিয়া, পুর্ব্বদিকে প্রবাহিত গোরাই নদী পার হইয়া কয়া নামক গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেখানে আপনার সর্ব্ববিধ পরিচয় গোপন করিয়া, এক নূতন কল্পিত পরিচয় দিয়া, এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রায় এক মাস হইল সে তথায় অপেক্ষা করিতেছে।

মোক্ষদা যখন পঞ্চম্ বর্ষীয়া বালিকা, তখন তাহার পিতা গোলকনাথ

আচার্য্য, এক পুত্র ও এক কন্যাসহ পত্নী মহামায়াকে, বাসুদেবপুরে পিতৃগৃহে রাখিয়া, তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন। তাহার পর দেখিতে দেখিতে জলের মত ২৬টী বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পিতার গৃহত্যাগের সময় পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা মোক্ষদা পিতার যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, তাহা তাহার বেশ স্মরণ আছে। তাহার স্মৃতি-পটে কত ছবির ছায়া পড়িয়া সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই শৈশবের স্মৃতি-পটে গোলকনাথের যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা চিরদিন সমান ভাবে নূতন ও নিখুঁত রহিয়াছে। সে চিত্রের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। মোক্ষদার আত্মহত্যার চেষ্টার দিন হইতে পিতার সেই সৌম্যমূর্ত্তি তাহার ধ্যান জ্ঞান হইয়াছে, কোথায় গেলে, কাহার আশ্রয় লইলে, পিতার সাক্ষাৎ পাইবে, ভাবিতে ভাবিতে পাগলের মত হইয়াছে। কয়ার ব্রাহ্মণ বাড়ীতে গৃহকর্ম্মে কি বিশ্রামে, সজনে কি নির্জ্জনে, পুষ্করিণী ঘাটে কি পুষ্পোদ্যানে, সর্ব্বত্রই তাহাকে দেখিয়া উন্মাদিনী বলিয়া বোধ হয়। তাহাকে দেখিলেই বোধ হয়, যেন সে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাকাইয়া, কাহারও অপেক্ষা করিতেছে। কাহাকেও আসিতে না দেখিয়া, বিষাদ ও বিলাপব্যঞ্জক মুখে গভীর নিরাশার কালিমা ঢালিয়া দিয়া, মর্ম্মান্তিক ক্ষোভে, নতদৃষ্টিতে অজস্র ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করে। আপাত দৃষ্টিতে তাহাকে পাগলিনী বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু একটু মনোযোগ সহাকারে দেখিলে দেখা যায়, মোক্ষদার মধুপমুগ্ধকারী মুখকমলে সংসারের সকল ভাবের সংস্থান হইয়াছে। একটী ক্ষুদ্র গোলক-পৃষ্ঠে যেমন এই ভূমণ্ডলের পূর্ণ মানচিত্র চিত্রিত হয়, সেইরূপ মোক্ষদার মুক্ত কুন্তলকলাপপরিবৃত মুখমণ্ডলে সংসারের একখানি পূর্ণ প্রতিকৃতি প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল দেখিবার মত চক্ষু ও বুঝিবার মত বুদ্ধি লইয়া একটীবার তাহার দিকে তাকাইলে বুঝা যাইবে যে, সেখানে একদিকে নিত্যপ্রিয় হৃদয়ের লালসার প্রবলতা, মলিন সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী পদার্থের প্রতি উদাস

উপেক্ষার ভাব অন্য দিকে, একদিকে মানবসমাজের সহিত হৃদয়ের একটা সুদৃঢ় সম্বন্ধ সংস্থাপনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অনিত্য সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনাকে পরাপ্রীতির পুণ্য-সলিলে নিমজ্জিত করিবার সঙ্কল্প অন্য দিকে; একদিকে কল্পনাতে বাসনার শত শত বুদ্বুদ উঠিয়া মোক্ষদার হৃদয়-সরোবরের স্নিগ্ধ স্থির ভাব বিনষ্ট করিতেছে, অন্য দিকে মোক্ষপথে অগ্রসর হইবার জন্য মোক্ষদা পাদক্ষেপ করিয়া দণ্ডায়মানা, এই অনিত্য দুঃখ ও নিত্যসুখের সংগ্রামে মোক্ষদার হৃদয় আজ কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। শান্তিরাজ্য সংস্থাপনে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দুর্য্যোধনাদি শত শত্রু এক দিকে, অনন্যসাধারণ শান্তিপ্রিয় ও চিরসহিষ্ণু, ন্যায়পরায়ণ উদারমতি ধর্ম্মরাজ পঞ্চ ভ্রাতায় অন্য দিকে। আপাতসুন্দর আশুপ্রীতিকর মধুমিষ্ট বাসনারাজির পৃষ্ঠপোষকরূপে মহানুভব ভীষ্ম, মহাকুশলী দ্রোণাচার্য্য, দানধর্ম্মের অবতার মহারথ কর্ণসেন দণ্ডায়মান, এমন কি সংসার বিজয়ে ষোল আনা সক্ষম নারায়ণীসেনাও কামনাকুলের পৃষ্ঠপোষকরূপে দণ্ডায়মান, অন্য দিকে পরাপ্রীতির পথে মোক্ষপথে একমাত্র নারায়ণ ধর্ম্মরাজের সুহৃদ ও সহায়রূপে দণ্ডায়মান।

মোক্ষদার হৃদয় আজ এই ভীষণ সমর-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, বৈদ্যনাথের অনুনয় বিনয় অনুরাগ ও আগ্রহ, বৈদ্যনাথের সুখ সম্পদ অর্থ ও ঐশ্বর্য্য সর্ব্বোপরি বৈদ্যনাথের আত্মবিক্রয় মোক্ষদার নয়ন-সমীপে নিয়ত ভাসিতেছে—সেগুলি প্রীতির পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া মোক্ষদার হৃদয় আকুল করিয়া তুলিতেছে, সেই প্রলোভনপুঞ্জ মিলিত হইয়া মোক্ষদার হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে সুখ সম্ভোগের লালসা নিয়ত জাগ্রত রাখিয়াছে, সেই অবলার ক্ষুদ্র প্রাণ-বিহঙ্গটীকে এই মরুময় সংসার প্রান্তরে হরিদ্বর্ণ পত্রাচ্ছাদিত তরুচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে—হৃদয় মন জুড়াইতে—অঙ্গরাগ শীতল করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছে। মোক্ষদার বাসনা-পটে, বৈদ্যনাথের কাতর ক্রন্দন ও করজোড়ে আত্মবিসর্জ্জন, দিনে দিনে

—ক্ষণে ক্ষণে নূতন বেশে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রতিভাত হইতেছে, আর মোক্ষদা দিনে দশ বার প্রিয়জনোপম কুহকিনী প্রলোভনের কুহক-ক্রোড়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেছে। তখন সেই অনাথিনী দুঃখিনীকে দেখিলে বোধ হয় যেন, কোন নিপুণ শিল্পী এই মনোজ্ঞা নারীমূর্ত্তি গঠন করিয়া, এই নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তের উপবনমাঝারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। অন্য দিকে অনির্দ্দিষ্ট—মৃত কি জীবিত, কেবলমাত্র শৈশব-কল্পনার পুরাতন চিত্রপটে অঙ্কিত পিতৃমূর্ত্তি—পুণ্যপবিত্রতামাখা সেই সাত্বিক মূর্ত্তি—সংসারের সর্ব্ববিধ সুখ সম্ভোগের অনুকূল অবস্থা উপেক্ষা করিয়া সংযমের পথে—বৈরাগ্যের পথে, পাদক্ষেপোদ্যত পিতার সেই দেবমূর্ত্তি, মোক্ষদার প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে। সেই মূর্ত্তি মোক্ষদার ধ্যান জ্ঞান হইয়াছে। মোক্ষদা বুঝিতে পারে—পরিষ্কার অনুভব করে, সে মূর্ত্তির চিন্তায় সুখ আছে কিন্তু সংসার নাই, শান্তি আছে, সান্ত্বনা নাই, পরিণাম আছে, প্রেম নাই, বিরাম আছে আরাম নাই, কিন্তু তবুও যেন তাহার ভীষণ সংগ্রামসঙ্কুল হৃদয়ক্ষেত্রের কোন নিভৃত কক্ষ হইতে কে যেন এ আরাম-বিহীন বিরামের, এই প্রীতি বিহীন পরিণামের, এই সান্ত্বনা-শূন্য শান্তির, এই সংসার-শূন্য সুখের একটানা স্রোতে চক্ষু মুদিয়া হৃদয়ের দর্পণখানি বিসর্জ্জন দিতে ইঙ্গিত করিতেছে। মোক্ষদা সে ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকে, তাই থাকিয়া থাকিয়া যখনই সে ইঙ্গিতের সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া ইঙ্গিতকর্ত্তার অনুসন্ধান করে, তখনই আলোক ও অন্ধকার বিমিশ্রিত আবছায়ার অন্তরাল হইতে সেই দেবোপম পিতৃমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে, আর অমনি মোক্ষদা পাগলিনীর ন্যায় বিক্ষিপ্ত চিত্তে চারিদিকে তাকাইয়া বসিয়া পড়ে, আর তাহার চারিদিক অন্ধকার হইয়া যায়, সে অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করে। প্রায় একমাস হইল মোক্ষদা এই ভীষণ সংগ্রামসমারোহের ক্রীড়নক হইয়া কাল যাপন করিতেছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কাশী যাত্রায়

দেবসেবক জগন্নাথ ভট্টাচার্য্যের লোকান্তর গমনে মালতীর মা মালতীকে লইয়া নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণের আগুকৃত্য শেষ হইয়া গেল। মালতীর বিবাহের পুনরুত্থাপনে দেবালয়পল্লীর প্রায় সকল লোকেই বিরোধী হইয়া পড়িল। দেবসেবকের কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি থাকায়, যাহারা তাঁহার স্বপক্ষতা করিতেছিল, তাহারাও ক্রমে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল, সুতরাং ব্রাহ্মণীর পক্ষে, কন্যার বিবাহ সংঘটন এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণী কন্যার পরিণাম চিন্তা করিয়া আকুল, কিন্তু মালতী এই সকল অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্যেও গোপনে গোপনে মনের কোণে এক বিন্দু আনন্দ অনুভব করে। তাহার সেই গোপন আনন্দ সম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এক গভীর বিষাদ ভার তাহার জীবনের সমগ্র বহির্ভাগ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; তাহার হৃদয়ের সুখবিন্দুর আবির্ভাবে যুগপৎ চিত্তরঞ্জনের নিরুদ্দেশের কথা স্মরণ হয়; "আজ যদি চিত্তরঞ্জন নিকটে থাকিত, কোথায় গেলে, কাহার আশ্রয় লইলে, তাহার সংবাদ পাওয়া যায়, কে সে ওড়া পাখীর সংবাদ আনিয়া দিবে," এই ভাবিয়া মালতীও অধীর ও আকুল হইয়া পড়ে। দিনে রেতে সর্ব্বক্ষণই মা ও মেয়ে এই দুই বিপরীত ভাবে ম্রিয়মাণ ও অবসন্ন। দেবালয়পল্লীর কোন প্রবীণ লোক সাঁইমানার লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত মালতীর বিবাহ দেওয়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গোকুল নামে পাড়ার একটী অল্প বয়স্ক যুবক, বিরোধী হইয়া মালতীর বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। মন্দ কাজে সহজেই লোক লোকের সহায়তা পায়। গোকুলের দল ক্রমে পুষ্ট হইয়া

উঠিল, ইহাদের অনিষ্টসাধনে বিধিমতে বদ্ধপরিকর হইল। মালতীকে বিবাহ করিতে লোকনাথের সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও, জননী ও হলধর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অনভিমতে সে এ কার্য্য করিতে পারিল না। লোকনাথ দেবসেবিকা ব্রাহ্মণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বহু অনুনয় বিনয় সহকারে, নিজের আপত্তি জ্ঞাপন করিল। ব্রাহ্মণী নিরুত্তরে অধোবদনে দণ্ডায়মানা, লোকনাথ একটী প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। মালতী ভাবিয়াছিল, পাঁচ জনের কথা পায়ে ঠেলিয়া লোকনাথ তাহাকে বিবাহ করিতে অগ্রসর হইলেই সর্ব্বনাশ, তাই আজ মালতীর ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। ব্রাহ্মণী বহু চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইলেন এবং পরিশেষে নিরুপায় হইয়া কাশীযাত্রার আয়োজন করিলেন, কিন্তু তাতেও বিঘ্ন উপস্থিত হইল। দুটী স্ত্রীলোক, কাহার সঙ্গে যাইবেন, ব্রাহ্মণী ভাবিয়া আকুল! একদিন সন্ধ্যাকালে নিরুপায় হইয়া এই চিন্তা করিতে-ছেন, এমন সময়ে শুনিলেন যে, গোকুল মুকুয্যে তাহার বিধবা ভগ্নীকে কাশীতে তাহার মায়ের নিকট রাখিতে যাইতেছে। গোকুলের ভগিনী কামিনী তত সুবিধার লোকও নয়, তাতে আবার গোকুল তাদের বিপক্ষ পক্ষ, এমন স্থলে তাদের সঙ্গে যাওয়া ভাল কি না চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণীর আহ্বানে দেবসেবক জগন্নাথের এক পূর্ব্ব সুহৃদ্ ও সহচর ভগবতীচরণ ঘোষ কাশী যাত্রার ব্যবস্থা বিষয়ে পরামর্শ দিতে আসিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাকেই সঙ্গে যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিলেন।

ভ। সম্মুখে রথ আসিতেছে। বাড়ীতে কৃষ্ণচন্দ্রের রথ, আমি না থাকিলে, সে সকল অনুষ্ঠানের নির্ব্বাহ হইবে না। আমার যাবার উপায় নাই।

ব্রা। তবে কি আমি ভেসে যাব? আমার একজন গিয়ে সবই অন্ধকার হ'লো।

ভ। বড় বউ কেঁদ না। তোমার চখের জলে আমার অকল্যাণ

হবে। দাদা ঠাকুর আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। আমার উচিত, সব কাজ ফেলে, তোমার কাজ করা। আমার বাড়ীতে অন্য কোন গুরুতর বাধা থাকিলে, তা ফেলেও তোমাকে রাখিতে যাইতাম। এটা আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, কেমন করে ফেলে যাই।

ব্রা। আমাদের রেখে আসাটাও ত ধর্ম্ম, বরং বড় ধর্ম্ম, আমরা বিপদে পড়্‌লে তোমার ধর্ম্মহানি হবে না? লক্ষ্মী দাদা আমার, এই মেয়েটীর মুখের দিকে তাকিয়ে তোমাকে এ কাজ কর্‌তেই হবে।

ভ। আমি যদি ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি?

ব্রা। কি ব্যবস্থা?

ভ। যদি কোন লোক পাওয়া যায়?

ব্রা। গোকুল তার বোন্‌কে নিয়ে কাশী যাবে, কিন্তু কামিনী ও গোকুল ওদের কেউ লোক ভাল নয়। ভাল হ'লে ওদের সঙ্গেই যেতুম্।

ভ। আমি যদি তাদের সঙ্গে আমার একজন লোক দেই?

ব্রা। তবুও না। আমি শুনেছি গোকুল আমার মালতীর বিয়েতে বাগ্‌ড়া দিয়েছে; সেটা কেবল তার মতলব ভাল নয় ব'লে। এমন অবস্থায়, জেনে শুনে, তার হাতে পড়া ভাল নয়। শেষে কি হতে কি হবে, না ভাই, তা কিছুতেই হবে না।

ভ। তবে রথের এ কয় দিন যাক্, আর কটা দিন? পনরটী দিন বইত নয়। তারপর আমি নিজে গিয়ে রেখে আস্‌বো।

ব্রা। আমার আর এক তিল এখানে থাক্‌তে ইচ্ছে নেই। তুমিই চল, তুমি না হ'লে আমার এ কাজ কিছুতেই হবে না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আরোগ্য লাভে

চিত্তরঞ্জন আসন্ন মৃত্যু হইতে সুচিকিৎসার গুণে রক্ষা পাইয়াছে। কাজকর্ম্ম করিতেছে কিন্তু তাহার শরীর এখনও দুর্ব্বল। বসিলে উঠিতে, উঠিলে বসিতে ক্লান্তি বোধ হয়। শরীরটা যেন নিজের নহে, পরের গৃহে বাস করিলে, যেমন একটা সম্বন্ধহীন উপেক্ষার ভাব মানুষের মন অধিকার করে, সেইরূপ চিত্তরঞ্জন ঠিক যেন, নিজের দেহে, পরের মত বাস করিতেছে। এই দারুণ দুর্ঘটনায় তাহার দেহ মন যেন পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, এখনও দুয়ের মিলন হয় নাই।

বেল সাহেব যে দিন গৌহাটীর সিভিল সার্জ্জনকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন, সেই দিন সিভিল সার্জ্জন আসিয়া পৌছিতে না পৌছিতে, পঞ্চানন নিজের ভাগ্যে ভব দিয়া গা ঢাকা দিয়াছেন। পঞ্চাননকে ধরিবার জন্য বেল সাহেব চারিদিকে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই পঞ্চাননের সন্ধান পায় নাই। পরিশেষে সাহেব পঞ্চাননকে ধরিবার জন্য, আইন আদালতের সাহায্য লইলেন, থানায় থানায়—জেলায় জেলায়, সংবাদ দিয়া পঞ্চাননের কিনারা করিতে পারিলেন না। পঞ্চানন মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে ফেরোয়ার হইয়াছেন। নিজের তহবিলে যে সামান্য অর্থ ছিল, তাহার সাহায্যে পঞ্চানন ধুবড়ীর পথে রংপুর যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু সহরে কিম্বা লোকালয়ে তাঁহার যাইবার সাহস নাই। দিনের বেলা পথে পথিকের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলা, রাত্রিতে বৃক্ষতলে অথবা পথপ্রান্তে পান্থশালায় আত্মগোপন করিয়া অবস্থান ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই অনাহারে ও অল্পাহারে, অবিশ্রান্ত

দুর্ভাবনার ভার মাথায় লইয়া, পঞ্চানন পথে পথে দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে এমন হইল যে, আর দিন চলে না। শরীরও এ ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল। আসামের সীমানা পার হইয়া পঞ্চানন, একটু নিরুদ্বেগ হইয়াছেন বলিয়া, মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও সহসা লাল পাগ্‌ড়ী চাপ্‌রাস, কি মাথায় টুপি দেখিলে, পঞ্চাননের মন আপনা আপনি জড়সড় হয়, ভয়ে শুষ্কতালু হইয়া অন্য পথে চলিতে যান, চিত্তচাঞ্চল্য নিবন্ধন কোথায় পা ফেলিতে কোথায় পা ফেলেন তাহার ঠিক থাকে না। এই ভাবে কিছুকাল ক্লেশ ভোগ করিয়া রংপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চাননের এক ভগ্নীপতি রংপুরে মোক্তারি করেন। দশটাকা উপার্জ্জনও করেন, লোকও মন্দ নহেন। সন্ধ্যা অতীত প্রায়, এমন সময় পঞ্চানন ভগ্নীর আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগ্নী ভাইয়ের বেশভূষা, শরীরের অবস্থা ও পাগলের ন্যায় মূর্ত্তি এবং অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভগ্নী বহু বিলাপ ও পরিতাপ সহকারে অনেক রোদন করিয়া শেষে সহোদরের পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত হইলেন। পঞ্চাননের ভগ্নীপতি কৃষ্ণকমল ঘোষাল বুদ্ধিমান লোক, তাতে মোক্তার মানুষ। তিনি শ্যালকের অবস্থা দেখিয়া তাহার উদ্দেশ্য ও পরিণাম বুঝিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করিলেন না।

পঞ্চানন তিন দিবস হইল, ভগ্নীর গৃহের অন্তঃপুরে বাস করিতেছেন। চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে কৃষ্ণকমল বাহিরের ঘরে বসিয়া মক্কেলদের সঙ্গে মকদ্দমার পরামর্শাদি করিতেছেন, এমন সময় পুলিসের এক পরোয়ানা সহ একজন জমাদার আসিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। পরোয়ানাখানি তাঁহার হাতে দিয়া সে গৃহের এক প্রান্তে উপবেশন করিল। পরোয়ানার মর্ম্ম এই :—

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় একজন গৌরবর্ণ মধ্যাকৃতি ব্রাহ্মণ যুবক গৌহাটী জেলার অন্তর্গত সুম্‌নার চা বাগিচায় মুন্সীর কর্ম্ম করিত, কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে বিষপ্রয়োগে চিত্তরঞ্জন নামীয় আর এক কর্ম্মচারীর প্রাণসংহারের চেষ্টা করিয়াছিল। আসামী পলাতক। শুনা যায় যে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাসুদেবপুরে তাহার বাড়ী। রংপুরের মোক্তার কৃষ্ণকমল ঘোষাল তাহার ভগ্নীপতি, নাটোরের রাজ-সরকারের কর্ম্মচারী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার মাতুল। হুগলীর পুলিস আফিসের মুহুরি শিবদাস চট্টোপাধ্যায় তাহার ছোট ভাই। এই সকল স্থানে আসামীর সন্ধান হইতে পারে, যে ব্যক্তি ইহাকে ধরাইয়া দিতে অথবা ইহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে সরকার ২০০৲ টাকা, আর বাগানের ম্যানেজার বেল সাহেব ২০০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন।

এইরূপ মুদ্রিত একখানি পরোয়ানার সঙ্গে স্বতন্ত্র কাগজে দারোগা বাবু মোক্তার বাবুকে লিখিয়াছেন—

আপনি ফৌজদারিতে সরকারের কাজ করেন, সুতরাং আমাদিগকে সর্ব্বদাই আপনার সাহায্য লইতে হয়, তাই একবারে খানাতল্লাসের হুকুম দিলাম না। কি করিব, এই চিরকুটের পৃষ্ঠায় লিখিয়া জানাইবেন। চিরকুট ফেরত দিবেন, রাখিবেন না।

আপনার একান্ত বাধ্য

রাধামোহন সিংহ।

মোক্তার বাবুকে বিচলিত হইতে দেখিয়া উপস্থিত সকলেই কিছু বিপদ গণনা করিল, কেহ কেহ ব্যস্ত হইয়া বিষয়টা জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ঘোষাল মহাশয়, বহুব্যস্ততা বিপদ্‌জনক বোধে অল্পক্ষণ মধ্যে চিত্তস্থির করিয়া, দারোগা বাবুর চিরকুটের পৃষ্ঠায় লিখিয়া দিলেন,—

আমি এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছি, অল্পক্ষণের মধ্যে,

থানায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। পরে যেরূপ বলিবেন, তাহাই করিব।

একান্ত অনুগৃহীত

শ্রীকৃষ্ণকমল ঘোষাল।

থানার লোক বিদায় করিয়া দিয়া, অন্যান্য লোক জন সমস্ত বিদায় দিয়া, ঘোষাল মহাশয় সর্ব্বমঙ্গলা সদনে উপস্থিত হইয়া সকল কথাই বলিলেন। সর্ব্বমঙ্গলা স্বামীর নিকট সহোদরের এই 'সর্ব্বনেশে' কীর্ত্তির কথা শুনিয়া নিতান্ত অধার হইয়া পড়িলেন। স্ত্রী দুই হাতে স্বামীর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"এখন তুমি রক্ষা না করিলে, ও ত যায়। এখন একটা উপায় করিয়া উহাকে রক্ষা কর, পরে ওব বরাতে যা আছে তাই হবে।"

বিরূপাক্ষ ভট্টাচার্য্য রংপুরে স্কুলমাষ্টার। তাঁহার ষোড়শবর্ষীয় একমাত্র পুত্র বরদাকান্তের সহিত ঘোষাল মহাশয়ের নবমবর্ষীয়া কন্যা লক্ষ্মীমণির বিবাহ হইয়াছে। ঘোষাল মহাশয় থানায় যাইবার পূর্ব্বে বৈবাহিকের গৃহে গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন এবং পঞ্চানন যে সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেছেন তাহাও বলিলেন। শিক্ষক মহাশয় এরূপ অপরাধীকে আশ্রয় দিতে এবং আইন আদালত হইতে তাহাকে গোপনে রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, সকলে এরূপ করিলে, দেশে অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ঘোষাল মহাশয়ের অত্যধিক মিনতিতে বাধ্য হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন। গৃহিণী সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "বরদা যদি এরূপ করিত, তাহা হইলে, তুমি কি করিতে?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিরুত্তর। ব্যাপারটা একটু সম্‌জাইয়া শেষে বলিলেন, "তাই ত, তুমি এক কথায় আমাকে 'থ' ক'রে দিলে!" গৃহিণী বলিলেন, "ঐ কল্‌কেতার খবরের

কাগজখানা * নাড়াচাড়া ক'রে, তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। এখন যাও, বেয়াইকে বল গে, যখন সুবিধা হয়, তাঁহার শালাকে আমাদের বাড়ীতে যেন রেখে যান। পরে ভাগ্যে যা আছে হবে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আমি এমন অন্যায় কাজে কখনই সায় দিতে পারি না। আমার ধর্ম্মবুদ্ধি নিষেধ করিতেছে। মহারাণীর প্রত্যেক প্রজা রাজকার্য্যে সহায়তা করিতে আইনানুসারে বাধ্য, আমার উচিত অপরাধীকে ধরাইয়া দেওয়া। সেরূপ স্থলে, আমি না হয় নীরব থাকিব, কিন্তু আমার বাড়ীতে আসামীকে আশ্রয় দিতে পারিব না। তখন গৃহিণী স্বয়ং কর্ত্তার সাহায্যে বৈবাহিক মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, "এ বিষয়ে ওঁর সঙ্গে কোন কথা কহিবার আবশ্যক নাই। আপনি আপনার শ্যালককে গোপনে আমাদের বাড়ীতে রাখিয়া যান। উনিও যেন জানিতে না পারেন।"

মোক্তার বাবু বেহাইনের পরামর্শমত পঞ্চাননকে তৎক্ষণাৎ কুটুম্বিনী-গৃহে রাখিয়া পুলিসের দারোগা বাবুর সহিত দেখা করিতে গেলেন।

দা। আসতে আজ্ঞা হউক, বাটীর সংবাদ ভাল ত?

মো। হাঁ মহাশয়, গৃহিণীর শরীর একটু অসুস্থ ছিল, এখন ভাল আছেন।

দা। আসামীর কি কোন সংবাদ পাইয়াছেন?

মো। আমার বাড়ীটা একবার দেখিয়া, রিপোর্ট দিলে হ'তো না?

দা। পোলো চাপা মাছ পালিয়ে গেলে, পুকুরের মালিককে খবর দিয়ে কি লাভ?

মোক্তার বাবু স্ফুটনোন্মুখ হাসির কণা অধরপ্রান্তে লুকাইয়া অবাক দৃষ্টিতে দারোগা বাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"সে কি! আসামীর কি কোন সন্ধান পাইয়াছিলেন?"

* সেকালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

চতুর চূড়ামণি দারোগা বাবু বিদ্যুৎবিভাবৎ হাসির আলোকে মুখমণ্ডল ভাসাইয়া, অতি মিষ্ট অথচ দৃঢ়তার পরিচায়ক স্বরে বলিলেন, "বেশ বেশ, আমারই লোক আজ তিন দিবস হইল, সন্ধ্যার সময়ে আপনার শ্যালককে আপনার গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে, আমি ইচ্ছা করিলে, এই তিন দিনের যে কোন সময়ে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতাম। কিন্তু কেবল আপনি আসামীর আত্মীয় বলিয়াই, আসামী আমার হাতে অব্যাহতি পাইয়াছে। আর আপনি আমার নিকট তাহার সংবাদ গোপন করিতেছেন ?"

ঘোষাল মহাশয় নিরুত্তরে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "আপনার জানা থাকিলেও কি আমার বলা উচিত ? আপনি এবং আমি উভয়েই ত আইনের মারপেঁচ জানি। আপনি যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি অনুগৃহীত ও কৃতজ্ঞ।"

দারোগা বাবু বলিলেন, "আপনার কৃতজ্ঞ হইবার প্রয়োজন নাই, আমি হয়ত আর দুদিন পরে কর্ম্ম-সূত্রে আপনার আশ্রয় ও সহায়তার জন্য লালায়িত হইব। এখন আসামীকে কোথায় চালান দিলেন ?"

মো। সে সংবাদ আপনার না জানাই ভাল।

দা। আমার জানার প্রয়োজন নাই। বরং না জানাই ভাল। তবে পরোয়ানার কথিত কোথাও যেন তাহাকে পাঠাইবেন না।

মো। সে বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে।

দা। আপাততঃ কিছু দিন তাহাকে এইখানে কোথাও রাখিয়া দিন, কারণ আমি এখানে যে কয়দিন আছি, তাহার গ্রেপ্তার হওয়ার ভয় নাই। আমি যখন চলিয়া যাইব, তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিলেই হইবে।

মোক্তার বাবু দারোগা বাবুর এই অনুগ্রহ প্রদর্শনে নিরতিশয় অনুগৃহীত হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে ও বাষ্পাকুল নয়নে দারোগা বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা

জানাইয়া গাত্রোত্থান করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দারোগা বাবু তাঁহার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "আসামীকে বাড়ীতে রাখিবেন না এবং এখানে কোন আত্মীয় স্থলে না রাখিলেই ভাল হয়।" কৃষ্ণকমল অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই, শত যোজন দূরে থাকিয়া লোকের নাড়ী নক্ষত্র নির্ণয় করিতে পারেন! বাবা! আপনাদের খুরে কোটী কোটী নমস্কার!" দারোগা বাবু বলিলেন, "মহাশয়, ইহাই আমাদের অন্ন সংস্থানের একমাত্র উপায়, প্রাণের দায়ে এইরূপ ধাত হইয়াছে।"

কৃষ্ণকমল ভয়, ভাবনা ও কৃতজ্ঞতার উপকরণে গঠিত এক অপূর্ব্ব দোলায় আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বমঙ্গলা স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় পলে পলে পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। স্বামীকে আসিতে দেখিয়া ভীতিবিস্ফারিতনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইলেন, কৃষ্ণকমল বলিলেন,—

এখনকার মত রক্ষা হইল, পরে কি হবে বলিতে পারি না। তোমার ভাইকে বেহাই বাড়ীতে রাখিতেও দারোগা নিষেধ করিয়াছে।"

স্ত্রী। দারোগা কি করিয়া জানিতে পারিল?

স্বা। তারা লোকের কথা শুনে, চোখ মুখ দেখে, পেটের কথা টেনে বা'র করে।

স্ত্রী। তুমি বুঝি জেরায় বলে ফেল্লে?

স্বা। ঘুণাক্ষরেও বলি নাই!

স্ত্রী। তবে কেমন করে 'পেটের কথা' টেনে বাহির করিল?

স্বা। আমার উঠিবার সময় বলিল, "নিজের বাড়ীতে রাখিবেন না, কোন আত্মীয় স্থলেও রাখিবেন না।"

স্ত্রী। বাবা! পুলিসের কি ভয়ানক বুদ্ধি!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

চিত্তবিকারে

বৈদ্যনাথের বিপুল আয়োজন ব্যর্থ হইল। নানা পথে প্রেরিত লোকদের কেহই মোক্ষদার সংবাদ আনিতে পারিল না। কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, সহর ও পাবনার লোক ফিরিয়া আসিল। ক্রমে দূরদূরান্তরের লোকও ফিরিয়া আসিয়া বৈদ্যনাথকে একই সংবাদ দিল—"তাহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।"

বৈদ্যনাথের লোকেরা আড়কাটির জাতি, তাহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। সেই সকল অসাধ্যসাধনে সক্ষম লোকগুলি যখন একে একে বিফল-চেষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন বৈদ্যনাথ নিরাশ হইয়া কর্ম্মকাজে মনোযোগ দিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কঠোরপ্রকৃতি, স্বার্থপর, বিষয়ী বৈদ্যনাথ বিষয়কর্ম্মে আপনাকে পূর্ব্ববৎ বিক্রয় করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিরাশার সংবাদটা নানা স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে আসিতেছিল, তাই ইতিপূর্ব্বে নিরাশার পরিমাণটা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সংবাদ আনয়নে নিযুক্ত শেষ ব্যক্তি যখন ফিরিল ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তিগণের উক্তির পুনরাবৃত্তি করিল, তখন বৈদ্যনাথের মন আপনা আপনি অবশ হইয়া পড়িল। কর্ম্মানুরক্তির স্পৃহা মন্দীভূত হইয়া আসিল। কিছু করিতে গেলে মোক্ষদার সেই অশ্রুসিক্ত, কুন্তলকলাপ-পরিবৃত মুখকমল বৈদ্যনাথের বিষয়বদ্ধ দৃষ্টির সমক্ষে অতর্কিত ভাবে ভাসিয়া উঠে, আর বৈদ্যনাথ চমকিত চিত্তে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করেন; তখন বৈদ্যনাথের মনে হয়, তবে বুঝি মোক্ষদা নদীবক্ষে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহার প্রেতাত্মা বুঝি আমার আশেপাশে বিচরণ করিতেছে। মোক্ষদার

অভাব যখন বৈদ্যনাথের ক্ষণিক চিত্তবিকার উপস্থিত করে, তখন কোন একদিকে পলকশূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাকাইয়া বৈদ্যনাথের চক্ষু দুটী আপনা আপনি মুদিত হইয়া পড়ে, আর সেই নিমীলিতনেত্র বৈদ্যনাথের চিন্তাপথে, মোক্ষদার পাগলিনীর বেশ, মোক্ষদার গভীর আকুলতামাখা স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয়, বৈদ্যনাথের ইচ্ছা হয়, চক্ষের আবরণ খুলিয়া দিব্যদৃষ্টিতে একটীবার এই অপূর্ব্বমূর্ত্তি দর্শন করেন, কিন্তু কোথায় গেলে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, মোক্ষদার সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা ভাবিয়া পান না।

সন্ধ্যাসমাগমে পূর্ব্বাকাশে মেঘক্রোড়ের ইন্দ্রধনুর ক্ষীণ রেখা যেমন ত্বরায় শূন্যে মিলাইয়া যায়, বৈদ্যনাথের বিষয়বাসনার মহাশূন্যতায় অস্তগত মোক্ষদার প্রাপ্তির শেষ রেখাও তেমনি মিলাইয়া যাইতেছে। যতই দিন যাইতেছে, বৈদ্যনাথের প্রাণের পটে, মোক্ষদার মিলনের ক্ষীণাশা ততই ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এই মিলনাশা যতই দূর হইতে সুদূরে গিয়া পড়িতেছে, অলক্ষিতভাবে বৈদ্যনাথের প্রাণে মোক্ষদাকে লাভ করিবার ইচ্ছা ততই প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

এইরূপে প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল। বৈদ্যনাথের ভৃত্যবর্গ ও বন্ধুবর্গ বৈদ্যনাথের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। প্রধান ভৃত্য চূড়ামণি প্রভুর মতি স্থির রাখিবার জন্য বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিলেও, সে বুঝিতে পারিতেছে যে, তাহার অবলম্বিত উপায়গুলি ব্যর্থ হইতেছে। যেখানে যেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে,প্রভুর মতি স্থির থাকিবে,তাহা সে বেশ বুঝে,বুঝে বলিয়াই তাহার অসীম সাহস। সে তাহার অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া প্রভুর সময়োপযোগী পরিচর্য্যায় নিয়ত নিযুক্ত, কিন্তু একদিন সহসা চূড়ামণির চৈতন্যোদয় হইল; চূড়ামণি বুঝিল যে, তাহার অসীম সাহসে কুলাইতেছে না।

যে দিন সন্ধ্যার সময় চূড়ামণির এই নূতন জ্ঞানোদয় ও সঙ্গে সঙ্গে অসীম সাহসের বিলোপ ঘটিল সেই সন্ধ্যার সময়ে চূড়ামণি আপনা আপনি

বলিতেছে, "এমন করে শরীরটী মনটী ভেঙ্গে ফেলে কি হবে, না হয় একটা সংসারধর্ম্ম করিলেও ত হয়।"

বৈ। চূড়ামণি কি বলিতেছ?

চূ। 'পুরোণো' চাকরে যা বলিতে পারে, তাই বলিতেছি।

বৈ। কি বলিলে, আবার বল।

চূ। এমন ক'রে সর্ব্বনাশ না ক'রে বিয়েথা ক'রে স্থখে সংসার করলেই ত ভাল হয়। টাকা কড়িরও অভাব নেই, বয়সও বেশী নয়।

বৈ। চূড়ামণি, তুমি কি দেখে এসকল কথা বলিতেছ?

চূ। কেবল আমিই কি বলি? আর দশজনেও এই কথাই বলে, তা শুনিলেই পারেন।

বৈ। লোকের বলিবার মত এমন কি হ'য়েছে, কই, আমিত জানি না।

বৈন্থনাথের জীবনে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বৈন্থনাথ তাহা সত্য-সত্যই বুঝিতেন না। আজ চূড়ামণির কথার প্রতিবাদ করিতে, মনের দৃঢ়তা আরও দৃঢ়তর হইল। বৈন্থনাথ আরামে উপবেশন পূর্ব্বক ধূমপান করিতে করিতে, মনের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু চিত্তবিকারের কোন লক্ষণ ধরিতে পারিলেন না।

বৈন্থনাথ একাকী বসিয়া একাগ্রচিত্তে হৃদয়ের নিভৃত কক্ষগুলি চুপে চুপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বৈন্থনাথ দেখিলেন এক অর্থোপার্জ্জন সঙ্কল্প লইয়া জীবন পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ববৎ প্রবল রহিয়াছে। আপনাকে নিরাপদ রাখিয়া সর্ব্ববিধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করা যায়, এই জ্ঞান লইয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। সে জ্ঞানে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। যে সকল উপায়ে লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে দূর দেশে পাঠাইয়া তিনি রাশি রাশি অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন, সে সকল উপায় অবলম্বন করিতে কত লোকের কতবিধ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন, আজ দেখিলেন,

প্রয়োজন হইলে, ঠিক সেই পরিমাণ সর্ব্বনাশ সাধন করিতে আজও তিনি একতিল পশ্চাৎপদ নহেন। আহারবিহারে ও বন্ধুমণ্ডলে যেমন সুখে, যেমন সমারোহে বিরাজ করিতেন, আজও তাহাই করিতে সমান আস্থাবান। অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ সম্মুখে রাখিয়া জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছিলেন, আজ তাহা সমানভাবে অনির্দ্দিষ্টই রহিয়াছে, তবে চূড়ামণি পরিবর্ত্তন কোথায় দেখিল? আমি আমাতে কিছু দেখিতে পাইলাম না, আর চাকরটা দেখিল! কি দেখিল? কোথায় দেখিল? মোক্ষদার অভাবে? কেন, মোক্ষদার শূন্য স্থান পূরণ করা আমার পক্ষে কতক্ষণের কাজ? তবে কি পরিবর্ত্তন দেখিল? কোথায় পরিবর্ত্তন? কাজের মধ্যে মোক্ষদার সন্ধানে, এবং পাইলে তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইয়াছি। 'তা—তা' এত কাল একটা লোক ঘরে রহিল, কত আদর যত্ন পাইলাম ও করিলাম, সে চলিয়া গেল, একবার তাহার খোঁজ করিব না? একটা কুলি পালাইলে, টাকার জন্য কি না করি, আর একটা মানুষ এত দিন ছিল, তারপর মনের আবেগে আত্ম-হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তারপর মনের সেইরূপ বিকৃত অবস্থায় চলিয়া গেল, তাহার সন্ধান লইব না? এটা আর কি পরিবর্ত্তন বুঝিলাম না। কেন? আমি ত নিজের চেষ্টায় ও হুকুম দিয়া কত শত পরিত্যক্ত ও পীড়িত রোগীকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়া চিকিৎসা করাইয়া চা-বাগানে পাঠাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াছি। যখন পথ হইতে কুড়াইয়া আনিতে পারিয়াছি, তখন বাসার একটা লোক চলিয়া গেলে, তাহাকে খুঁজিয়াছি, এটা কি আর পরিত্যক্ত রোগীকে কুড়াইয়া আনা অপেক্ষা একটা বেশী কিছু? মোক্ষদাকে প্রথমে যে অবস্থায় পথে পাইয়া আনিয়াছিলাম, তাহার শারীরিক মানসিক সুস্থতা সম্পাদনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলাম, আরোগ্য লাভ করিলে তাহাকে চা বাগানে পাঠাইব বলিয়াই ত এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলাম। তাহাকে চা

বাগানে পাঠাইয়া যে টাকা পাইতাম, বোধ হয়, তাহাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিতে তাহার দশগুণ ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার সন্ধান লওয়ার চেষ্টা কি পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী কিছু? যাক্ আমি আর মোক্ষদার বিষয় ভাবিব না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন বিপদে

কয়ার কুমারনাথ ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণনগরে ওকালতী করেন। কয়া পল্লীগ্রাম, অল্প কয়েক ঘর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের বাস, সেই পরিমাণে অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির বাসও আছে। অজ্ঞাতকুলশীল ব্রাহ্মণকন্যা মোক্ষদাকে কয়াতে রাখা সুবিবেচনার কার্য্য নহে, এই বিবেচনায় কুমার-নাথ বৃদ্ধ পিতৃদেবের আদেশ ও অনুমতি ক্রমে মোক্ষদাকে কৃষ্ণনগরে লইয়া গেলেন। মোক্ষদাকে কৃষ্ণনগরে লইয়া যাইবার ইচ্ছাটুকু, মোক্ষদার প্রতি প্রথম বক্র দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে গোপনে গোপনে কুমারনাথের হৃদয়ে স্থান পাইতেছিল। কেবল মোক্ষদাকে দেখিবার জন্য কুমারনাথ একমাস কর্ম্ম পণ্ড করিয়াও এটা সেটা উপলক্ষ করিয়া, ক্রমান্বয়ে প্রতি শনিবারে বাড়ী আসিয়াছেন। বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি ভক্তির ভাবটা সহসা যেন ফোয়ারার আকার ধারণ করিল, আজ কাপড়-খানি, কাল পূজার আসনখানি, পরশ্ব গৃহদেবতা গোবিন্দজীউর জন্য পিত্তলের সিংহাসন ইত্যাদি ইত্যাদি সর্ব্বদাই আসিতেছে। পুত্রের গৃহের প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ দর্শনে পিতামাতার আনন্দের সীমা রহিল না।

শতকণ্ঠে প্রশংসা ধ্বনিত হইতে লাগিল। কেবল মোক্ষদা কুমারনাথের চলাফেরার গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। কিন্তু কাহাকেও কিছু বলে নাই, সর্ব্বদা কুমারনাথ ও কুমারনাথের আলোচনা হইতে দূরে অবস্থিতি করিত। কুমারনাথ মোক্ষদার লোকবিরল সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী হইয়া, তাহার জীবনপথের আবর্জ্জনা দূর করিতে লালায়িত হইয়াছিলেন, একথা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। মোক্ষদাকে কৃষ্ণনগরে লইবার যে কারণটী পিতার নিকট প্রবল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন সেটী দ্বিবিধ। পুত্রদিগের সুশিক্ষা লাভের সুবিধা হইবে বলিয়া, কুমারনাথ ইতিপূর্ব্বে পিতৃ-আদেশে পত্নী ও পুত্রকন্যাদিগকে কৃষ্ণনগরে লইয়া গিয়াছেন। তাহারা আজ দুই বৎসর হইল কৃষ্ণনগরে বাস করিতেছে। মোক্ষদা বাটীতে থাকিলে, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার উপযুক্ত লোক নাই। দ্বিতীয়তঃ তাহাকে কৃষ্ণনগরে লইলে পুত্রকন্যার লালন পালন ও গৃহিণীর অন্যান্য গৃহকর্ম্মে বিশেষ সহায়তা হইবার সম্ভাবনা। কুমারনাথের এক পিসিমা বধূমাতার ও শিশুগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগর বাস করেন। তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারেন, গো-সেবা, ঠাকুরসেবা ও বৃদ্ধের সেবাশুশ্রূষায় সহায়তা করিতে পাইয়া কৃতার্থ হন। কুমারনাথের মা প্রথম বয়সে এই বৃহৎ সংসারের সকল কাজই করিয়াছেন। এখন বয়সও পঞ্চাশ পার হয়, শরীরের অবস্থাও তত ভাল নয়। শোকও অনেক পাইয়াছেন। তাই আর একাকিনী গৃহের সকল কাজ করিয়া উঠিতে পারেন না, বিশেষতঃ যেদিন অতিথি-অভ্যাগতের পরিচর্য্যার মাত্রা একটু বৃদ্ধি পায়, সেদিন তিনি হাতের কাজে দোসর না পাইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া বসিয়া পড়েন। আর সেদিন কর্ত্রীটী পরিণতবয়স্কা কন্যাগণের অকাল মৃত্যু স্মরণ করিয়া বিষাদিত হন ও গোপনে অশ্রুমোচন করিয়া হৃদয়ভার লঘু করিবার প্রয়াস পান, এই সব কারণে মোক্ষদাকে

কৃষ্ণনগরে লইলে, কনিষ্ঠা বিধবা ভগ্নী মাতঙ্গিনীর গৃহে প্রত্যাগমনের সুযোগ সম্ভাবনায়, পিতা সম্মতি প্রদান করিলেন।

কুমারনাথ মোক্ষদার সন্দেহ ও অনিচ্ছাজড়িত সম্মতির সূত্র ধরিয়া অনেক বুঝাইয়া কৃষ্ণনগরে লইয়া গেলেন। যুক্তিশাস্ত্রবিবর্জ্জিত স্ত্রীজনসুলভ সহজ জ্ঞানে মোক্ষদা কৃষ্ণনগর যাইবার সময় মনে মনে অনুভব করিল যে, কুমারনাথের পিতা পার্ব্বতীনাথ ভট্টাচার্য্যের পিতৃস্নেহ হইতে এ অবস্থায় দূরে পড়া তাহার পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হইল না, কিন্তু অনেক দুঃখ ভোগ করিয়া, অনেক বিপদে পড়িয়াও, পদে পদে বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা স্মরণ হইলেও, কি যেন এক বিচিত্র উপায়ে মানুষ এমন কাজ করিয়া বসে, যাহা না করাই তাহার ইচ্ছা এবং যাহার বিষময় ফল সে ভোগ করিতে চায় না। এরূপ মনের অবস্থা লইয়াও মানুষ বিপদের পথে পদার্পণ করে, অগ্রসর হয়; এতদূর অগ্রসর হয় যে, ফিরিবার ইচ্ছা প্রবল হইলেও আর ফিরিতে পারে না, তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে তখন আর কুলায় না। তখন মানুষ নিরুপায় হইয়া অবস্থার দাসত্ব করে ও গোপনে গোপনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ও অশ্রুপাত করে। মোক্ষদারও তাহাই হইল।

মোক্ষদা মোক্ষলাভের পথে পাদক্ষেপ করিয়া দণ্ডায়মানা; প্রবৃত্তি-কুলের সহিত সংগ্রামে সহিষ্ণুতা সহকারে যে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় খুঁজিতেছে, তাহার জীবন-পথে এত বিঘ্ন বাধা কেন? যেন জলে কুম্ভীর ও ডাঙ্গায় বাঘ নিরস্ত্র ও অসহায় মানব-সন্তানকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। মোক্ষদা, ব্যাঘ্র বৈদ্যনাথের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষার প্রত্যাশায় পালাইতে গিয়া, কুম্ভীর কুমারনাথের কবলগত হইতে চলিল। মোক্ষদার ঘোর পরিতাপ ও বিষাদের কি এই পুরস্কার? বিধাতার বিচারে কি শেষে এই হইল?

মোক্ষদা কুমারনাথের সহিত কৃষ্ণনগর যাত্রা করিয়া পথেই বুঝিল

যে তাহার ভুল হইল। সে না বুঝিয়া বিপথে পা দিয়া ভাবিতেছে, "এখন কি আর উপায় নাই ?"

কু। মোক্ষদা, কি ভাবিতেছ ?

মো। আমি আপনাদের বাড়ীতে বেশ ছিলুম, আপনি আমাকে কয়াতে রাখিয়া গেলেই ভাল হইত।

কু। কেন মোক্ষদা ? এখানে যেমন ছিলে, বাসাতেও ঠিক তেমনি আদরে থাকবে, বরং বেশী আদর যত্ন পাবে।

মো। আমি মানুষের আদর যত্ন চাই না।

কু। সে কি ! তুমি মানুষের আদর যত্ন না নিলে, মানুষের আদর যত্নের কানাকড়িও মূল্য থাকে না।

মো। না থাকুক। আপনি আমাকে কয়ায় রাখিয়া আসুন, আমি ফিরিয়া যাই।

কু। কৃষ্ণনগরেই চল, সেখানেও ভাল থাকবে।

মো। আমি কয়াতেই ভাল থাকিব।

কু। কয়াতে আমরা থাকলে তুমি ভাল থাকতে, একা কি মানুষ ভাল থাকে ?

মো। দেখুন, আমি চিরজীবন দুঃখিনী, আর আমার দুঃখ ভোগ করিবার শক্তি নাই—আমি দুঃখ পেয়ে পেয়ে নির্লজ্জ হইয়াছি, আপনাকে স্পষ্টই বলিতেছি, আমার প্রতি কুদৃষ্টি ত্যাগ করুন।

কু। আমি তোমাকে ভাল চোখেই দেখিতেছি।

মো। স্ত্রীলোকের রূপ কি জঘন্য জিনিস ! আমাকে দেখিয়া আমারই ঘৃণা হয়।

কু। আমার সমাদর পাইলে আর ঘৃণা হইবে না।

বগুলা হইতে হাঁসখালি পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরের পথে ঘোড়ার গাড়ীতে উভয়ে ঐ কথাগুলি হইল। নদীর পরপারের গাড়ীতে কুমারনাথ

মোক্ষদাকে বলিলেন, আমি তোমার গুণানুগত রূপমুগ্ধ সেবকমাত্র, তুমি যাহা বলিবে, তোমার জন্য আমি তাহাই করিব; আজ এক মাস হইল তুমি আমার উপাস্য দেবতা হইয়াছ।

মোক্ষদা বুঝিয়াছিল কঠোর হওয়া ভিন্ন ইহার হাতে অব্যাহতি নাই, তাই মোক্ষদা বলিল, "আমার মত ঘৃণিত জীব যাহার উপাস্য দেবতা সে না জানি কত অধম।" এই কয়টা কথা শিক্ষাভিমানী কুমারনাথের হৃদয়ে বজ্রদণ্ডের ন্যায় প্রবিষ্ট হইল। কুমারনাথ প্রাণের মর্ম্ম স্থানে বিষম আঘাত অনুভব করিলেন। কুমারনাথ রোষকষায়িত নেত্রে মোক্ষদার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তুমি জান, এক মুহূর্ত্তে তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারি? তোমার স্পর্দ্ধা কম নয়; আমি তোমাকে দেবতা বলিতেছি, আর তুমি আমাকে অধম বল? যদি স্তবে তুষ্ট না হও, তবে তোমাকে এখনই বলে বদ্ধ করিতে পারি, তা জান?" "স্তবেও তুষ্ট হইব না, আর বলেও ভীত হইব না।" সব কথা বাহির হইতে না হইতে কুমারনাথ মোক্ষদাকে বাহুমূলে আবদ্ধ করিতে উদ্যত। কুমারনাথের এই হীনবৃত্তি পুরুষের ন্যায় আক্রমণে মোক্ষদা ভয়চকিত চিত্তে নয়ন মুদ্রিত করিয়া পিতৃমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "নারায়ণ! তুমিই বিপত্তে মধুসূদন, আমাকে রক্ষা কর।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

পিতৃব্যের আলয়ে

মালতীকে লইয়া ব্রাহ্মণী বহুক্লেশে নানা বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া কাশীধামে পিতৃব্য সদনে উপস্থিত হইয়াছেন। হরিনাথ বিদ্যাভূষণ ভ্রাতুষ্পুত্রীর বৈধব্য ও তন্নিবন্ধন বিবিধ ক্লেশ ও নির্য্যাতন ভোগের ব্যাপার অবগত হইয়া নিতান্ত বিষাদিত ও অশ্রুসিক্ত হইলেন। সংসারে এই বৃদ্ধের আর কেহ নাই। জ্যেষ্ঠ হরনাথ উপনয়নের সময়ে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। মধ্যম শিবনাথের পুত্র কন্যাতে পিতার নাম রক্ষা হইবে, এই ভরসায় তিনি যৌবনের মধ্যভাগে লক্ষ্মীসদৃশী পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার লোকান্তর গমনে সংসারধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি অল্পমূল্যে মধ্যমের পুত্রকে বিক্রয় করিয়া কতিপয় শিষ্যের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া কাশীবাস করেন, সে আজ পঁচিশ বৎসরের কথা। তখন মালতীর মা দশমবর্ষীয়া বালিকা। সবে মাত্র জগন্নাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। তখনও বালিকা শ্বশুর-গৃহে পদার্পণ করে নাই। সেই বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রী আজ বিধবা, অনাথিনী কন্যাসহ বৃদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মকর্ম্মানুরক্ত বৃদ্ধ কাশীবাসে সুস্থ শরীরে ও মনের সুখে কাল যাপন করিতেছেন। মধ্যম শিবনাথের পত্নী এক পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত। আর শিবনাথ পুত্র ও কন্যা দুটীকে সংসারে স্থায়ী করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তদীয় একমাত্র পুত্র রাধানাথ পিতা ও পিতৃব্যের সুনাম রক্ষা করিতেছেন। শিবনাথের এই বিধবা কন্যা ভুবনেশ্বরীর একমাত্র কন্যা মালতী এক্ষণে সেই পিতৃবংশের আর এক প্রশাখা। সুতরাং ২।৪ দিন যাইতে না যাইতে মালতীর সহিত বৃদ্ধের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল। বৃদ্ধ নাতিনীকে 'রাঙাদিদি' বলিয়া ডাকিতে

লাগিলেন, মালতীও বিবিধ বিড়ম্বনার মধ্যে এই মধুরপ্রকৃতি দাদা-মশাইটীকে পাইয়া পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধের পূজার আয়োজন, আহারের স্থান, আঁচমনে জল ও খড়িকা দান ইত্যাদি প্রিয় কার্য্যের ভার নাতিনীর উপর ন্যস্ত হইল। বৃদ্ধ আহারের পর আঁচাইতে আঁচাইতে রাঙাদিদির সহিত নানাবিধ গল্প আরম্ভ করেন। কাশী পৌঁছানর পঞ্চদশ দিবসের মধ্যাহ্নের আহারান্তে, আঁচমনের সময়ে, বৃদ্ধ রাঙাদিদিকে বলিলেন, "দেখ্ তোর মুখখানি ঠিক তোর ছোট দিদিমার মতই হইয়াছে, তবে তোর দিদিমার চাইতে তোর রংটার একটু বাহার বেশী, তা তুই সেই আবার ঘুরে আসিস্‌নি তো? তোকে দেখে আমার কিছু লোভও হ'য়েছে, দেখ্ এখনও ঠিক করে বল্, তা হ'লে আর কোথাও বর খুঁজি না।" মালতী বড় হয়েছে, লজ্জায় মস্তক নত করিল, বৃদ্ধের বিদ্রূপে এবং বিবাহের ব্যবস্থায় মালতীর মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। সহসা চিত্তরঞ্জন তাহার চিত্ত অধিকার করিল। মনের উত্তেজনা মুখে ফুটিয়া উঠিল। মুখরা মালতীর মধুবর্ষণে গৃহ প্রাতঃসন্ধ্যা সমান মুখরিত, সেই মালতী নীরব। বৃদ্ধ নাতিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন—সে সলজ্জ সুন্দর মুখ শতগুণে সুন্দর হইয়াছে, সে হরিতাভকণ্ঠধৃত মুখকমল তাঁহার গৃহলক্ষ্মীর প্রিয় বাসস্থানই বটে,—তখন বৃদ্ধ ভ্রাতুস্পুত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভুবন, তোমার এ মেয়ের বর পাওয়া ভার, একে ত আর যাকে তাকে দিতে পার্‌বো না।" দুঃখিনী জননী অবসাদমিশ্রিত আনন্দাশ্রু মোচন করিয়া বলিলেন, "কাকা, যাকে দিলে ভাল হয়, তাকেই দিও।"

বৃদ্ধ নাতিনীর চিবুক ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "রাঙাদিদি, বলি কথা কওনা যে, আমি তোমাকে কারুকে দিচ্ছি না। ঘরের গিন্নী ক'রে রাখ্‌বো, কি বল?" মালতী তবুও কিছু বলিল না দেখিয়া, বৃদ্ধ বলিলেন, "ভুবন, তোমার মেয়ে বিয়ের কথায় বোবা হয়ে গেল।"

ভু। না কাকা না, বাগে পাচ্চে না, তাই চুপ ক'রে আছে, দেখনা বাগে পেলেই ছোবল দেবে।

মা। তোমাকে কবে ছোবল দিয়েছি?

ভু। কাকা ঐ দেখ, বলেছি ত।

বৃ। কেন, আমি কি মন্দ বর? একটু বয়স বেশী, আর সাম্নের দাঁত দু'টা পড়েছে, তা তেমনি অনেক টাকা আছে।

মা। আমার টাকার দরকার নেই। আমার মা আছে।

বৃ। তোর মা ত আমার শ্বাশুড়ী হয়। না হয় জিজ্ঞাসা কর।

মা। জামাই বুঝি শ্বাশুড়ীর নাম ধরে ডাকে?

বৃদ্ধ পরাজয় মানিয়া বলিলেন, "না বাপু, আমি এমন কুঁদুলে ক'নে চাই না। আচ্ছা থাক্, এম্নি বর জোটাবো যে টেরটী পাবে।" মালতীর মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কাকা, একে আমার এক মেয়ে, তাতে আবার মাথাপাগ্লা, তার উপর আবার তুমি ভয় দেখাইতেছ, তা হলে ত আর বিয়ে কর্‌তেই চা'বে না।" বৃদ্ধ বলিলেন, না করে ত আমারই লাভ, ঘরে ঘরে মালা বদল করে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিব।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় সুখের অপরাহ্ন সন্ধ্যায় পরিণত হইল। মালতীর মা মালতীকে আহার করাইয়া শয়ন করাইলেন। তাহার পর পার্শ্বের ঘরে হরিনাথের আহারের আয়োজনে গিয়া কন্যার বিবাহ বিষয়ক বিবরণ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত জানাইলেন। তখন হরিনাথ বুঝিতে পারিলেন, মধ্যাহ্নে বিবাহের বিদ্রূপে, মুখরা মালতীর মধুমিষ্ট অধর-ওষ্ঠ কেন লৌহ-চুম্বকের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল, কেন তাহার অলক্তাভ কপোল-দ্বয়ের রাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কেন তাহার কুন্তলকান্তির প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ সক্ষম ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়াছিল। বৃদ্ধ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পিতৃবংশ লোপ পায় পাইবে, তথাপি সেই বালক ব্রাহ্মণ

হইলে, তাহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও নাতিনীর ভার অর্পণ করিবেন না। আর ভ্রমক্রমেও বিবাহ বিষয়ক কথার উত্থাপন করিবেন না।

জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য দীর্ঘকাল দেব-সেবকের কার্য্য করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কৃপণ হইলে, প্রচুর অর্থের সঞ্চয় করিতে পারিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী উভয়েই মুক্তহস্ত ছিলেন। আর্ত্তের অর্থকষ্ট দূর করা, পীড়িতের সেবা করা ইত্যাদি কার্য্যে অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন, শেষে মালতীমালাকে পাইয়া অবধি একটু ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছিল। মালতীর মা যে টাকা কড়ি ও অলঙ্কারগুলি আনিয়াছিলেন, সেগুলি আজ পিতৃব্যের নিকট ধরিয়া দিয়া বলিলেন, "তিনি এইগুলি আনিয়া তোমার হাতে দিতে বলিয়াছিলেন।" বলিতে বলিতে মালতীর মায়ের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। হরিনাথ নিরুত্তরে বহুক্ষণ অশ্রুবর্ষণ করিয়া বহুবার অশ্রুমোচন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মা! এখন বুঝিলাম, তুমি কিরূপ লোকের হাতে পড়েছিলে। আহা! এমন লোক এত অল্প বয়সে মারা গেল, আর একবার দেখা হ'লো না! শেষ বার যখন বাবাজীর সঙ্গে দেখা হয়, তখনই বুঝেছিলুম, আমার উপর তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি। মা! তুমি কেঁদ না, ভেবোও না, তোমার মেয়েটা তাহারই পুণ্য-ফলে সুরক্ষিত হইবে। আমি আর তাহার বিবাহের নাম মুখে আনিব না। মালতীর মা বলিলেন, "কাকা, সে ছেলেটাকে কি আর পাওয়া যাবে?" হরিনাথ বলিলেন, "একবার সন্ধান করিব, কিন্তু আমার বোধ হয় আর পাওয়া যাবে না। পাবার হ'লে এতদিন পাওয়া যাইত। আর পেলেই বা কি হবে? তাহার পরিচয় না পাইলে ত আর তাকে মেয়ে দেওয়া হবে না, তখন ও আশা ত্যাগ করাই শ্রেয়।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কুমারনাথের গৃহে

কুমারনাথের পত্নী সৌদামিনী আহারান্তে বিশ্রামের মানসে শয়ন করিয়া নিদ্রাদেবীর অর্চ্চনা করিতেছেন। সুষুপ্তিক্রোড়ে শায়িতা সৌদামিনী দুঃস্বপ্নের তাড়নায় শিহরিয়া উঠিলেন। যেন এক যোগী-বেশধারী ভীমমূর্ত্তি পুরুষ বলপূর্ব্বক তাঁহার সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। সৌদামিনী নিদ্রাবেশে উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর কি কর, বিনাপরাধে আমার সর্ব্বনাশ কর কেন?" রমণীর কাতর কণ্ঠস্বর-সঙ্কেতে যোগীবর যেন সৌদামিনীর দিকে তাকাইয়া ততোধিক কাতর স্বরে বলিলেন, "না, ইহা তোমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।" সৌদামিনী সভয়ে নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখেন, চক্ষের জলে তাঁহার বাম কপোল ও গণ্ড সিক্ত হইয়াছে—অপরাহ্ণের ম্লান রবি-কিরণে প্রাঙ্গন ও উদ্যান, তৎপরে পল্লী ও প্রান্তর স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সৌদামিনী শক্তিহীন হৃদয়ে সুন্দর সংসারে যখন উঠিয়া বসিলেন, কুমারনাথ তখন হতভাগিনী মোক্ষদাকে বক্ষে লইয়া প্রবাসগৃহে পদার্পণ করিলেন। সৌদামিনী স্বামীকে বিষণ্নমুখে বিপন্না রমণীকে লইয়া আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে, আর এমন অবস্থাই বা কেন? শুষ্কতালু স্বামী বলিলেন, "মৃগিরোগ"। তখন সরলা স্বামীসোহাগিনী সৌদামিনীও সমাগতার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। দিবানিদ্রার বিবরণ তখন তাঁহাকে ত্যাগ করিল। বহু পরিশ্রম ও পরি-চর্য্যায় মোক্ষদার চৈতন্যোদয় হইল। চেতনার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া মোক্ষদা বলিল, "আমাকে রক্ষা কর।" কুমারনাথ বলিলেন, "ভয় কি,

আমিই তোমাকে রক্ষা করিব।” মোক্ষদা কুমারনাথের কণ্ঠস্বর শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল, আকুলদৃষ্টিতে যেন কাহারও দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “পামরে হরণ করে।” অনতিদূরে অন্তরালে প্রতিধ্বনি হইল,—“সজ্জনে রাখিবে তোরে।” উৎকণ্ঠাপীড়িত কুমারনাথ ভয়ে বিহ্বল হইয়া বসিয়া পড়িলেন। সংজ্ঞাশূন্যাবস্থায় স্বামীর শয়নের আয়োজন দেখিয়া সৌদামিনী মোক্ষদাকে ত্যাগ করিয়া স্বামীর পরিচর্য্যাতে বিব্রত হইলেন। এই কোলাহলে কিরণকুমার ও মানকুমারী জাগরিত হইল। পিতৃদেবের ভূশয্যায় শয়ন ও জননীর ব্যস্ততায় ভীত হইয়া বালকবালিকা ঠান্‌দিদির উদ্দেশ্যে ছুটিল। ঠান্‌দিদি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থের বাটীতে বসিয়া শ্রীক্ষেত্রের গল্প করিতেছিলেন, বালকবালিকার সক্রন্দন আহ্বানে ছুটিয়া আসিলেন। গৃহে আসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের শয়ন ও বধূমাতার ব্যস্ততায় ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে ?” কাতরা বধূমাতা অশ্রু মোচন করিয়া বলিলেন, “আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। কোথা হইতে এক মৃগির রোগী লইয়া হাজির ; সেটা কি বলে তাও বুঝি না, উনি কি বলেন তাও বুঝি না। আবার দূরে মাঠে কে ঐ মেয়েটার কথার উত্তরে কি বলিতেছে তাও বুঝি না।”

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পুরাতন পত্রে

ফাল্গুনের শেষ। শিবরাত্রির উপবাসের অপরাহ্নে, মালতীমালা জননীর বাক্সটী পরিষ্কার করিতেছে। এমন সময় একখানি পুরাতন জীর্ণ কাগজের অন্তরালে নিপতিত একখানি পত্রের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িবা মাত্র কে যেন মালতীমালাকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিল; কে যেন বলিয়া দিল, ঐ পত্র তোমার, উহাতে তোমার শ্রেয় ও প্রেয় উভয় সংবাদই আছে। তখন মালতীর স্মরণ হইল, পিতার পীড়ার সময়ে ডাকযোগে যে পত্রখানি আসিয়াছিল, এ সেই পত্র। সেই পত্রখানি এতকাল ধরিয়া সমানে তাহার মায়ের বাক্সের মধ্যে উপেক্ষিত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। এ পত্রখানি নিশ্চয়ই চিত্ত দাদার। ইহাতে চিত্ত দাদার সংবাদ আছে, এ কথা ভাবিতে মালতীর মানস-সরোবর উথলিয়া উঠিল। মালতীর দীর্ঘ বিরহ ও বিষাদজাত আক্ষেপে হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দন ঘনীভূত হইয়া তাহাকে অভিভূত করিল। সে শৈশবে ও বাল্যে একাকিনী দুই হস্ত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া, পিতা মাতাকে স্পর্শ করিয়া, সাদরগৌরব-ভরে কতশতবার বলিয়াছে, “একা মায়ের ঝি, গরব কর্ব্বো না ত কি ?” আজ তাহার সেই দলিত ‘গরবের’ ভবনে সে ভিখারিণীর ন্যায় বাস করিতেছে, তাহার একাধিপত্যের অক্ষুণ্ণ ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন পদার্পণ করিয়া, তাহার সকলই চূর্ণ করিয়া গিয়াছে, তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া গিয়াছে। মালতী এখন আপনার একাধিপত্যের সিংহাসনে আপনার হৃদয়াসন বিস্তৃত করিয়া চিত্তরঞ্জনকে বসাইবার জন্য নিশিদিন করজোড়ে অপেক্ষা

করিতেছে। তাই আজ পত্রখানিতে চিত্তরঞ্জনের সংবাদ সম্ভাবনা কল্পনায় তাহার বিষাদভারাক্রান্ত হৃদয় একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

মালতীর মনের অবস্থা এমন হইয়াছে যে, সে সাহস করিয়া তাহার মাকে ডাকিতে পারিতেছে না, মুখ ফুটিয়া পত্রখানির কথা বলিতেও পারিতেছে না। মনে মনে ভয় হইয়াছে, যদি পত্রখানি চিত্ত দাদার না হয়, দাদা মহাশয় পত্র পড়িয়া যদি বলেন, এ পত্র অন্য লোকের; যে পত্রখানি হাতে করিয়া আমি এত তৃপ্তি অনুভব করিতেছি, তাহা যদি তাহার না হয়, তাহা হইলে আমি ত মরিব। অসহ্য নিরাশার ভয়ে, মালতী কম্পিত হস্তে পত্রখানি লইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে এবং হৃদয়ের আবেগে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে নেত্রপাত করিতেছে, এমন সময় তাহার মা আসিয়া বলিলেন, "মালা! মা কি কচ্চিস জননীর কণ্ঠস্বরে মালতীর হস্তস্থিত পত্রখানি জননীর সম্মুখেই গৃহতলে নিপতিত হইল। জননী কন্যার অবস্থা ও হস্ত হইতে পত্র পতন সন্দর্শন করিয়া বলিলেন, মা!. এ কার চিঠি?" মালতী নিরুত্তরে দণ্ডায়মানা; গৃহিণী গৃহতল হইতে পত্রখানা উঠাইয়া লইলেন। বাক্স ও পত্রখানি একত্র দেখিয়া তাঁহার স্মরণ হইল যে, কর্ত্তার পীড়ার সময় এ চিঠি আসিয়াছিল, এবং গোলমালে ইহা বাক্সের মধ্যেই পড়িয়াছিল। গৃহিণী পত্র লইয়া বৃদ্ধের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কাকা দেখ ত, এ পত্র কার, তাঁর ব্যায়রামের সময়ে, (বলিতে বলিতে অশ্রুজলে গৃহিণীর নেত্রপ্রান্ত সিক্ত হইল) এই চিঠিখানা আসে, সে গোলমালের সময় কেহ এ পত্র খুলেও নাই পড়েও নাই।" বৃদ্ধ পত্রখানি খুলিয়াই সর্ব্বাগ্রে স্বাক্ষর পাঠ করিয়া বলিলেন, "চিত্তরঞ্জন।" মালতীর আকুল শ্রবণে দেববাঞ্ছিত সুধার ধারা বর্ষিত হইল।

মানুষ কি কখন ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা সত্যসত্যই সুধার ধারা পান করিতে পারে? কবিকল্পনায় অধর ওষ্ঠ কখন কখন সুধা পান করে বটে, দর্শনে এবং তদপেক্ষাও দূরে—শ্রবণে সুধার দ্বারা কিরূপে পান করিবে?

কিন্তু বিজ্ঞানবিরোধী হইলেও মালতী আজ শ্রবণে সুধা পান করিতেছে, সে আজ সুধাসেচিত কলেবরে, ঊর্দ্ধনেত্রে কলের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া সংবাদ সুধা পান করিতে লাগিল। তাহার আপনার দেহকে দেবমন্দির বলিয়া মনে হইল। রসোচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হৃদয়ের লীলামৃতে তাহার চিত্ত-প্রাসাদ সিক্ত ও আমোদিত বলিয়া সে উপলব্ধি করিল, সে বুঝিল তাহার প্রীতিপুষ্পভারে নমিত হৃদয় আজ চিত্তরঞ্জনের চরণতলে লুটাপুটি খাইতেছে; মালতী আজ অন্তরাত্মার প্রিয় প্রণোদনে আপনার আকুল প্রাণটী আপনি হাতে লইয়া চিত্তের হাতে তুলিয়া দিতে দিতে যেন বলিতেছে, "আর আমি তোমাকে—আমি তোমার—আমি—আমি তোমার দাসী—তোমাব—তোমার সেবিকা। তুমিই এ জীবনের সর্ব্বস্বধন।" এমন সময় জননী আসিয়া মালতীর দিবা-স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন,—"মালা! মা! কি বল্‌ছিস?" মালতী চমকিত চিত্তে জননীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। জননী বলিলেন, "ছেলেটার খবর এসে এতদিন ঘরে প'ড়ে র'য়েছে! কেউ জান্‌তে পারিনি, এত দিন জান্‌তে পার্‌লে ত তাকে একবার আনাতে পারতুম্। তোর দাদামশাই আজই রাত্তিরে চিঠি লিখিয়া রাখ্‌বেন। তাকে একবার আস্‌তে চিঠি লেখা হবে।" মালতী এই সংবাদে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া আপনাতে আপনি মিশাইয়া যাইতেছে, এমন সময় বৃদ্ধ সেখানে আসিয়া বলিলেন, "ছোট গিন্নী, এইবার তোমার বরের খবর আস্‌বে।" মালতী মাকে জড়াইয়া ধরিয়া মায়ের বক্ষে মুখ লুকাইয়া সুখ দুঃখের মিলনজাত তরঙ্গতুফানে জননীর উত্তপ্ত হৃদয় শীতল করিতে লাগিল।

শিব-শিরবাসিনী মন্দাকিনীর স্নিগ্ধ মধুর ধারা বিরহের যমুনা-প্রবাহকে আলিঙ্গন করিল। ঘনশ্যাম মেঘের ক্রোড়ে বিজলীবালার লীলা সন্দর্শনে বৃদ্ধ হরিনাথের স্থির গম্ভীর হৃদয়-সরে আনন্দের তরঙ্গতুফান উত্থিত হইল। তিনি স্নেহভরে নাতিনীর মৃণালবক্রগ্রীবাধৃত মুখকমল উত্তোলন

পূর্ব্বক প্রীতিপ্রফুল্ল দৃষ্টিতে সে মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এইবার বুঝি ফুল ফুট্‌লো!" মালতী আনন্দবিস্ফারিত, লাজ ভরে লুক্কায়িত মুখখানি বলপূর্ব্বক জননীর নিরাপদ বক্ষে রক্ষা করিয়া অনুচ্চ বদ্ধ স্বরে বলিল, "মা দেখ না!" বৃদ্ধ বলিলেন, "কাল রাত্তিরে তোর মার সঙ্গে পরামর্শ কচ্ছিলুম, কাশীর একটা গুণ্ডা ধরে তারই হাতে তোকে দিব, তা তাতে আবার কয়েক দিন বাধা পড়্‌লো। রাঙ্গাদিদি, তুমি যে দুরন্ত! তোমার স্যাঙাৎ কি তোমাকে চালাতে পার্‌বে? দুরন্ত লোক না হ'লে, তোমাকে শাসনে রাখ্‌তে পারবে না।" মালতী দৈবাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া ফেলিল, "হ্যাঁ পার্‌বে, তুমি যাও।" বৃদ্ধ হাসিয়া আটখানা হইয়া বলিলেন, "তুই তবে স্বয়ম্বরা হবি? আমাদের আনা বরের গলায় মালা দিবি না, কেমন?" মালতী পুনরপি কপট কোপভরে বলিয়া ফেলিল, "না, দেব না"।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভু ও ভৃত্যে

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, চিত্তরঞ্জন আসামের সুম্‌না চা বাগানে চাক্‌রী করিতেছে। কর্ম্মকাজে পরিতুষ্ট সাহেব চিত্তরঞ্জনকে পুত্রাধিক স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং অনুরাগী ও উপযুক্ত সহকারী পাইয়া চা বাগানের সকল কাজ সুন্দররূপে শিখাইতেছেন।

এই দুই বৎসরে চিত্তরঞ্জন বেতনের অনেকাংশ সাহেবের উপদেশে সঞ্চিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। সুস্থভাবে, সুখে ও আনন্দে এ দুই বৎসর কাটিলেও দু'টী কারণে চিত্তরঞ্জনের মনে শান্তির স্রোতঃ অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত থাকিত না। পঞ্চানন সামান্য কর্ম্মক্ষেত্রের ঈর্ষা-পরিচালিত হইয়া তাহার প্রাণনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এটা যখন সে ভাবে, তখন তাহার মনের অশান্তির সীমা থাকে না। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য মানুষ এরূপ অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, চিত্তরঞ্জন ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। পঞ্চাননের এরূপ অন্যায়ানুষ্ঠানের মূলে আর কোন গূঢ় অভিপ্রায় থাকিতে পারে, চিত্তরঞ্জন তাহাও সন্দেহ করে না। গূঢ় অভিপ্রায়ের কারণও অনুসন্ধান করিয়া পায় না। পঞ্চানন কেন এরূপ অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হইয়া আপনার পার্থিব ও পারত্রিক অমঙ্গল আনয়ন করিল, ইহাই তাহার দুঃখের কারণ। অনেক সময় তাহার ইচ্ছা হয়, পঞ্চানন যদি রাগ দ্বেষ ভুলিয়া একটীবার ভালবাসার আলিঙ্গন-পাশে চিত্তরঞ্জনকে আবদ্ধ করে, তাহা হইলে সাহেবকে বলিয়া, তাহার চাকুরিটী বজায় রাখে, আর তাহার ভাবী-বিপদেরও শান্তিসমাধানে

প্রয়াস পায়। সরলমতি ও উদারহৃদয় প্রতিপক্ষ এই ভাবে পঞ্চাননের পাপানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি করিতে ব্যাকুল।

চিত্তরঞ্জনের দ্বিতীয় ও প্রধান অশান্তির কারণ মালতীমালা। মালতী কাশীর কোথায় কি অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে, তাহার জীবনের পরিণাম কিরূপ দাঁড়াইল, সে বড় হইয়াছে, তাহার অবশ্যই বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কেমন লোকের সহিত বিবাহ হইল, সে ব্যক্তি মালতীর প্রকৃতি বুঝিয়া তাহাকে ভাল বাসিতে ও যত্ন করিতে পারিবে কি না,—এই চিন্তা সর্ব্বদাই তাহার মনে বিকট উৎকণ্ঠার উদয় করে। একদিকে মালতীর এরূপ পরিণামের কল্পনা, সঙ্গে সঙ্গে মালতীকে পাইবার আশা লোপ, চিত্তরঞ্জনকে সময়ে সময়ে অধীর করিয়া তুলে। যখন এরূপ হয়, তখন তাহার ইচ্ছা হয়, সে কর্ম্মকাজ ত্যাগ করিয়া কাশীবাসিনী মালতীর সংবাদ লইতে যাত্রা করে; সেখানে তাহাকে না পাইলে, দেশে দেশে তাহারই সন্ধানে জীবন যাপন করে।

চিত্তরঞ্জনের মানসিক চঞ্চলতা যখন তাহার সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে, তখন আর সে প্রকৃতিস্থ থাকে না। উন্মাদের ন্যায় সর্ব্ব কর্ম্ম-বিরহিত হইয়া একাকী নির্জ্জনে অবস্থান করে, সময়ে সময়ে একাকী বসিয়া অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া দেয়। একদিন শীত কালের রাত্রি শেষে নিদ্রাভঙ্গে মালতীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় তন্দ্রার আবির্ভাব হইল। তন্দ্রাযোগে চিত্তরঞ্জন স্বপ্ন দেখিল, সে কাশী আসিয়াছে, অনুসন্ধান করিতে করিতে মালতীদের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছে। উপস্থিত হইয়া শুনিল, মালতীর মা অতি কাতর স্বরে বিনয় বচনে বৃদ্ধ পিতৃব্যকে বলিতেছেন, "কাকা! আর ত চলে না, একটী সৎপাত্র দেখিয়া মেয়ের বিবাহ দাও।" সেই বৃদ্ধের কল্পিত মূর্ত্তিও চিত্তরঞ্জনের তন্দ্রাক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হইল। সুম্‌নার চা বাগানে বাসাবাটীর গৃহে শয়ন করিয়া চিত্তরঞ্জন শুনিতেছে, বারাণসীর বাঙ্গালীটোলায় একখানি

বাটীর ত্রিতল গৃহে উপবিষ্ট বৃদ্ধ তাঁহার ভ্রাতৃকন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ভুবন! মা, পাত্র ত একটী একটী করিয়া দশটী দেখিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু সকলেই বলে মেয়েটী তোমাদের নহে! এই এক সন্দেহের জন্য কন্যা পাত্রস্থ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; তবে এখানকার একশ্রেণীর অজ্ঞাতকুলশীল, না বাঙ্গালী না হিন্দুস্থানীগোছ এক সম্প্রদায় আছে, তাহাদের পরিচয় ইত্যাদিতে অনেক গোলযোগ আছে, ইহাদের কাহাকেও নির্ব্বাচন করিলে এখনই এ কার্য্য সমাধা হয়। তা, মা! জগন্নাথের মেয়েটীকে এমন ভাবে কুলশীলহীন পরিচয়বিমুখ ও হীনবৃত্তির লোকের হাতে কেমন করিয়া দিব?" মালতীর মা বলিলেন, "কাকা, ইহাদের মধ্যে কি মোটের উপর পছন্দসই ছেলে পাওয়া যায় না?" বৃদ্ধ বলিলেন, "না মা, সেরূপ ছেলে পাওয়া দুষ্কর, তবুও একবার সন্ধান করিব।"

বেল সাহেব, প্রাতঃকালে চিত্তরঞ্জনকে না দেখিয়া, তাহার বাসায় আসিয়া দেখেন চিত্তরঞ্জন তখনও ঘুমাইতেছে, সাহেব কিছু বিস্মিত হইয়া চিত্তরঞ্জনকে ডাকিলেন। বেল সাহেবের ডাকে চিত্তরঞ্জনের নিদ্রাভঙ্গ হইল, গাত্রোত্থান করিয়া দেখে স্বর্ণ বর্ণ রৌদ্রে চারিদিক হাসিতেছে, কুলিরা কাজে লাগিয়াছে। চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া সাহেবের সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল, "মধ্য রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে বহুক্ষণ নানা চিন্তায় অতিবাহিত হওয়ার পর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই এরূপ হইয়াছে। আপনি অগ্রসর হউন, আমি ত্বরায় আপনার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইতেছি।" সাহেব "Come sharp (১) বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তন্দ্রাযোগে পরিদৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে এক মুহূর্ত্ত সময় দিবার অবসর ঘটিল না। চিত্তরঞ্জন তৎক্ষণাৎ প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে

(১) ত্বরায় এস।

করিতে সাহেবের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। সাহেব চিত্তরঞ্জনের ম্রিয়মাণ মুখমণ্ডলে, মেঘের কোলে দামিনী-লীলার ন্যায় আলোক-আঁধারের প্রতিযোগিতা, আশা-নিরাশার পরস্পরে আলিঙ্গন সন্দর্শন করিয়া বলিলেন, টোমার কি হো'য়েছে ?"

চি। বিশেষ কিছুই না।

সা। কিছু অবশ্যই হইয়া ঠাকিবে।

চি। তবে ঠাওরান্ দেখি।

সা। টুমি লুকাইটেছ।

চিত্তরঞ্জন, আকাশ প্রান্তস্থ অতি ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের অন্তরালস্থিত বিদ্যুৎ কণার ঈষৎ অঙ্গভঙ্গির ন্যায়, ইঙ্গিতে অনুভূত, কণামাত্রে পরিণত, হাস্য-রেখায় অধরওষ্ঠ অলঙ্কৃত করিয়া বলিল, "তবে আপনি বুঝেছেন ?"

সা। টুমি বাঙ্গালী, হামি সাহেব, হামি বড়, টুমি boy (বালক), কেমন করিয়া টোমার মনের কঠা বুঝিব ?

চি। আমার যদি কিছু হ'য়ে থাকে, তবে সে আমার জন্মদিন হইতে —সেই অশুভ মুহূর্ত্ত হইতেই আমি হতভাগ্য জীব।

সা। It is a riddle. (১)

চি। আপনার পক্ষে ত হবেই, আমারই পক্ষে এটা অতি কঠিন সমস্যা।

সা। টুমি কি বলিটেছ ?

চি। আমি কে তা আমি জানি না, আমার অতীত জীবন ও ভবিষ্যৎ দুই ঘন অন্ধকারে সমান আচ্ছন্ন।

সা। Yes, it is a hard lot, (২) লেকিন্ হামিওট হামার বাপ মাইকো আউর হামারা early life কো (শৈশব কালের) কুছ নেহি

(১) এ এক সমস্যা।

(২) হাঁ, এটা দুর্ভাগ্য বটে।

জান্‌তা হায়। হামারা futureবি, (ভবিষ্যৎ) তোমারা মাফিক্ হায়। But why shall I break down under the pressure ? I will make the best use of my time and rise up (১)

চিত্তরঞ্জন বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে নীরবে ক্ষণকাল সাহেবের মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া বলিল, "আপনিও আমার মত।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "ঠোড়া ফারাক্ হায়। টুমি এখনও ছেলে মানুষ, টোমারা আগু পিছু পূরা আঁধার হায়, but though mine is equally dark, I can perceive through it a ray of hope to get over the difficulty and secure the hand of my heart's angel, whose last affectionate touch—whose kind parting words—whose deep sighs from across the seas, all combined, have kept me up, and like a magic wand imparting strength and attention to success (২)

এই কয়টী কথা বলিতে বলিতে সাহেব দেখিতে পাইলেন যে, চিত্তরঞ্জনের নবীন কান্তিপূর্ণ মুখখানি নত, মলিন ও বিষাদভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। সাহেব বলিলেন, "Boy, are you a suffer like me ?" (৩) চিত্তরঞ্জনের নয়ন প্রান্তে অশ্রুবিন্দু মিলিত হইতেছে। বালক বহু যত্নে

(১) কিন্তু এর চাপে ভাঙ্গিয়া পড়িব কেন? সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া জীবনে অগ্রসর হ'বো।

(২) যদিও আমার জীবনের আঁধার তোমারই মত—কিন্তু সে ঘন অন্ধকারের ভিতরেও আশার আলোক রেখা দেখিয়া মনে হয় এ বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া আমার হৃদয়-দেবতাকে লাভ করিব। যাহার শেষ পাণিপীড়ন, যাহার শেষ বচনামৃত, যাহার অনন্ত পারাবার-প্রেরিত গভীর দীর্ঘশ্বাস মিলিত হইয়া আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং যাদুযষ্টির ন্যায় আমার হৃদয়ে শক্তি বৃদ্ধি ও কর্ম্মে উৎসাহ বিধান করিতেছে।

(৩) যুবক! তুমিও আমার মত দুঃখী?

হৃদয়ের ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইল। বেল সাহেব অগ্রসর হইয়া সস্নেহে বালকের চিবুক ধারণ করিতে না করিতে চিত্তরঞ্জনের নেত্রপ্রান্তস্থ অশ্রুকণা প্রবাহে পরিণত হইল। চিত্তরঞ্জন বিংশবর্ষীয় যুবক, তাহার প্রশস্ত ও উদার হৃদয় মালতীমালায় জড়িত, তাহারই সৌরভভারে সে নিত্য সুখী। সেই নিত্য সুখের আশা দিন দিন দূরে গিয়া পড়িতেছে, ভাবিয়া চিত্তরঞ্জন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সাহেব সযত্নে ও স্নেহভরে বালককে ধরিয়া বলিলেন, "Why are you declining? Take heart", (১) চিত্তরঞ্জন বলিল, "মহাশয়, আমি ইহা অপেক্ষা শত গুণে কর্ম্মঠ পুরুষ হইতাম, কিন্তু আমার নিরাশাই আমাকে মারিয়া ফেলিল। আমার দুঃখ ও যন্ত্রণার পরিমাণ যেমন গভীর তেমনই অসীম।

সা। টার কি সাডি হ'য়ে গেছে?

চি। জানি না।

সা। তবে ভয় কি?

চি। সে ব্রাহ্মণের মেয়ে, কিন্তু আমি কি জাতি তা জানি না।

সা। Caste question! (জাতিভেদ) টার কে আছে?

চি। মা আছেন, আর এক মাতামহ আছেন।

সা। অনেক টাকা দিলেও হোবে না?

চি। এদেশে টাকায় ছোটলোকের হয়, কিন্তু ভদ্রলোক টাকায় জাত নষ্ট করে না।

সা। টুমি কুছু জান না। হামি টোমাকে ছুটি ডিব, টুমি টোমার ব্রাইডের (কনের) মায়ের সঙ্গে ডেখা কর, ডেখা করিয়া ব'ল্লো, যত টাকা চায়, বেল সাহেব ডিবে। The leaning of two good hearts towards each other, is the best

(১) অবসন্ন হয়ে প'ড়ো না, সাহসে ভর কর।

wealth, this naughty world can boast of. Then stait for the prize. (১)

চিত্তরঞ্জন সাহেবের ব্যবহারে নত মস্তকে অশ্রু বর্ষণ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

ছায়া দর্শনে

"মোক্ষদা আমাকে পরিত্যাগ করিল?" একদিন আহারান্তে বৈদ্যনাথ শয়নকক্ষে আপনার শয্যাতে শয়ন করিতে করিতে এই কয়টী কথা আপনা আপনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন। কোন একটা বিষয়ে মানুষ সহসা কিছু ভাবে না, আবার ভাবনার উদয় হইলে, এক কথায় তাহা ফুরায় না। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, চিন্তার সূত্রপাত ও শেষ আছে, কিন্তু তাহার সহসা অভ্যুদয় ও বিলোপ সাধন হয় না। আর এই ব্রহ্মাণ্ড-পারাবারে প্রত্যেক ক্রিয়ার, প্রত্যেক চিন্তার চিহ্ন থাকিয়া যায়।

বৈদ্যনাথ আপনার বাসা বাটীর নির্জ্জন অন্তঃপুরে দ্বিপ্রহরে আহারান্তে মোক্ষদার হস্তে বহু বহু বার সমাদর সম্ভোগ করিয়াছেন। সংক্ষুব্ধ সাগরসঞ্জাত ক্ষীণ ও কোমলকলেবর ফেণপুঞ্জ যখন বেলামূলে পুঞ্জীকৃত হয়, তখন তাহার ক্ষণস্থায়িত্ব নির্দ্দেশ করা সহজ, মানবনয়ন সমীপে তাহার ক্ষণস্থায়ী প্রীতিকর দৃশ্য ভিন্ন তাহাতে আর কি থাকে, যাহা ভবিষ্যৎ অঙ্ক

(১) দুটী সাধু হৃদয়ের পরস্পর মিলিবার আকাঙ্ক্ষা এই দুর্বৃত্ত সংসারের অহঙ্কার করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। তবে এ পুরস্কারের জন্য যাত্রা কর।

নির্দ্দেশে সহায়তা করিতে পারে? কিন্তু প্রবল প্রভঞ্জনের ভ্রূকুটী ও বৈশ্বানরের রুদ্র দৃষ্টি যখন সেই ফেণাগ্রভাগের বিলোপ সাধনে পরাজিত হয়, তখন সেই মিলিত অমর বুদ্‌বুদদল পাষাণ সদৃশ দৃঢ় দেহ লাভ করিয়া দেশ দেশান্তরে পরিগৃহীত ও বিবিধ কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া থাকে।

মোক্ষদার কৃতজ্ঞতাজাত সমাদর ও স্নেহ মমতার চিহ্ন সকলও বৈদ্যনাথের প্রবৃত্তির বেলাভূমিতে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সংসারে কয়জন লোক জীবনের এই বুদ্‌বুদ্‌স্তূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করে? তাহাদের মধ্যে কয়জনই বা আবার দেখার মত দেখিয়া থাকে? সংসারে এমন কয়জন আছে, যাহারা অতীত জীবনের বেলাভূমিতে সঞ্চিত বুদ্‌বুদ্‌স্তূপে সতৃষ্ণ—সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিতে এবং তাহা হইতে ভবিষ্যৎ জীবনের উপকরণ সংগ্রহ কবিতে ব্যস্ত? সে কোন্ ব্যক্তি, যে, জীবনের এই পুঞ্জীকৃত পরিত্যক্ত জঞ্জালরাশির মধ্যে জীবনের কড়া ক্রান্তি, আনা গণ্ডা, সিকি ও দুয়ানী, টাকা ও মোহর ইত্যাদির সন্ধান লয়, কাহার এত মাথা ব্যথা যে, জীবন-পারাবার-পুলিনে সঞ্চিত বালিরাশির মধ্যে হীরকখণ্ড তুল্য মহামূল্য রত্ন সংগ্রহে বদ্ধপরিকর? সংসারে এমন লোক অতি বিরল; এই অতি বিরল জনসংখ্যার মধ্যে বৈদ্যনাথের স্থান কোথায়? বৈদ্যনাথ এই অসংখ্য কোটী জলবুদ্‌বুদ্‌প্রায় ক্ষীণজীবী প্রাণীকুলের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া ইতর জীবন যাপন করিতেছেন।

একদা এই ইতর জীবনে বৈদ্যনাথ মধ্যাহ্নে আহারান্তে শয়নকক্ষে শয্যায় শয়ন করিতে গিয়া বালক ভৃত্য মদনমোহনের হাতে তাম্বুল গ্রহণ করিতে করিতে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, যেন অদূরে ম্রিয়মানা মোক্ষদার মলিন মূর্ত্তি। ভয়চকিত দৃষ্টিতে বৈদ্যনাথ সেই কল্পিত মূর্ত্তি পানে তাকাইয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিবে?" মদন কম্পিত হৃদয়ে পানের ডিবা রাখিয়া সন্ত্রাসিত পাদবিক্ষেপে পলায়ন করিল,

সে বুঝিল, বাবু পাগল হইয়াছেন। চূড়ামণি পুত্রের নিকট এই সংবাদ অবগত হইয়া প্রভুর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া শুনিল, বৈদ্যনাথ একাকী নির্জ্জন গৃহে শূন্য সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন, "তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলেও, আমি তোমাকে ভুলি নাই, তোমাকে ভুলিব না, তোমাকে ছাড়িব না। মোক্ষদা! আসিয়াছ, ব'সো। আমি আর তোমাকে কিছুই বলিব না; তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিও না, আমার নিকটে আসিও না, আমার প্রতি এই দীর্ঘকাল যে স্নেহ মমতা দেখাইয়াছ, তাহাও দেখাইও না, এসেছ, ব'সো, নিকটে নহে, দূরে ব'সো, এসেছ, যেওনা—থাক! তুমি নীরব প্রতিমূর্ত্তির ন্যায়, প্রাণহীন পুতুলের ন্যায়, আমার ঘরে থাক, আমি তোমাকে দেখিয়া, তোমার আশে পাশে ঘুরিয়া, ইঙ্গিতে বুঝিয়া তোমার অভাব সকল পূরণ করিয়া ধন্য হই; আর আমার—আমার—আমার নানা উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থগুলির সদ্ব্যবহার করি। আমি অনেক কষ্টে তোমাকে রোগমুক্ত করিয়াছিলাম, আমি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া তোমার চিকিৎসা করাইয়া ছিলাম। চিকিৎসা করাইতে করাইতে, তোমার শরীর মনের স্বাভাবিক ভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইতে, তোমার মধুর মূর্ত্তি, তোমার সরল স্বভাব ও কৃতজ্ঞতা আমাকে ক্রয় করিয়াছিল। হ্যাঁ, তাই ত বটে, সেই যে একদিন বন জঙ্গল খুঁজিয়া খুঁজিয়া তোমার ঔষধের অনুপান লইয়া আসিয়া, কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত দেহে ও ক্লান্ত মনে, তোমার শয্যা পার্শ্বে গিয়া বসিতে না বসিতে, তুমি বলিয়াছিলে, "আপনার এ অসীম দয়ার ঋণ চিরদিন স্বীকার করা ভিন্ন আমার আর কি গতি আছে?" আমি তোমার সেই রোগক্লিষ্ট মুখে কৃতজ্ঞতাজাত পবিত্র শোভা দেখিয়া, মুগ্ধ মনে আত্মবিক্রয় করিয়া বলিয়াছিলাম "তোমার জন্যে সবই করিতে পারি।" তাই আজ মনে হইতেছে, তোমার জন্য ক্লেশ স্বীকার ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিতাম, এখন মনে হয়, তাহার পরে কি কঠিন তপস্যা করিয়া তবে তোমার প্রসন্ন

দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলাম। আজ ভাবিয়া দেখ দেখি, কি ভাবে আত্মবিক্রয় করিয়া তবে তোমার দয়া-দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলাম। আমার অসাধ্য সাধনার ফল তুমি! আজ সেই তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে! আজ বল ত আমি কি নিয়ে থাকি? কার জন্য থাকি? কেন থাকি? পাগলিনি! তুমি আমাকেও পাগল করিবে? হাঁ,—তোমার জন্য পাগল হইয়া পথে বসিয়া থাকিব, সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিব, তাহাও ভাল, তবুও তোমাকে ত্যাগ করিতে—তোমাকে ভুলিতে পারিব না। তুমিই আমার ধ্যান জ্ঞান। পাষাণি! তুমি দেবী হইয়া আমার প্রাণ-মন্দিরে প্রকাশিত হও। শয়নে স্বপনে, সজনে নির্জ্জনে তোমারই পূজা করিব।"

চূড়ামণি যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেইখানেই রহিল, তাহার আর এক পা অগ্রসর হইবার সাহস হইল না। চতুর চূড়ামণি আজ ভগ্নচূড়ার ন্যায় বৈদ্যনাথের শয়ন-কক্ষদ্বারে বসিয়া পড়িল। বৈদ্যনাথ অতি আর্ত্তভাবে আবার বলিতে লাগিলেন "আমার সাধনা ও সাধনায় সিদ্ধি লাভের কি এই পরিণাম হইল? আমি বুঝেছি বুঝেছি, আমি তোমাকে টাকা কড়ি, সোণা দানা, বসন ভূষণ দিয়া ক্রয় করিয়াছিলাম, আজ তোমাকে দেখিয়া বুঝিতেছি, এ সকলে মানুষ মানুষকে ক্রয় করিতে পারে না। মানুষ কিনিতে আর কিছু চাই, আর কি চাই, তা ত আমি জানি না?"

এইবার চূড়ামণি এই অজ্ঞতার সূত্র ধরিয়া প্রভুর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আজ তিন দিন হইল আপনি না বলিয়াছিলেন, 'যাক আমি আর মোক্ষদার বিষয় ভাবিব না। যাহাকে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া রাখিতে পারিলেন না, তাহার কথা আবার কেন ভাবিতেছেন? লোকে কথায় বলে, 'যা নেই ভাণ্ডে, তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে,' আর কি চাই? যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে যখন হয় নাই, তখন ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু নাই যা দিয়ে তাকে ভুলাইবেন।" চূড়ামণির আবির্ভাবে মোক্ষদা-মূর্ত্তি বৈদ্যনাথের দৃষ্টি-

পথের বহির্ভূত হইয়া পড়িল। বৈদ্যনাথ ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়া চূড়ামণির পানে তাকাইয়া বলিলেন, "পামর! তুই কি করিলি? আমার শূন্য হৃদয়ের মহাশূন্যতা বাড়াইয়া দিলি, তুই এখন কেন আসিলি? তোকে কে ডাকিল?"

চূড়ামণি এই দীর্ঘকালে প্রভুর নিকট এরূপ উক্তি ও এরূপ ব্যবহার কখনও প্রাপ্ত হয় নাই। প্রভুর এরূপ চিত্তবিপর্য্যয়ও কখন দেখে নাই, সুতরাং চূড়ামণি নীরবে ও নত মস্তকে গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল। বৈদ্যনাথ শূন্যদৃষ্টিতে চূড়ামণির বহির্গমন দেখিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

অতিথির আগমনে

দিনমণি অস্তাচলগত হইয়াছেন। সন্ধ্যাবন্দনা ও দেবার্চ্চনার সুস্বরে নানা গৃহের শঙ্খঘণ্টা ও রাজবাটীর নহবতের সঙ্গতমাধুরি মিলিত হইয়া ক্ষণকালের জন্য কৃষ্ণনগর দেবনগরে পরিণত হইল। পথিকগণ কেহ বা পান্থশালা কেহ বা গৃহস্থের আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে তৎপর। এমন সময়ে মোক্ষদার "মধুসূদন" খড়িয়াতীরে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক কুমারনাথের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। কুমারনাথ তখন শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। শয্যাশায়িতা মোক্ষদা তখনও সংজ্ঞাশূন্য; কুমারনাথ ও তাঁহার স্ত্রী দুই জনে মোক্ষদার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতেছেন।

বহির্দ্বারে অতিথির আগমনসংবাদ অবগত হইয়া কুমারনাথ ত্বরায়

দ্বারে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বপরিচিত পথিকের নয়নপথে পতিত হইলেন। যাঁহার স্পর্শমাত্রে তিনি কীটকুঞ্চিত ও তীব্র দৃষ্টিতে হতবল হইয়া শকটে শয়ান ছিলেন, আবার সেই ভীম মূর্ত্তির আবির্ভাব! শুষ্কতালু কুমারনাথ মৃতবৎ দণ্ডায়মান। অতিথি, "তোমার মঙ্গল হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে না করিতে কুমারনাথ প্রাণ পাইলেন। তিনি ত্রস্ত ও বিব্রত হইয়া পড়িতেছেন, দেখিয়া অতিথি বলিলেন, "বাবা! তোমার চিন্তা নাই, শান্ত হও, আমরা কাহারও অনিষ্ট করি না। তোমারও অনিষ্ট করিব না। দুর্ব্বল মানুষ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যখন দারুণ অন্যায় অনুষ্ঠানে রত হয়, তখন নিকটে থাকিলে, আমরা তাহা নিবারণ করিয়া থাকি।"

"তুমি শিক্ষিত পুরুষ হইয়া এরূপ কাপুরুষের ন্যায় ঘৃণিত পথের পথিক হইতেছিলে, ইহাই তোমার মহাপাপ। তুমি পথে এই অরক্ষিতা কন্যাটীর রক্ষক ও বন্ধু, কোথায় তাহার মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবে, না তুমিই তাহাকে অসহায় অবস্থায় পাইয়া তাহার সম্ভ্রমনাশে উদ্যত! বৎস! আমি তোমার আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া তোমার প্রতি সে সময়ে যে তীব্র কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, তাহারই প্রতিবিধানে আসিয়াছি। আমার অন্য প্রয়োজন অবান্তর মাত্র। আমি অদ্য এখানে রজনী যাপন করিব না। ক্ষণকাল আমার নিকট অপেক্ষা কর। তাহার পর স্বস্থানে প্রস্থান করিও। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আমি কর্ম্মান্তরে গমন করিব। প্রাতঃকালে আর কেহ আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না।"

"আমার মর্ম্মান্তিক ও তীব্র কঠোর দৃষ্টিপাতে তুমি পুরুষশক্তিহীন হইয়াছ। কত দিন এরূপ অবস্থায় কাল যাপন করিতে হইবে, তাহাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।"—এই কথা শুনিয়া কুমারনাথের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কম্পিত কলেবরে ও সাশ্রুনয়নে অতিথির চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন। তখন অতিথি বলিলেন, "বৎস! এ

বিশ্বসংসার নিয়মাধীন, কোন কার্য্যই বিনা নিয়মে ঘটে না। প্রকৃতি এই নিয়মতন্ত্রের অধীন হইয়াই 'মায়া' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে মায়া পাত্রদোষে তোমাকে ঐ কন্যার আততায়ীরূপে উপস্থিত করিয়াছেন, সেই মায়াই আবার আমাকে উহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি তোমার নরাধমত্বে কোপদৃষ্টি করায় তোমার পশুশক্তি লোপ পাইয়াছে।"

কুমারনাথ কাতরকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "ঠাকুর! পশুশক্তি যাহা তাহার লোপ হওয়াই ভাল। এখন বলুন, আমি কেমন করিয়া দেবানুগ্রহ লাভ করিব।"

অ। তোমাব পরম সৌভাগ্য।

কু। কোন্‌টা?

অ। মায়া একই মুহূর্ত্তে দুই কার্য্য সাধন করিয়াছেন।

কু। কই? আমি ত সব শূন্য ও অন্ধকার দেখিতেছি, আমার দেহ মন ও আত্মা সকলই জড়বৎ বোধ হইতেছে।

অ। এখন কিছু দিন এই জড়ত্বে বাস কর।

কু। তার পর?

অ। তার পর আজকার মত আবার মায়ার দয়া হবে।

কু। কবে?

অ। নিশ্চয়তা নাই। আপাততঃ তুমি ঐ কন্যাটীর নিকট গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে বল "তোমার মধুসূদন" আসিয়াছেন।

কুমারনাথ আজ্ঞাধীন ভৃত্যের ন্যায় উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "আপনার পদার্পণে আমার পাপক্ষয় ও অপরাধের মার্জ্জনা হইবে না? এই দীর্ঘ অনিশ্চয়তার মধ্যে উৎকণ্ঠায় জীবন যাপন করাই আমার প্রায়শ্চিত্ত?"

অ। লঘু পাপে গুরু দণ্ড অন্যায়, আমার বিবেচনায় গুরুপাপে

লঘুদণ্ড তদপেক্ষা অনেক গুণে অন্যায়। আমি এরূপ অন্যায় অনুষ্ঠানের সহায় হইতে পারি না। তোমার কর্ম্মফল তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে। এখন না করিলে পরে করিতে হইবে।

কুমারনাথ অতিথির অনুগ্রহদৃষ্টির আশাটুকু বক্ষে লইয়া মোক্ষদার নিকট উপস্থিত হইলেন। মোক্ষদার এই সংজ্ঞাশূন্য শয়নের অবস্থাও কুমারনাথের চক্ষে অপূর্ব্ব চিত্র বলিয়া মনে হইল। কুমারনাথের মনে হইল, 'কর্ম্মফল' পরে ভোগ করিলে ক্ষতি কি? সংসারের অসামান্য ধনের লোভ পরিত্যাগ করিয়া এত শীঘ্র জীবনের পথে কর্ম্মফলের অর্গল দিয়া শূন্য হৃদয়ে এ আঁধার সংসার-কারাগারে বসিয়া কি লাভ? এ কঠোর শাসনের অধীন হইয়া আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন কি? মোক্ষদাকে দেখিতে দেখিতে মনে হইল, কমলার চরণশোভন ফুল্লকমলিনীর এই অপূর্ব্ব রূপমাধুরীর কোরকছবি কখন কোথাও দেখিয়াছেন, যেন কোন পরিচিত কমলকোরক আজ শতদলে শোভিত হইয়া তাঁহার গৃহতল উজ্জ্বল করিয়াছে, তাই তিনি, মনে মনে পণ করিলেন,—"এ রত্ন সহজে ত্যাগ করিব না, এতে আমার ভাগ্যে যাহা হইবার হইবে!" সতৃষ্ণ ও পলকশূন্য দৃষ্টিতে কুমারনাথ মোক্ষদার পানে তাকাইয়া সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতে করিতে আত্মহারা হইয়াছেন। গৃহিণী আসিয়া কুমারনাথের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন, "সত্যই তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। তাঁহার সুখের সংসারে শনি প্রবেশ করিয়াছে!" সৌদামিনী স্বামীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "ওর চাইতে তোমার রোগই বেশী-প্রবল দেখিতেছি, আগে তোমার চিকিৎসা করাও।" কুমারনাথ গৃহিণীর কথার উত্তরে বলিলেন, "ওর এই উন্মাদ রোগের উপশম হইলেই আমার ভাবনার ভার কমিয়া যাইবে। ইহাকে এখানে আনা ভাল হয় নাই। বাড়ীতে বেশ ছিল; এখন কি করিব?" সৌদামিনী বলিলেন, "ভাল চাও ত ত্বরায় বিদায় কর, তা না হ'লে তোমার সোণার

সংসার ছারে খারে যাবে।" কুমারনাথ "ত্বরায় বিদায় করিব" বলিয়া মোক্ষদার নিকটস্থ হইয়া তাহার কাণের কাছে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমার মধুসূদন আসিয়াছেন।" মোক্ষদা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া তীব্র স্বরে বলিল, "নরাধম! কাপুরুষ! আমাকে বিদ্রূপ করিতেছ? দর্পহারী মধুসূদন অবশ্যই তোমার দর্প চূর্ণ করিবেন।" কুমারনাথ তীব্রভাবে তিরস্কৃত হইয়াও পুনরায় বলিলেল, "না—না, বিদ্রূপ নহে, সত্যই তোমার মধুসূদন আসিয়াছেন।" মোক্ষদা বলিল, "তবে দেখাও।"

কুমারনাথ বাহির বাটীতে গিয়া সকল কথা ঠিক ঠিক বলিলে পর, সন্ন্যাসী গাত্রোত্থান করিয়া কুমারনাথের সঙ্গে গৃহপ্রবেশ করিলেন। গৃহপ্রবেশ করিবামাত্র সৌদামিনীর স্বপ্নে দৃষ্ট ব্যক্তির সহিত সন্ন্যাসীর সাদৃশ্য স্মরণ করিয়া সৌদামিনী গলবস্ত্রে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতে করিতে বলিলেন, "ঠাকুর আমাকে রক্ষা করুন। আমার অপরাধ কি?" তখন সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মি! লোকে কথায় বলে, 'সৎসঙ্গে কাশীবাস অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।' আমি তোমার 'সর্ব্বনাশ' নিবারণ করিতেই আসিয়াছি; কিন্তু তাহা সময়-সাপেক্ষ। এখনই হইবে না, বিলম্ব হইবে।" এই বলিয়া তিনি মোক্ষদার শয্যাপার্শ্বে অগ্রসর হইতেছেন, মোক্ষদা সে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া চকিত ও ভীত হইল ও চক্ষু মেলিয়া সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইতে পারিল না। তাহার ভাগ্যে সন্ন্যাসীর দর্শনলাভ ঘটিল না। সন্ন্যাসী নিকটস্থ হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন এবং অপর সকলকেই সেখান হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। সকলেই যাইতেছেন, কুমারনাথের ইচ্ছা সেখানে উপস্থিত থাকেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস! তোমাকেও যাইতে হইবে, কেহই এখানে থাকিবে না। এই অসহায়া নারী 'আপাততঃ তোমার গৃহে বলিয়া, যদি তুমি বলপূর্ব্বক এখানে অপেক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে আমি এখনই গৃহত্যাগ করিব।" সৌদামিনী অগ্রসর হইয়া বলপূর্ব্বক

স্বামীর হাত ধরিয়া কক্ষের বাহিরে লইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী সর্ব্বাগ্রে মোক্ষদাকে বলিলেন, "তুমি চক্ষু চাহিয়া আমাকে দেখ।"

মো। আমি তাকাইতে পারিতেছি না। আমার মনে হইতেছে, যেন আমার চোখ্ জোড়া লাগিয়া গিয়াছে।

স। আমি তোমার চক্ষু খুলিয়া দিব?

মো। আপনি আমার নিকটে আসিয়া বসিয়াছেন বলিয়া আমার খুব আনন্দ হইতেছে, চোখ্ খুলিলে আমার এ সুখের ব্যাঘাত হবে না ত?

স। সে কথা আমি জানি না। তুমি আমাকে দেখ্‌বে?

মো। যদি এ আনন্দ ও শান্তির অন্তরায় হয়, তবে চাই না। তার চেয়ে এ ভাল।

স। তথাস্তু। তুমি যেমন আছ তেমনি থাক। তুমি কি চাও?

মো। উদ্ধার।

স। কিসের উদ্ধার?

মো। আপনি কি সত্যই আমার মধুসূদন?

স। না মা, আমি তোমার মধুসূদনের প্রতিনিধি।

মো। আমি আমার দীর্ঘজীবনে পুড়িয়া পুড়িয়া খাক্ হইতেছি, আমার প্রাণটা যেন রাবণের চিতার স্থায় জ্বলিতেছে, কোনও দিন নিভিবে বলিয়া মনে হয় না। আমার জ্বালা জুড়াইতে চাই।

স। মা! সেটা এক দিনে এক কথায় হবে না, সময় চাই।

মো। এখন কি কর্ত্তে হবে, বলুন!

তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা! আমি এখনই চলিয়া যাইব। আমরা অনেকক্ষণ লোকালয়ে থাকি না। লোকের প্রয়োজন হইলে আসিয়া থাকি। তুমি আজ বিপদে পড়িয়া যখন মধুসূদনকে স্মরণ করিয়াছিলে, তখন আমি নানা কারণে নিকটে ছিলাম। তোমাকে বিপন্ন দেখিয়া রক্ষা করিয়াছি। এখন তোমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি,

তোমার শান্তি ও আনন্দ স্থায়ী হউক এবং তুমি নির্ব্বিঘ্নে তোমার প্রার্থিত সঙ্গ লাভ কর।

মো। কবে কোথায় লাভ হইবে, আমাকে বলিয়া যান্।

স। সে কথা আমার বলিবার অধিকার নাই। আর আমি বলিলে তোমার তপস্যার উত্তম ফল লাভ হইবে না। সেগুলি তোমার নিজের হৃদয় মনের আগ্রহের গাঢ়তায় আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিবে,—আমি তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমি পূর্ব্বেই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি যেন তোমার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ ফল ত্বরায় ফলে। তুমি ত্বরায় কি চাও?

মো। পিতৃদর্শন।

সন্ন্যাসী "তথাস্তু" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ত্বরায় বাহির বাটীতে উপস্থিত হইয়া কুমারনাথকে বলিলেন,—আমি এখনই চলিলাম। আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিব না। তুমি ত্বরায় এই কন্যাকে কাশীধামে ইহার পিতার নিকট পোঁছাইয়া দাও। বিলম্বে তোমার অমঙ্গল ঘটিবে। তুমি আর ঐ নারীর উপর কোন প্রকার অত্যাচারের চেষ্টা করিও না। তোমার সকল ইতর বাসনা ত্যাগ কর। ঐ নারী সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, উহার অনিষ্ট সাধন তোমার শক্তির অতীত। ফলে নিজের অমঙ্গলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিও না। এই আমার শেষ উপদেশ।

কুমারনাথ প্রণাম করিতে না করিতে সন্ন্যাসী অদৃশ্য হইলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

সুপ্রভাতে

আজ সত্য সত্যই চিত্তরঞ্জনের সুপ্রভাত। যে দিন বেল সাহেব বলিয়াছিলেন, "Then start for the prize,"(১) ঠিক তাহার পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের চাপ্‌রাসী চিত্তরঞ্জনের হাতে একখানি ডাকের চিঠি দিল। পত্রখানির উপর বেনারসের মোহর দেখিয়া চিত্তরঞ্জনের রুদ্ধ হৃদয়ের আনন্দের বেগ অপরিমেয় হইয়া পড়িল! দীর্ঘকাল ধরিয়া সে বলপূর্ব্বক যে হৃদয়কে শাসনে রাখিয়াছিল, আজ সে হৃদয় সকল শাসনমুক্ত হইয়া আনন্দের প্রবাহে ভাসিল। কোটালের জোয়ারে সমুদ্র উথলিয়া উঠিলে, যেমন ছোটবড় নদী নালা পূর্ণ হইয়া যায়, জলস্রোত চারিদিকে ছুটাছুটি করে, আজ চিত্তরঞ্জনের উদ্বেলিত হৃদয়ের সুখসমারোহ সেইরূপ তাহার সমগ্র দেহ মনে অননুভূতপূর্ব্ব সুধা সেচন করিতে লাগিল। কবি-কল্পনায় বা ভাবুকের ভাষায় সে নির্ম্মল প্রীতিপ্রবাহ চিত্রিত হইবার নহে। সে অবস্থা কেবল ভোগের বস্তু, বুঝাইবার জিনিস নহে। চিত্তরঞ্জন ক্ষণকাল এই মধুময় সুধাসিঞ্চিত হইয়া অবশ হস্তে পত্রখানি ধরিয়া আছে, এমন সময়ে বেল সাহেব কাজে বাহির হইয়া চিত্তরঞ্জনের অনুসন্ধানে আসিতেছেন। দূর হইতে সাহেবকে দেখিয়া চিত্তরঞ্জন ত্বরায় বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া সাহেবের সঙ্গে যাইতে উদ্যত। সাহেবকে সে অভিব করিতে না করিতে সাহেব বলিলেন,—"There is a great flush. what is it?" (২)

---

(১) তবে পুরস্কারের জন্য যাত্রা কর।

(২) ভয়ানক উত্তেজনা, ব্যাপার কি?

চি। Flush, where ? (১)

সা। Over your whole body, and in the cheeks in particular, you can't hide it. (২)

চি। "It is Benares, sir" (৩)

সা। Any news from Benares ? (৪)

চি। Yes, sir. (৫)

সা। What news ? I hope it is a good news. (৬)

চি। I have not read it yet. (৭)

সা। And yet, you have got flushed ? (৮)

চি। I am afraid of opening it. (৯)

সা। Why ? (১০)

চি। It may contain a bad news. (১১)

(১) উত্তেজনা, কোথায় ?

(২) তোমার সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষ ভাবে তোমার গণ্ডে, লুকাইবার উপায় নাই।

(৩) মহাশয়, কাশীর ব্যাপার।

(৪) কাশী হইতে কোন সংবাদ আসিয়াছে ?

(৫) হাঁ, মহাশয়।

(৬) সংবাদ কি ? আশা করি ভাল খবর।

(৭) আমি এখনও পড়ি নাই।

(৮) না পড়িয়াই এত উত্তেজনা ?

(৯) পত্র খুলিতে আমার ভয় হইতেছে।

(১০) কেন ?

(১১) মন্দ খবর ত হইতে পারে।

সা। That can't be, it has come of itself. It is not of your own seeking. Where is it ? With you ? (১)

চি। Yes, sir (২)

সা। Open and read it, and say what they say. (৩)

পত্রখানি বাহির করিয়া খুলিবার সময়ে চিত্তরঞ্জনের মনের নূতন উত্তেজনা বশত তাহার হাতের আঙ্গুলগুলি নাচিতেছে দেখিয়া সাহেব বলিলেন, O! Extreme emotions, control it, and go on reading aloud, I shall understand. (৪)

পত্রপাঠ !

পরমকল্যাণবরেষু—

বারাকপুরের কালীবাড়ীর দেবসেবক জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য আমার ভ্রাতৃজামাতা! তাঁহার লোকান্তর গমনের পর তদীয় পত্নী কন্যাসহ এখানে আমার আশ্রয়ে বাস করিতেছেন। আমি ঐ কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করিতেছি। সুবিধামত পাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তুমি অজ্ঞাতকুলশীল হইয়াও জগন্নাথের গৃহে চারি পাঁচ বৎসর পুত্রসম্মানে ও স্নেহযত্নে লালিত পালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহের পরিজনবর্গের সকলের, বিশেষভাবে জগন্নাথের কন্যার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। তাহার পর দীর্ঘকাল অনবধানতা বশতঃ উপেক্ষিত একখানি পত্র সংপ্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে ও তাহা পাঠান্তে বুঝা যাইতেছে, যে ঐ ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতি তোমারও

(১) তা কখনই নয়, এ অযাচিত সংবাদ অবশ্যই ভাল হইবে। সে পত্র কোথায়, তোমার কাছে আছে ?

(২) হাঁ, মহাশয়।

(৩) খুলে পড়, আর আমাকে বল তাহারা কি ব'লেছে।

(৪) আ! ভয়ানক উত্তেজনা, সাম্‌লাও, সামুলে চেঁচিয়ে পড়ে যাও, আমি বুঝতে পারবো।

একটা গভীর প্রাণের টান বর্ত্তমান। তাহাই যদি ঠিক হয়, আর তোমার পরিচয় ইত্যাদির কোন কিনারা করিতে পার, তাহা হইলে ত্বরায় একবার এখানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। তোমার না আসা পর্য্যন্ত, অথবা তোমার কোন সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব হয় আসিবে, না হয় সংবাদ দিবে। মালতী পনের বছর পার হইয়া ষোল বছরে পড়িয়াছে। অধিক বিলম্ব করিতে পারিব না। সত্বর যাহা হয় একটা স্থির করিতে হইবে। অত্রপত্রে আমার এবং মালতীর মায়ের আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি তারিখ:—......
সন ১২৭১ সাল।

ঠিকানা
মুরারি পণ্ডিতের বাটী,
বাঙ্গালী টোলা,—বেনারস।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীহরিনাথ শর্ম্মা।

পত্রপাঠ শ্রবণ করিয়া সাহেব করুণাপূর্ণ স্নেহদৃষ্টিতে যুবকের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—Did I not tell you yesterday, 'then start for the prize.' She is yours, you will have her and be happy. When do you mean to start, boy? (১)

চিত্তরঞ্জন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ গদ্গদ ভাবে মস্তক নত করিয়া বলিল, "আপনি আমাকে যখনই ছুটি দিবেন, তখনই যাইব।" সাহেব বলিলেন, ডরকার হ'লে হামি টোমাকে আজই ছুটি ডিব। টুমি আজই যাবে। চিত্তরঞ্জন নিরুত্তরে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

সা। Go and make your arrangements then. You are off duty. (২)

(১) কাল আমি বলি নাই 'তবে এ পুরস্কারের জন্য যাত্রা কর।' সে তোমারই হবে, আর তুমি সুখী হবে। কবে যেতে চাও?
(২) তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, যাও, তোমার যাবার ব্যবস্থা করগে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

জীবনের নূতন সমস্যায়

শূন্য গৃহে বৈদ্যনাথের জীবন ধারণ একবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। স্থিরবুদ্ধি, গূঢ়মতি ও মন্থরগতি বৈদ্যনাথ দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে ভাবী সমস্যাপূর্ণ জীবনপটের পরিবর্ত্তন করিতেছেন। হৃদয়ের অশান্তি নিবারণের জন্য এক এক করিয়া বহু উপায় উদ্ভাবন করিলেন, কিন্তু কোনটীই স্থায়ী ভাবে তাঁহার মনের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছে না। এ বয়সে বিবাহ করিয়া নূতন ভাবে সংসারধর্ম্মে প্রবেশ করিবেন কি না, এ প্রশ্ন একবারেই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। বৈদ্যনাথ পিতার একমাত্র পুত্র। পিতার বংশরক্ষার জন্য, জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখে সংসারধর্ম্মে যাপন করিবার আগ্রহ তিলমাত্রও অনুভব করেন না। দীর্ঘকাল উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করিয়া শেষ কয়েক বৎসর মোক্ষদার রূপজ মোহ তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছিল। কালক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে মোহের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। যেমন ছিল, তেমন ভাবে মোক্ষদাকে আর পাইবেন না, তাহা বেশ বুঝিয়াছেন, কিন্তু সে স্মৃতি হৃদয়পট হইতে মুছিয়া ফেলা বৈদ্যনাথের সাধ্যাতীত। মোক্ষদা বৈদ্যনাথের সাধনার ধন। মোক্ষদা যেমন অসামান্যা সুন্দরী তেমনি মোক্ষদা বঙ্গদেশীয় অসামান্য মর্য্যাদাশালী গৃহস্থের কন্যা এবং ততোধিক সম্মানিত গৃহের কুলবধূ। বিপাক-বিঘ্নে মোক্ষদা পথের ভিখারিণী—পাগলিনীর বেশে দেশে দেশে ঘুরিয়াছে। তাহাকে ইতর ভাবে বশে আনিতে বৈদ্যনাথকে দীর্ঘ চারি পাঁচ বৎসর মোক্ষদার অর্চ্চনা করিতে হইয়াছিল। অনেক সাধু প্রকৃতির মানবসন্তান সেরূপ সাধনার ফলে উচ্চ ধর্ম্মের

অধিকারী হইয়া মর্ত্ত্যজগতের শাসন অতিক্রম করিয়া ধন্য হইতে পারেন। বৈদ্যনাথের সে চেষ্টাও তপস্যার মধ্যে গণ্য, কারণ জগতে সমগ্র হৃদয় মন সমর্পণ করিয়া যে যাহা চায়, বিধাতা তাহার সেই কাম্য বস্তু তাহাকে দিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

দেখ না? লোক ধনের তপস্যা করিয়া ধন লাভ করে, সংসার-সুখের তপস্যা করিয়া লোক তাহাই লাভ করে, বিদ্যা ও জ্ঞানের তপস্যা করিয়া লোক জগতে সুধীসমাজের শিরোভূষণ হইয়া কৃতার্থ হয়। জগৎজয়ী বীর নেপোলিয়ান সামান্য গৃহের সন্তান হইয়া সাধনবলে সমগ্র ইউরোপের জনমণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, আর অসামান্য প্রতিভাবলে সমগ্র ধরাকে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন করিতে চাহিয়াছিলেন। শাক্য-মুনি, যিশু, মহম্মদ ও গৌরচন্দ্র জীবন উপেক্ষা করিয়া তপস্যাবলে এই মর্ত্ত্য জগতেই অক্ষয় অনন্ত অমৃতের আস্বাদন লাভ করিয়া নিজেরা ধন্য হইয়াছেন, আবার কোটী কোটী নরনারীকে তপস্যার পথ দেখাইয়া কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। এই অসীম বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত সেই অক্ষয় কল্পতরুমূলে তপস্যায় বসিয়া যিনি যাহা সাধন করিয়াছেন তিনি ঠিক তাহাই লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বৈদ্যনাথের তপস্যার ফলে সৌদামিনী লাভ হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ যে ভাবে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই লাভ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তপস্যার মহাকেন্দ্র, যোগীশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণেরও ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় আত্মবলির পরিবর্ত্তে ভগিনী সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যুকে বলি দিতে হইয়াছিল। যখন দেখিলেন বলি না দিলে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, তখন মহাসমাধিতে আবিষ্ট যোগীশ্রেষ্ঠের ন্যায় নির্লিপ্ত হৃদয়ে বালক অভিমন্যুর বিনাশ সংঘটনের সমাধান করিয়াছিলেন। বৈদ্যনাথের যে বলির প্রয়োজন, সে বলি তাঁহার আত্মবলি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ইতর তপস্যার ফলভোগ শেষ হওয়া তাঁহার পরম সৌভাগ্য। আর ইহা তাঁহার কোন্ সুকৃতির শুভ-সূচনা তাহাও ঠিক বলা যায় না।

মোক্ষদাই বৈদ্যনাথের সাধনা, কিন্তু আর পূর্ব্বভাবে মোক্ষদাকে পাইবার উপায় নাই। মোক্ষদা কোন দিনই উৎকণ্ঠাশূন্য শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিবার সুযোগ পায় নাই। সে যে কয়দিন বৈদ্যনাথের বশীভূত ছিল, সে কয়দিন সে নিজ অন্তরাত্মার গোপন তিরস্কার অনুভব করিয়াছে। মোক্ষদারও আজ তপস্যার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং সাধুসঙ্গের সম্ভাবনা তাহার হৃদয়ে নূতন জীবনের সুরভীসম্ভোগ-সম্ভাবনা-সংবাদ আনয়ন করিতেছে। সে সেই সৌরভলোভে নূতন ভাবের পাগলিনী হইয়া দিন-যাপন করিতেছে। কিন্তু বৈদ্যনাথ বুঝিয়াছেন মোক্ষদাকে না পাইলে তাঁহার জীবন ধারণ বৃথা, মোক্ষদাবিহীন জীবন ধারণ অসম্ভব। মোক্ষদাকে না পাইলে, জীবন বিসর্জ্জন দিবেন স্থির করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ তদনুরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিতে মনোযোগী হইলেন। "এ 'জীবন বিসর্জ্জন' কেমন করিয়া দিব"—এই চিন্তা বৈদ্যনাথকে পাগল করিয়া তুলিল। "এত লোককে ক্লেশ দিয়া, এত লোকের উপর অত্যাচার করিয়া দীর্ঘ জীবনে এত অর্থ সঞ্চয় করিলাম, এ টাকা কাহাকে দিব ? কেন দিব ? এত কষ্টে অর্জ্জিত অর্থ চক্ষু মুদিয়া বিতরণ করিতে আমার হৃদয়ের মর্ম্ম-স্থানে ব্যথা লাগে। এ সমস্ত সম্পদ মোক্ষদাকে দিলেও যেন মনটা একটু শান্তি অনুভব করে। সে ত এ টাকা চায় না। সে ত বলিয়াছে, আমার টাকা তাহার 'অস্পৃশ্য'। আমার পাপময় জীবনের অর্জ্জিত মলিন অর্থে সে আর দৃক্‌পাতও করিবে না। আমার আর ত কেহ নাই, কাহাকে দিব ?

বৈদ্যনাথের বিষাদভরা হৃদয়ের মোহবন্ধনগুলি কেবল মাত্র বিষধর সর্পের ন্যায় ফণা বিস্তার করিয়া দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে। বৈদ্য-নাথের ভয় ও ভাবনার সূত্রপাত হইয়াছে, কিন্তু এখনও হৃদয়ে জ্বালা অনুভূত হয় নাই। বৈদ্যনাথ বুঝিলেন, এমন বিপদ ত মানুষের হয় না। এ অবসাদভরা নৈরাশ্য লইয়া তাঁহার আর এক মুহূর্ত্তও জীবন-

ধারণের ইচ্ছা নাই। বৈদ্যনাথ তখনই সেই নিরাশার অনন্ত পারাবারে আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত। কিন্তু সে শক্তিও যেন কেহ হরণ করিয়াছে, বৈদ্যনাথের মরণের শক্তিও নাই। কোন এক অননুভূত-পূর্ব্ব ভাব,—কোন এক অজ্ঞাত আশা আবছায়ার আকারে যেন এই অবসাদের অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছে। সেটা বস্তু কি না, বস্তু হইলে কি বস্তু হইতে পারে, তাহার দ্বারা জীবনের কোন কার্য্য হইবে কি না, কিছুই বুঝা যায় না। কেবল বুঝিতেছেন যে, তাহাই জীবনের পথে এক বৃহৎ অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে, মরণেও বাদ সাধিতেছে, কিন্তু পথ দেখিতে দেয় না, কর্ত্তব্য নিদ্ধারণেও সহায়তা করে না। সে স্তব্ধ গম্ভীর ভাব কি ভয়ঙ্কর! ক্রমশঃ বৈদ্যনাথ এক বৃহৎ অচল জড় পদার্থে পরিণত হইলেন। কাজকর্ম্ম বন্ধ হইল, ক্রমে স্নানাহার বন্ধ হইল।

এখন চূড়ামণি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক স্নান আহার করায়। প্রয়োজন-মত অর্থ চাহিবামাত্র পায়, যাহা কিছু প্রয়োজন, নিজে বুঝিয়া সেগুলি সব সমাধা করে, ঠিক স্থবির বৃদ্ধ পিতা মাতার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত পুত্রের ন্যায় চূড়ামণি আজ প্রভুর সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত। চূড়ামণি চতুর হইলেও, দুষ্ট ও ধড়িবাজ হইলেও, আজ অনুগত সেবকের ন্যায় এই দুর্দ্দিনে প্রভুর পরিচর্য্যায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

মোক্ষদার পরিচয়ে

কুমারনাথ পর দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে বাহির বাটীতে বসিয়া দু'চারিটী মক্কেলের সহিত কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত, এমন সময়ে খোকা আসিয়া বলিল, "বাবা, মা তোমাকে ডাকিতেছেন, একবার এস।" গৃহপ্রবেশ করিবামাত্র সৌদামিনী স্বামীকে বলিলেন, "তুমি একে কোথায় পেলে? এ যে আমাদের বড়বউ। আমার যে দাদা (জেঠামহাশয়ের ছেলে) তম্‌লুকে চাকৃরি কর্‌তেন, জলে ডুবে মারা যান—তাঁহারই স্ত্রী।"

কু। তাই বটে, উহাকে দেখে কাল আমার মনে হ'য়েছিল যেন কোথাও দেখেছি। মোক্ষদা স্বীকার করিল?

সৌ। না, সে স্বীকার করে না। সে বলে, মানুষের মত মানুষ কি হয় না? কাল আমার মনটা খুব খারাপ ছিল, আমি ভাল ক'রে দেখিনি, আজ সকালে দেখিবামাত্র আমি চিনিয়া ফেলিলাম; তাহাকে বলিলাম, সে অস্বীকার করিল, কিন্তু নিজের কোন নূতন পরিচয়ও দিল না, চুপ করিয়া রহিল। ওকে তুমি আজই বাসুদেবপুরে নিয়ে যাও, মা দেখ্‌লে চিন্‌তে পার্‌বেন, আর তা হ'লে সবটা জানা যাবে।

কু। সে যদি পরিচয় গোপন করে, তাহ'লে বাসুদেবপুরে যাবে কেন? যাবে না। আর ও মেয়েও বড় জেদাল।

সৌ। ও বড় ঘরের মেয়ে, আমাদের বাড়ীর বউ, তুমি ছোটলোকের মত ব্যবহার কর্‌তে গেছ, সে তোমাকে দুকথা শুনাইয়াছে, বেশ ক'রেছে।

এখন তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, ওকে আমার মায়ের কাছে দিয়ে এস। সেখানে ভাল থাকবে। ওকে এখানে রাখা হবে না।

কু। কাল সন্ন্যাসী ঠাকুর ওকে কাশীতে ওর বাপের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে বলিয়া গিয়াছেন। আমি এখন কার কথা রাখি, সন্ন্যাসীর না মহাগুরুর ?

সৌ। মহাগুরুকে ষাঁড়ের গোবরে দাঁড় কর্য়েছ! এখন রসিকতা রাখ। মায়ের কাছে নিয়ে গেলে জানা যেত, যে ও আমাদের বউ কি না। তবে সন্ন্যাসীর কথার অবাধ্য হওয়া ভাল হবে না।

কু। মোক্ষদা ত বিধবা, সম্পর্কে বাধে না, ওকে নিকে করে ফেলি না কেন, বেশ ননদ ভেজে সতিন সেজে একত্র সংসার কর।

সৌ। বলতে লজ্জা করে না? ভারি বীরপুরুষ! একজনের মন যোগাতে জান্ বেরিয়ে গেল, আবার দোসর খোঁজ! আমার কথা শোন, ওকে ত্বরায় বিদায় কর। না হ'লে এমন সোণার সংসার ছারেখারে যাবে। [illegible] ত আমার কথা শোন।

কুমারনাথ মোক্ষদার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোক্ষদা, কেমন আছ ?"

মো। আমি বেশ আছি, আপনি ত্বরায় সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথা মত আমাকে কাশীতে পৌঁছাইয়া দিন, আমার আর একতিল বিলম্ব সহ্য হইতেছে না। আমি এখনই যাইব। আপনি যাওয়ার ব্যবস্থা না করিলে, আমি একলাই পথে বাহির হইব। আপনার কথা দূরে থাক্, আপনার সাম্‌নে পড়াও আমার পক্ষে বিষের মত যন্ত্রণাদায়ক। যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক নারীর মর্য্যাদা হরণ করিতে উদ্যত হয়, তাহার মুখ দেখ্‌লেও পাপ হয়, তারা পশুরও অধম। পশুতেও এমন কর্ম্ম করে না, তাদেরও ধর্ম্মজ্ঞান আছে।

কু। আমার দোষ হয়েছে, ক্ষমা কর। আমি তোমাকে ত্বরায় কাশীতে পৌঁছাইয়া দিব।

মো। ত্বরায় টরায় হবে না, আজ এখনই ব্যবস্থা করা চাই।

কু। আমার কাজকর্ম্ম ফেলে এখনই যাওয়া কি সম্ভব? সব কাজের ব্যবস্থা ক'রে, টাকা যোগাড় ক'রে, বাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে তবে কাশী যাত্রা করিতে হইবে, এক কথায় কেমন করে হবে?

মো। আমাকে আন্‌লেন কেন? আমি ত আসিতে চাই নাই। অমন বাপ মায়ের এমন ছোটলোক ছেলে কেন হ'ল? আমি তাঁহাদের কাছে বেশ ছিলুম।

কু। আমি আজ হ্উক, কালই হ্উক, তোমাকে কাশীতে রাখিয়া আসিব। তুমি আমাকে আর গালি দিও না।

কুমারনাথের মানসিক বিকারের অবস্থা, লাঞ্ছনাভোগ, গাল খাওয়া ইত্যাদি ব্যাপার দেখিয়া সৌদামিনীর প্রাণটা ভাঙ্গিয়া গেল। পূর্ব্বদিনের অপরাহ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা দেখিয়া সৌদামিনী স্ত্রীজনসুলভ প্রাণে গভীর বেদনা অনুভব করিলেও, কতশতবার মোক্ষদার প্রতি আক্রোশের ভাব অনুভব করিতে গিয়া বাধা পাইয়াছেন,—মনে হইয়াছে, তাহার অপরাধ কি? স্বামী ত নিজবুদ্ধির দোষে নিজের লাঞ্ছনাভোগ ও অপমানের ভাগী। স্ত্রীলোক মন্দ হইলে যাহা করে, মোক্ষদার ব্যবহার ঠিক তাহার উল্টা, সুতরাং মোক্ষদা মন্দ লোক নহে। তাকে আমাদের বাড়ীর বউ বলিয়াই মনে হইতেছে। সে বিধবা, কতদিন ধরিয়া কোথায় কত অবস্থায় ঘুরিয়াছে তাহার ঠিক নাই, তবুও যখন নন্দাইয়ের হাতে পড়িয়া আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত, আর তাঁর হাতে নির্য্যাতনভোগের ভয়ে এতটা বিরক্ত, তখন নিশ্চয়ই সে ভাল মেয়ে। আমার বাবা একে ভ্রষ্টা মনে করিয়া, ইহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়া খুব অন্যায় কাজ

করিয়াছিলেন। বাবার কাজ ভাল হয় নাই। এখন করি কি? ওকে ঘরে রাখা নিরাপদ নহে। তাড়াইয়া দিতেও প্রাণে ক্লেশ হইতেছে।

আমার স্বামী আমার দেবতা। আমার দেবতার দোষ হইলেও তিনি আমার দেবতা। তাঁহার এমন সুখের সংসার থাকৃতে এমন দুর্ম্মতি কেন হইল বুঝিলাম না। যাক্, বুঝি আর নাই বুঝি, আমার সাদা প্রাণের সুখের আকাশে ছায়াপথের মত একটা স্থায়ী দাগ পড়িয়া গেল। যাক্, তাও সহ্য করিব, কিন্তু এখন কি করি? ভাবিয়া চিন্তিয়া সৌদামিনী স্বামীকে আবার ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমার কি টাকার অনটন আছে? কত টাকা খরচ হবে? যদি টান পড়ে তবে আমার গহনা বন্ধক দিয়া টাকা আনাইয়া আজই ওকে কাশীতে রেখে এসগে। বিলম্বের প্রয়োজন নাই।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সংগ্রামের পথে

চূড়ামণি চাকর—পুরাণ চাকর। পুরাণ চাকরে মনিবের ঠিক যেরূপ সেবা করিতে পারে, চূড়ামণি তাহাই করিতেছে। কবিরাজকে প্রভুর বর্ত্তমান চিত্তবিকারের লক্ষণগুলি বলায় তিনি একদিন আসিয়া বৈদ্য-নাথকে দেখিয়া গিয়াছেন, পরে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্নানের পূর্ব্বে চূড়ামণির পুত্র মদন, দুই ঘণ্টা কাল মাথায় ও গায়ে উত্তম করিয়া তেল. মাথায়। চূড়ামণি নিজের হাতে অনুপানাদি সংগ্রহ করিয়া

বৈশ্বনাথকে ঔষধ খাওয়াইতেছে। বৈশ্বনাথও অল্পে অল্পে উপস্থিত মানসিক উচ্ছৃঙ্খল অবস্থার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতেছেন, কিন্তু মোক্ষদার চিন্তা সমান ভাবে হৃদয়মন অধিকার করিয়া আছে। কেবল যে সকল আনুসঙ্গিক উপসর্গের আবির্ভাবে চিত্তবিপর্য্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল, সেইগুলি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতেছে।

এমন সময়ে একদিন সহসা বেলা আটটার সময়ে বৈশ্বনাথ দেখিলেন, এক বিংশতিবর্ষীয় যুবক পথ আলো করিয়া তাঁহার আবাসাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। বৈশ্বনাথের দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র চূড়ামণি চিনিতে পারিয়া সবিস্ময়ে প্রভুকে বলিল, "এই বাবু আপনার চা বাগানে প্রেরিত চিত্তরঞ্জন।" তখন বৈশ্বনাথ বিব্রত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কি ভাবে কথা কহিলে, কি ভাবে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলে, সকল দিক রক্ষা পাইবে, ভাবিয়া অন্ধকার দেখিলেন। চিত্তরঞ্জন নিকটস্থ হইয়া করজোড়ে নমস্কার করিবামাত্র চূড়ামণি বসিবার আসন দিয়া বলিল, "আপনি সুম্‌না চা-বাগান হইতে আসিতেছেন?"

চি। হ্যাঁ, আমি বেল সাহেবের নিকট হইতে আসিতেছি।

বৈ। কেন? বেল সাহেব কি আমাকে কিছু বলিতে বলিয়াছেন?

চি। আজ্ঞে না, আমি তিন মাসের বিদায় পাইয়া কাশী যাইতেছি, তাই যাইবার পথে একবার আপনার এই বাসার পরিচারিকাকে দেখিয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছি। আমার রোগের সময়ে তিনিই আমার প্রাণরক্ষায় প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহমমতাপূর্ণ শুশ্রূষার ঋণ কোন দিন পরিশোধ করিবার সুযোগ-সুবিধা হইবে কি না জানি না, তাই যাইবার সময় পথে একবার তাঁহাকে দেখিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি।

বৈশ্বনাথ নীরব স্তম্ভিত ভাবে উপবিষ্ট। চূড়ামণি বলিল, "তিনি এখানে নাই। কোথায় কেমন অবস্থায় আছেন তাহাও জানিবার

উপায় নাই। বেঁচে আছেন কি নাই, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না।”

চি। কেন? তিনি ত অনেকদিন এখানে ছিলেন! এমন কেন হইল?

চূ। এ সংবাদ আমরা বলিতে পারি না।

চি। এ ত কোন কাজের কথা হইল না। যিনি আট বৎসর কাল তোমাদের এখানে ছিলেন, তাঁহার কি হইল, তোমরা বলিতে পার না,—এ কেমন কথা?

বৈদ্যনাথের চমক ভাঙ্গিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন সকল রোগের উপশম হইল। যে বালককে তিনি কুলিরূপে বেল সাহেবের চা-বাগানে চালান দিয়াছিলেন, আজ আড়াই বৎসর পরে সেই বালক সুন্দর যুবাপুরুষে পরিণত হইয়া, সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় তাঁহার দ্বারে উপস্থিত। তাহাকে পাঠাইবার সময়ে তাহার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে ঘুণাক্ষরে সে কথার উত্থাপন করিল না, যেন সে কথা তাহার স্মরণই নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, মোক্ষদা যে মাসাধিক কাল পরিচর্য্যার দ্বারা স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করিয়াছিল, চিত্তরঞ্জন সেই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবনত-হৃদয়ে আজ আমার দ্বারে উপস্থিত। এক দিকে আমার অত্যাচার বিস্মৃত হইয়া আমার দ্বারে আমাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল, অপর দিকে তাহার সেই সেবা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছে। এ ত সোজা লোক নহে! এ নিশ্চয়ই কোন মহদ্বংশোদ্ভব! বৈদ্যনাথ মনে মনে এতটা চিন্তা করিতে নিজেই মনুষ্যত্বের এক রেখা উচ্চগ্রামে আরোহণ পূর্ব্বক সাহসে ভর করিয়া বলিলেন,—“বাবা! তুমি স্থির হও, আমি তোমাকে সমস্ত বলিতেছি। বিরক্ত বা ক্ষুণ্ণ হইও না। ও আমার চাকর বৈ ত নয়। উহার সকল কথা ধরিও না।” এই বলিয়া বৈদ্যনাথ চিত্তরঞ্জনের চা-বাগানে প্রেরণের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঘটনা ঠিকঠাক বর্ণনা

করিয়া বলিলেন, "তোমার চলিয়া যাওয়ার পর প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল মোক্ষদা আমার আলয়ে ছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় পরিচারিকার কাজে ছিলেন না। তিনি তোমাকে এখানে আনার পূর্ব্বে চারি পাঁচ বৎসর উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া চিকিৎসার অধীন ছিলেন, তাহার পরে অল্প কিছুদিন এই গৃহের পর্য্যবেক্ষণ-ভার লইয়াছিলেন। তোমাকে চালান দেওয়ার দিন হইতে পুনরায় উন্মাদিনী সন্ন্যাসিনীর অবস্থায় এখানে ছিলেন। সর্ব্বদাই চৌকিদারী করিতে হইত,—পাছে আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। শেষে একদিনের সামান্য অসাবধানতার ফলে মোক্ষদা অদৃশ্য হইলেন। নানাস্থানে লোক পাঠাইয়া, বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া, অনুসন্ধান করিলাম ও করাইলাম, কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।"

চিত্তরঞ্জনের দুই চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হইল। যুবকের অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডলে বৈদ্যনাথ আজ সর্ব্বপ্রথম দেবভাবের আবির্ভাব অনুভব করিয়া মস্তক নত করিয়া বলিলেন, "আজ বুঝিলাম, আমি মহাপাপী, তোমার মত দেব-প্রকৃতির বালককে অধম আমি স্বার্থান্ধ হইয়া অকথ্য ক্লেশ দিয়াছি; মোক্ষদার কেন, আমারই আত্মহত্যা করা উচিত।" এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে বৈদ্যনাথ অগ্রসর হইয়া চিত্তরঞ্জনকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন ও বলিলেন, "বাবা! আমাকে ক্ষমা কর। এক বৎসরের অধিক কাল আমি দুঃখে ও ক্ষোভে জরজর হইতেছিলাম। তোমাকে দেখিয়া আমার সর্ব্ববিধ অত্যাচার-স্মৃতি ও তজ্জাত যন্ত্রণা আজ দাবানলের আকার ধারণ করিল। আমার প্রাণটা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, আর সেই আগুন যেন আমাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়াছে। বাবা! আমি 'বেড়া-আগুনে' পুড়িতেছি, আমাকে ক্ষমা করিয়া রক্ষা কর। আর আমার এই ইতর উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন্ নাই। আমার আর এ যাতনা সহ্য হইতেছে না। আমার ইচ্ছা হইতেছে, এখনই এ প্রাণ

বিসর্জ্জন করি। আমার মনে হইতেছে, এই গোড়ই নদীর সমস্ত জলেও আমার দাবানল শীতল হইবার নহে! আমাকে ক্ষমা করিয়া রক্ষা কর। আমি তোমাকে ছাড়িব না। আমাকে বল, স্পষ্ট করিয়া বল, 'তোমায় মাপ করিলাম।' এই মধুমিষ্ট কথাটা—এই 'মাপ' কথাটার অন্তরালে আমার জন্য কে যেন শান্তিজল হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তুমি সরলভাবে বল, 'তোমাকে মাপ করিলাম'; তোমার মুখে ঐ কথা শুনিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়াছে। বাবা! তোমার উজ্জ্বল কান্তিভরা মুখে দেবভাব দেখিয়া আমার চেতনা হইয়াছে। আমি কি ঘোর নারকী, আজ আমাকে মানুষ বলিয়া মনে করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে, ঘৃণা ও অভিমানে প্রাণ পুড়িয়া যাইতেছে। বাবা, তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ—তা ত হ'তে পারে না। তুমি মানুষ হ'লে আমি পশু, পশুর অধম ব্যবহার করিয়া করিয়া আমার মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে।"

চিত্তরঞ্জন নীরবে দণ্ডায়মান। জলভরা চোখ নত করিয়া অপূর্ব্ব মাধুরিভরা মুখে চিত্তরঞ্জন দণ্ডায়মান। তাহার আজ এক নূতন শিক্ষা লাভ হইল—যাহা সে কখন দেখে নাই, শুনেও নাই। সংসারে ভূমিষ্ঠ হওয়া দিন হইতে সে শেয়াল কুকুরের মত লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছে, কিন্তু সে তা ঠিক জানে না। কেন এমন ভাবে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, সে সংবাদও সে রাখে না। তাহার কেহ ছিল কি না, কেহ থাকা সম্ভব কি না, তাহাও সে কখন কল্পনা করে না! আর সে চিন্তায় তার লাভই বা কি? অতীতের সে ঘন নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিবার সামর্থ্য তাহার নাই! তাহার আছে প্রাণ,—মানুষের প্রাণ, মহামূল্য হৃদয়ধনে সে ধনী। সে দৈববশে লোকালয়েই বনবাসীর ন্যায় তাহার শৈশব ও বাল্যকাল কর্ত্তন করিয়াছে। তাহার কিশোর-কালটা সে কেবল ভদ্রসন্তানের ন্যায় বারাকপুরে ভট্টাচার্য্য-গৃহে অতিবাহিত

করিয়া লোকালয়ের স্নেহমমতা ভোগ করিতে পাইয়াছিল, কিন্তু তখন সে বালক; এখনও সে বালক। তাহার পিতৃ-মাতৃ-পোষিত দেহ দেব-মন্দির! সে দেব-মন্দিরে তাহার পূর্ব্বপুরুষাগত দেব-স্বভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল! মানুষের মত মানুষ বেল সাহেবের সংস্পর্শে তাহার অন্তর্নিহিত স্বভাবটী ধীরে ধীরে মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। এখনও সে স্বভাবের উচ্চ পরিচয় দানের সময় আসে নাই। তাহার কমল-কোরক-সদৃশ হৃদয়ের আভাসটুকু সর্ব্বদাই তাহার পবিত্র সুন্দর মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায়—এই পর্য্যন্ত, ইহার অধিক আর কিছুই নহে। আজ তাহার, ইহার অধিক কিছু পরিচয় দিবার সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরাধিক বয়সের প্রবীণ ব্যক্তি বৈদ্যনাথ,—একদিন যে বৈদ্যনাথ চিত্তরঞ্জনের সর্ব্বনাশ সাধনে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই বৈদ্যনাথ আজ বালককে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ সাদরে বক্ষে ধরিয়া বলিতেছেন, "বাবা! বল, 'তোমাকে মাপ্ করিলাম'।"

চি। আপনি পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি, আমি কি আপনাকে ঐরূপ পরুষ বচন বলিতে পারি? আমার পক্ষে ঐ কয়টী কথা বলা অসম্ভব। আমি যে ঐ কয়টী কথা বলিতে পারিতেছি না, এজন্য আপনিই আমাকে ক্ষমা করুন।

বৈ। তুমি যতক্ষণ ঐ কয়টী কথা অকপটে উচ্চারণ না করিতেছ, ততক্ষণ আমার একবিন্দু শান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।

চি। আপনার অত্যাচারে আমার হাতে পায়ে দড়ির দাগ পড়িয়াছিল, সে দাগ অনেক দিন ছিল। আপনার কঠোর অত্যাচারের চিহ্ন, আজও আমার ললাটপ্রান্তে, দৃষ্টিপাত করিলে, দেখিতে পাইবেন; কিন্তু আপনার পাষাণ-সদৃশ কঠোর ব্যবহারই আমার ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের, আমার জীবনের শুভ সূচনার জনয়িত্রী। আমি কেমন করিয়া আপনার ঐরূপ কার্য্যের মঙ্গল ফল বিস্মৃত হইব? আমার আজ আপনার চরণে

কৃতজ্ঞতা অর্পণের দিন, আপনি আর ঐরূপ কঠোর ভাষা বলিবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিবেন না। আপনার নির্ম্মম ব্যবহারই আমাকে বেল সাহেবের আশ্রয়-দানে সহায়তা করিয়াছে; বেল সাহেবে আমি একাধারে পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, সুহৃদ্ ও সখার সঙ্গ লাভে ধন্য হইয়াছি। সে জন্য আমিই আজ আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি।

বৈ। তোমাকে একদিন পশুবলে পরাজয় করিয়াছিলাম, আজ তুমি তাহার উপযুক্ত দণ্ড আমাকে দিলে। বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন এই পরাজয়ই আজ আমার জীবনের ভূষণ হয়।

বৈদ্যনাথ একটু সুস্থ বোধ করিয়া চূড়ামণিকে ডাকিয়া ত্বরায় আহারাদির আয়োজন করিতে বলিয়া দিলেন। চূড়ামণি অতিথির পরিচর্য্যার উপযুক্ত আয়োজনে ব্যস্ত হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কাশীধামে

সকল বড় বড় সহরে ক্ষুধাকাতর দুরন্ত প্রকৃতির লোকমণ্ডলী দস্যুবৃত্তি করত-নিরীহ লোকদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। আবার সেই সকল সহর যদি তীর্থস্থান বলিয়া বিদিত হয়, তাহা হইলে সেই সকল পীঠস্থানের সজ্জনমণ্ডলীর—সাধু ও ধর্ম্মাত্মাগণের বিচরণের অন্তরালে লোক-দলন ও দস্যুবৃত্তি আরও ভীষণাকার ধারণ করে। পুণ্যক্ষেত্র কাশীর সমাজ-জীবনের অন্তরাল-ভাগটা এইরূপ লোক-দলনপটু দস্যুর আবাস স্থান বলিয়াই "কাশীর গুণ্ডা" ভারত-

বিদিত। কাশীর গঙ্গাপুত্র ও যাত্রাওয়ালাদের সকলে না হউক, অনেকেই যে গুণ্ডাদলভুক্ত অত্যাচারী লোক সে সংবাদও ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন।

চিত্তরঞ্জন মোগলসরাই ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া রাজঘাটের গাড়ীতে উঠিবার সময়ে (সেকালে গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণ ও রেল চালান হয় নাই) ঐ যাত্রাদল সংগ্রহে পটু পাণ্ডারা চিত্তরঞ্জনের সঙ্গ লইল। চিত্তরঞ্জন এরূপ লোকের হাতে পড়িয়াই মনে অনুভব করিল, ইহারা ঠিক যেন চা-বাগানে চালানী-কুলীর আড়কাটি। যেই এই ভাবটা মনে হইল, অমনি তাহাদিগকে বলিয়া দিল, "কাশীতে আমার থাকিবার স্থান আছে, তীর্থের কাজ কিছু করিতে হইলে, যে বাড়ীতে যাইতেছি, তাঁহাদের নিযুক্ত লোক দ্বারাই আমি আমার কাজ করিব। তোমরা অন্য যাত্রী ধরিবার চেষ্টা দেখগে, আমার সঙ্গে এস না।" তবু কি উহারা ছাড়ে?—দুই এক জন গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। পরিচয় জানিবার জন্য, দেশ, বাড়ী ঘর কোথায় জানিবার জন্য, পিতৃপিতামহের নাম জানিবার জন্য ব্যস্ত ও বিব্রত করিয়া তুলিল। চিত্তরঞ্জন নীরব। শেষে তাহারা বলিল, "আমাদের জানিবার অধিকার আছে। তোমার পিতৃপিতামহ আমাদের মনিব মাধো মিশ্রের যজমান হইতে পারে, আমরা না জানিয়া ছাড়িয়া দিব কেন?" তখন চিত্তরঞ্জন পুনরায় বলিল, "সে যা কিছু ঠিক করিতে হয়, ঐ ঠিকানায় কাল সকালে দেখা করিয়া জানিয়া লইবে। আমি এখন তোমাদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করিতে পারিব না, তোমরা যাও।" রাজঘাটে আসিয়া চিত্তরঞ্জন দেখিল, অসংখ্য শকট ও একা যাত্রী লইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, গাড়োয়ানেরা লোক ধরিবার জন্য ছুটাছুটী করিতেছে। চিত্তরঞ্জন একখানি স্প্রিংএর একা ভাড়া করিয়া বাঙ্গালীটোলা অভিমুখে যাত্রা করিল। রাজঘাট হইতে কাশীর অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া পরপারে জলস্থলে পুণ্যধামের মনোহর

সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেকালের ক্ষীণপ্রাণ পুলের উপর দিয়া চলিয়াছে। মনে মনে স্থির করিল, এই মহাক্ষেত্রের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে হইবে। আর "বেদাচার্য্য নাম বারাণসী ধাম" সেই যে একদিন অন্ধকার হৃদয় আলো করিয়াছিল, সেই ইঙ্গিতে অনুভূত আশার বাণী সত্য কি না, তাহারও সন্ধান করিতে হইবে।

তিন চারি দিন ধরিয়া মালতীর হৃদয় মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। সে বুঝিতে পারে না, কেন এমন হইতেছে। সে স্থির হইয়া কোথাও দাঁড়াইতে পারিতেছে না, বসিয়া ভাল করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছে না, যেন দম আটকাইতেছে। নিয়ত বাম নেত্র স্পন্দিত হইতেছে; সে স্পন্দন এত প্রবল ও পরিষ্কার যে মালতীর মাও কয়েক বার তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু কিছু বলেন নাই। চিত্তরঞ্জনের মোগলসরাই পৌঁছিবার দিন প্রত্যুষে মালতীর দাদামহাশয় গঙ্গাস্নানে বাহির হইয়াছেন, মালতীর মা পাকশালার মার্জ্জন-কার্য্যে ব্যস্ত। কি একটা প্রয়োজনে মালতীকে ডাকিবা মাত্র, মালতী নিকটে আসিলে, মা তাহাকে বাসনগুলি বাহিরে লইয়া যাইতে বলিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন কন্যার বাম হস্তখানি ঘন ঘন নৃত্য করিয়া উঠিল। মালতী ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিল, "মা, দেখ, দেখ, কেন এমন হইল? আমার হাতখানা এত নাচিতেছে কেন? বা! কি সুন্দর! আমার এত ভাল লাগ্‌ছে! কেন মা, কেন এমন হ'লো?" মালতীর মা বলিলেন, "কখন কখন ওরকম হয়। হয় হোক, ওতে দোষ নেই।" মালতী মায়ের আদেশে বাসনগুলি বাহিরে লইয়া যাইবে, কিন্তু হাতের স্পন্দনে সে এমন বিব্রত হইয়াছে যে, বাম হাতে বাসন ধরিতে পারিতেছে না। তাহার মা বলিলেন, "থাক থাক, আমিই নে যাচ্চি, তুমি হাত মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড় গে। ঐ আল্‌নায় যে ফরসা কাপড়খানা আছে, পর। বাম অঙ্গ নৃত্য করিলে ফর্‌সা কাপড় পরতে হয়।" মালতী বিনা

তর্কে মাতৃ আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, স্নানান্তে হরিনাথ গৃহে পদার্পণ করিতে করিতে নাতিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দিদিমণি, তোমার ফুল ফুটেছে; তোমার ফুল এত সুন্দর, দেখে আমারই মেয়েছেলে হতে ইচ্ছে হচ্ছে। আহা কি সুন্দর পুরুষ! মা, ভুবন! এমন সুন্দর ছেলে কোথায় পেয়েছিলে?" মালতীর মা সকল কথা ভাল করিয়া শুনিতে না শুনিতে, কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই চিত্তরঞ্জন দ্বার অতিক্রম করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং হরিনাথকে মালতীর দাদামহাশয় বুঝিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া মালতীর মাকে প্রণাম করিতে অগ্রসর হইল। চিত্তরঞ্জন নিকটস্থ হইতে না হইতে মালতীর মা হাত ধুইয়া নিকটে আসিলেন; তিনি, আনন্দে বিহ্বল হৃদয়ের উত্তেজনায় দিশাহারা হইয়াছেন, বাষ্পাকুল-লোচনে পুত্রের ন্যায় তাহার চিবুক-ধারণ করিয়া স্নেহ-চুম্বন দিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে সহসা শয়ন-কক্ষের শব্দ-সঙ্কেতে সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিলেন মালতী হতচেতন হইয়া শয্যার নিকটে গৃহতলে পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই সত্বরপদে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। মালতীর মা বহুকষ্টে তাহাকে উঠাইয়া খাটের উপর শয্যায় শয়ন করাইলেন এবং চিত্তরঞ্জনকে নিকটে স্বতন্ত্র আসনে বসাইয়া, কন্যার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হইলেন!

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বৈদ্যনাথের বৈরাগ্য

চিত্তরঞ্জনের চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যনাথের শূন্য হৃদয়ের হাহাকার সম্পূর্ণ নূতন পথ অবলম্বন করিল। এ হাহাকার ফাঁকা নহে; কোন অজ্ঞাত বস্তু অর্জ্জনের স্পৃহা সে হৃদয়ে জাগিয়াছে, আর সেই সঙ্গে মানবজীবনের আচার-ব্যবহারগত তারতম্যের জ্ঞান—ইতরবিশেষের ভাব, সাধারণ ও অসাধারণের চিত্র তাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইতে চাহিতেছে; কিন্তু সে চিত্তের বিকার ও মলিনতার কালিমা ধৌত হইতে অনেক সময় লাগিবে, তাই একটা কিছু গড়িয়া তুলিতে যে আদর্শের প্রয়োজন তাহার অভাবে যন্ত্রণার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। কি করিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। কিছু করিতে হইবে, উত্তম কিছু করিতে হইবে। আর ইতরজীবনের প্রবাহে সাঁতার দিয়া জীবন শেষ করিতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু তবুও থাকিয়া থাকিয়া চিন্তার প্রবাহ মোক্ষদার প্রতি ধাবিত হয়। বলপূর্ব্বক মোক্ষদার পুনর্ম্মিলনচিন্তা মন হইতে বিদায় করিবার শক্তি ক্রমশঃ আসিতেছে, ক্রমশঃ নিজের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার পথ যেন সময়ে সময়ে মনের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। যেন শুশুকের জলে ভাসার মত ভাসিয়া অদৃশ্য হয়। সে ভাবের পশ্চাদ্ধাবন অসম্ভব। সেই জন্য দিন দিন ক্লেশ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দুস্তর যন্ত্রণাপারাবারে ভাসিতে ভাসিতে বৈদ্যনাথের জীবনধারণ যখন একেবারে অসম্ভব হইয়াছে, সেই সময়ে সহসা একদিন কাল বৈশাখের অপরাহ্নে বৈদ্যনাথ নিজের শয়ন-কক্ষের বাতায়ন-পথে দেখিলেন বায়ু-বিতাড়িত ঘন বারি-

বর্ষণ নিবন্ধন গোড়াই নদীর বিক্ষিপ্ত নীল জলে নীলপদ্মে নীলকান্তমণি ভাসিতেছে ও ডুবিতেছে! দেখিয়া তাঁহার চক্ষু স্থির হইল, এমন আশ্চর্য্য দৃশ্য ত কখন নয়নপথে পতিত হয় নাই। একবার দুইবার তিনবার দেখিলেন, দেখিতে দেখিতে যেই মনে করিলেন, এরূপ অসম্ভব কি সম্ভব হয়, অমনি সে দৃশ্য সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল। কেবল বারিবর্ষণ ও জলোচ্ছ্বাস বৈগুনাথের নয়নসমীপে বর্ত্তমান। কিন্তু নীলজলে নীলপদ্মে নীলকান্তমণি আর দেখিতে পাইলেন না। তখন মনে হইল, "হয়ত ওটা ভ্রম। আচ্ছা আর একবার দেখি ত।" দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে নদীবক্ষে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এমন সময়ে নদীর স্রোতে বৃষ্টির ধারাপাতে, তাঁহার যেন বোধ হইল লেখা হইতেছে, "আর হবে না, আর হবে না।" এই দুই আশ্চর্য্য দৃশ্য তাঁহার হৃদয়ে এক চমৎকার ভাবের সঞ্চার করিল। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বহুক্ষণ নদীবক্ষে এক অতিমানব শক্তির লীলা অনুভব করিতে লাগিলেন; আব আপনা আপনি তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, তবে কি জল স্থল সবই প্রাণময়? এই আকাশ-পাতাল-পৃথিবী সবই কি প্রাণের খেলা! কি দেখিলাম, এমন কি কেহ কখন দেখে? মনে মনে এই চিন্তা করিতে করিতে বহুক্ষণ সেইখানে বসিয়া কাটাইয়া দিলেন।

এই আশ্চর্য্য ঘটনার কথা কাহাকেও বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। আমাকে পাগল বলিবে, আর বলিবেই ত, আমিও ত আমাকে পাগল বলিয়া স্থির করিতাম, কিন্তু আমি ত, আমার দেখা বস্তুর প্রতি সন্দেহ করিতে পারি না, এই ঘটনার পশ্চাতে নিশ্চয় কোন দৈবশক্তি বর্ত্তমান। তবে কি আমার উদ্ধারের উপায় হইবে? আমার এ যন্ত্রণার নিবারণ হইবে? কোথায় গেলে, কাহার আশ্রয় লইলে উপায় হইবে, কই, তাহার ত কোন ইঙ্গিত পাইলাম না। আচ্ছা, এ যদি ঠিক

সত্য হয়, তবে অবশ্যই উপায়ও হইবে—পথও দেখিতে পাইব। আর তাহা হইলে, এ ঘটনার নিশ্চয়তা সম্বন্ধেও আর সন্দেহ থাকিবে না।

আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির হৃদয়ে বৈদ্যনাথের দৃষ্ট ঘটনা যতটা পুলকপূর্ণ রোমাঞ্চের সৃষ্টি করিত, সেরূপ একটা বর্ণনাতীত উল্লাসের প্রবাহ বৈদ্যনাথের হৃদয় মন পূর্ণ করে নাই। সংসারের হিসাব—আনা পাই-কড়া-ক্রান্তির—মিলনসাধনপটু বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন, দুরন্ত প্রকৃতির বৈদ্যনাথের দৃষ্টিতে এ ঘটনা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইয়াছে, কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। বৈদ্যনাথের দীর্ঘ জীবনের বিবিধ অনুষ্ঠানের অন্তরালে বুদ্ধি-বিবেচনার অতীত কোন একটা কিছু তত্ত্ব-বস্তুর বিদ্যমানতা ও তাহা লাভের আকাঙ্ক্ষা জীবনের ঘুমঘোরের ভিতরে জাগিয়া উঠিতে চাহিতেছে, এর অধিক কিছু বৈদ্যনাথের বুদ্ধি বিবেচনায় স্থান পাইতেছে না। কিন্তু তবুও স্থির থাকিতে দিতেছে না। ক্রমশঃ ঐ বিবিধ ঘটনাস্রোতে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী অননুভূতপূর্ব্ব পদার্থের প্রতি লালসা – ও অল্পে অল্পে আগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশের মেঘ ঘনতর শ্যামছায়ায় পরিণত হইল। ধরণীবক্ষ সেই নিবিড় নীলাম্বরী পরিধানে অপূর্ব্ব গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল। চারিদিক নীরব ও নিস্তব্ধ। সন্ধ্যার অন্ধকার সহসা যেন গভীর রজনীর ভাব ধারণ করিল, কেবল প্রবল বায়ুর সন্ সন্ শব্দ ও নদীতরঙ্গের উচ্ছ্বাসধ্বনি কর্ণপটহে ধ্বনিত হইতেছে, আর কিছুই শুনা যায় না। এমন নিস্তব্ধ সময়ে একটী আলো ধীরে ধীরে বৈদ্যনাথের গৃহের দ্বারে সমাগত। বৈদ্যনাথ নিজের শয়নকক্ষ হইতেই চূড়ামণিকে বলিলেন, "আলোকবাহীকে আমার নিকট এইখানে নিয়ে এস।" পক্ককেশ, শ্মশ্রু ও গুম্ফ-পরিশোভিত এক প্রাচীন মূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিত। এই উষ্ণীষধারী প্রাচীন ব্যক্তিকে দেখিয়া বৈদ্যনাথ, চিত্ত-বিক্ষেপ নিবন্ধন, চিনিতে পারেন নাই। নিকটে আসিয়া উপবেশন করত সস্নেহে

সম্ভাষণ করিবামাত্র বৈদ্যনাথ সসম্মানে গাত্রোত্থান করিয়া করজোড়ে ভক্তিভরে নমস্কার করিলেন, এবং তাঁহার আগমনে নিজের সৌভাগ্য জ্ঞাপন করিলেন।

ইনি কুষ্টিয়ার সেকালের ছোট আদালতের হেড্ক্লার্ক, নাম কৃষ্ণেন্দ্রনাথ চৌধুরী। কৃষ্ণেন্দ্র বাবু আসন গ্রহণ করিতে করিতে বলিলেন, "শুনিলাম, আপনি খুব পীড়িত, কবিরাজ মহাশয় চিকিৎসা করিতেছেন। তিনিই বলিলেন যে আপনি কিছু দিন হইতে নানা কারণে চিত্ত বিকারে ক্লেশ পাইতেছেন। তাই আজ একবার আপনাকে দেখিতে আসিলাম। প্রত্যহই আসিব আসিব বলিয়া আয়োজন করি, কিন্তু কাজের গোলমালে হইয়া উঠে নাই। আপনি এখন কেমন আছেন ?"

বৈ। কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসায় আমার কিছু উপকার হইয়াছে সত্য, কিন্তু মানসিক গ্লানিই আমার অসুখ, কাজেই এ চিকিৎসায় আমার আর বেশী কিছু উপকার হইব না। এ সময়ে আমার আলয়ে আপনার পদার্পণ পরম ভাগ্য। আপনাদের ন্যায় সাধু ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ও সঙ্গলাভ ঘটিলে আমার এ উপস্থিত যন্ত্রণার বিরাম হইতে পারে। আপনার আগমনে আমার কি আনন্দ হইতেছে !

কৃ। আমি আপনার নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে পারিতাম, কিন্তু আমি আপাততঃ এক বৎসরের ছুটি লইয়া তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইব। আমারও আর কেহ নাই। এক ছেলে, তাকে স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, এখন কোথাও মনস্থির করিয়া বসিতে পারিলে আর ফিরিব না। পেন্সন লইয়া কোন তীর্থ-স্থানেই বাস করিব।

বৈ। এখন কোথায় যাইবেন ?

কৃ। এখান হইতে যাত্রা করিয়া সর্ব্বাগ্রে গয়া। গয়া হইতে

প্রয়াগে, পরে হরিদ্বারে যাইব। পরে মথুরা বৃন্দাবন হইয়া কাশীধামে আসিব। আমি বৈষ্ণব মানুষ, কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপায় শ্রীবৃন্দাবনে আমার স্থান হইলে, সেই পুণ্যতীর্থে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইব, এই বাসনা লইয়া বাহির হইতেছি।

বৈ। আপনার সঙ্কল্প শুনিয়া আপনার সঙ্গে আমার বাহির হইয়া পড়িবার ইচ্ছা হইতেছে। আপনি কি আমার মত অধম ব্যক্তিকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইবেন ?

কৃষ্ণেন্দ্র বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে আপানার, বা আপনার সঙ্গে আমার তীর্থ-যাত্রা নিরাপদ হবে কি ? আপনি ও আমি উভয়েই এতকাল এখানে বাস করিলাম, কিন্তু মেলা-মেশার অভাবে কেহ কাহাকেও ভাল করিয়া জানি না, খুব ভালবাসাবাসি না থাকিলে ধর্ম্মার্থে তীর্থযাত্রায় পদে পদে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। এতে আপনার ও আমার কাহারও কোন লাভ হইবে না বলিয়া মনে হয়।"

বৈ। আমি যদি বালকের ন্যায় আপনার উপদেশমত চলি, তা হ'লেও কি হয় না ? আমি আপনাকে বেশ জানি, কিন্তু আমি কতটা মন্দ তাহা আপনি না জানিলেও আমি জানি। আমি আমার পাপভারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি, উত্তম আশ্রয় খুঁজিতেছি। যদি আমাকে সঙ্গে লওয়া অসম্ভব হয়, তবে এমন দুর্দ্দিনে আপনি আমার দ্বারে আসিলেন কেন ? আমার মনে হইতেছে, কি জানি কে যেন আপনাকে আমার উদ্ধারের জন্য এই ঘোর অন্ধকারে ঐ আলো হাতে পাঠাইয়াছেন। আপনার আলো আমার পথ-প্রদর্শক হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে। আমাকে ত্যাগ করিবেন না। আমি আপনার সঙ্গে যাইব। আমাকে সঙ্গে লইতেই হইবে।

কৃ। আমি চলিয়া যাইতেছি বলিয়া একবার আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম। আমি সামান্য লোক, নিজে জ্বালা-যন্ত্রণায়

অস্থির, আমার কি সাধ্য যে আপনার কোন উপকার সাধন করিতে পারি ?

বৈ। আমাকে সঙ্গে লইতেই হইবে, আমি আপনার সঙ্গে যাইব—এই চিন্তা আমার হৃদয়ের বল বৃদ্ধি করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার দারুণ অবসাদ-ভার যেন হ্রাস পাইতেছে। কি আশ্চর্য্য, আমার জীবনের শতবিধ অধর্ম্মানুষ্ঠান আজ এখনই আমার স্মৃতির ফলকে অঙ্কিত হইয়া আমাকে দংশন করিতে করিতে ইঙ্গিত করিতেছে,—বলিতেছে, "ঐ সঙ্গ ছাড়িস্ না, ওতেই তোর ভাল হবে।" আমি আপনাকে ছাড়িব না। আমাকে সঙ্গে লইতেই হইবে।—বলিতে বলিতে কাঁদিয়া বৈদ্যনাথ বৃদ্ধের পায়ে ধরিয়া গৃহতলে বসিয়া পড়িলেন।

মনস্তাপে মুহ্যমান বৈদ্যনাথকে সযত্নে উঠাইয়া কৃষ্ণেন্দ্র বাবু শয্যায় বসাইয়া বলিলেন, "আপনি স্থির হউন, আমি বিষয়টা ভাবিয়া দেখিব এবং আপনাকে বলিব। আমার ছুটী মঞ্জুর হইয়া আসিয়াছে, সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা হইয়া গিয়াছে। কেবল আপনার সঙ্গে দেখা করা বাকি ছিল, কিন্তু আপনাকে দেখিতে আসার ফলে আমার বিলম্ব হইয়া পড়িবে।

বৈ। কেন? আপনি কবে যাত্রা করিবেন? আমাকে কাল আপনার সঙ্গী হইতে বলিলে, আমি সব ফেলিয়া আপনার সঙ্গে চলিয়া যাইব। একমুহূর্ত্ত বিলম্ব করিব না। আমার কোন আয়োজনের প্রয়োজন নাই। আমি সংসারের সঞ্চিত ভস্মরাশির প্রতি একবারও তাকাইব না।

কৃ। কিছু ত করিতে হইবে, অন্ততঃ হাতে তুলিয়া কাহাকেও দিতে হইবে। তাতেও ত পুণ্য আছে।

বৈ। সে বিষয়েও আমি আপনার উপদেশ গ্রহণ করিব। এক তিলও অমত করিব না।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হৃদয় বিনিময়ে

শয্যায় শায়িতা মালতীমালা বেলা প্রায় নয়টার সময়ে জীবনের এই অননুভূতপূর্ব্ব আবেগের আক্রমণ হইতে সামান্য একটু মুক্তি লাভ করিয়া ধীরে ধীরে বিশালায়তন চক্ষু দুইটীর আবরণ উন্মোচন করিল। এতক্ষণ বৃদ্ধ হরিনাথ শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ক্লান্ত ও শিথিল হস্তে ব্যজন করিতেছিলেন। মালতীর মা জলে অডিকলন্ মিশাইয়া মাথায় দিতেছেন। চিত্তরঞ্জন নীরবে নিকটে স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট। সংসারের সকল কাজ পড়িয়া আছে। চিত্তরঞ্জনের আগমনে ক্ষুদ্র গৃহখানি এখনও আনন্দের তরঙ্গে ভাসিতে পায় নাই।

মালতী বড় হইয়াছে, ভালবাসার মর্য্যাদা অনুভব করিতে শিখিয়াছে। কল্পনায় কত ভাব সে মনে মনে পোষণ করিয়া থাকে; তাহার সাধ ছিল যদি কখন তাঁহার সঙ্গে দেখা হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিবে। কিন্তু আজ সহসা জীবনের চিরসম্বলের সমাগম-সংবাদের সুতীব্র তাড়না তাহাকে শয্যাশায়ী করিয়াছে। এতক্ষণ পরে চেতনা হইয়াছে। আজ এই উত্তেজনার পর প্রথম দৃষ্টিপাতে তাহার নয়নাভিরাম হৃদয়ধনকে নিকটে দেখিয়া—সেই বালকের এই পরিণত সৌন্দর্য্যে তাহার শয়ন-কক্ষ আলোকিত দেখিয়া, লজ্জায় তাহার নয়ন মুদ্রিত হইল। বড় বড় দুই ফোটা জল নয়নপ্রান্তে মুক্তার ন্যায় গড়িয়া উঠিতে না উঠিতে ধারায় পরিণত হইল। হরিনাথ এই স্বর্গীয় শোভা সন্দর্শনে আর্দ্র নয়নে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন!

মালতীর মা বলিলেন, "মা, এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে ?" মালতী ইঙ্গিতে সুস্থতার সংবাদ দিল। গৃহিণী বলিলেন, "ঘরের কাজগুলো আমি সারিয়া ফেলি,আমার সাত রাজার ধন মাণিক—আমার হারাণো বাবা এসেছে, খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করতে হবে। বেলা অনেক হ'লো, আমি কাজগুলো সারিগে ?" মালতী পূর্ব্ববৎ ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে,গৃহিণী চিত্তরঞ্জনকে বলিলেন,"তুমি এইখানেই ক্ষণকাল ব'সো। তোমার দাদামশাই বাজার হইতে ফিরিয়া আসিলে তুমি উঠিয়া হাত মুখ ধুইবে ও স্নান করিবে।"

মালতীর মা চিত্তরঞ্জনকে নিকটে রাখিয়া কার্য্যান্তরে প্রবৃত্ত হইতে না হইতে মালতীর অশ্রুধারা ভাগীরথী-ধারায় পরিণত হইল। সে প্রবাহ নিবারণ করা সে সময়ে কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না; চিত্তরঞ্জন কেন, জগতের কোন শক্তিই তখনকার সে আবেগ নিবারণে সক্ষম নহে। সে সুবিমল নারীহৃদয়ের দীর্ঘপোষিত প্রেমের রুদ্ধ আবেগ আজ সুযোগ পাইয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে, আজ তাহার হৃদয়ের গতি রোধ করিবে কে ? কলহপ্রিয়া চঞ্চলা বালিকা মালতী আজ জীবনের যৌবনভারে হৃদয়ের দুকূল ভাসাইয়া নদীতরঙ্গের ন্যায় প্রেমের বন্যায় পাগলিনী হইয়া নীরব সংগীতে চিত্তরঞ্জনের হৃদয় জুড়াইতে লাগিল। তাহার আর পায়ে ধরিয়া মাপ্ চাওয়া হইল না। চিত্তরঞ্জন তাহার হৃদয়ের ধন হইলেও, মালতীমালার স্মৃতি-সৌরভে চিত্তরঞ্জনের দেহ মন ও আত্মা আপ্লুত হইলেও, সে ক্ষণে ক্ষণে শতবার এই অশ্রুজল মুছাইয়া কৃতার্থ হইতে, তাহার ও উহার হৃদয় জুড়াইতে ব্যাকুল হইলেও, আত্মবিস্মৃত হইয়া মালতীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহস করিতেছে না; যেন কোন অধিকার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা হয় বলিয়া মন সে কাজে বাধা দিতেছে। এমন সময় মালতীর মা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র যুবক স্নেহভরে মিষ্ট বাক্যে মালতীকে শান্ত হইতে, সাবধান হইতে, সংযত হইতে বলিয়া নিজের রুমালখানি বাহির করিয়া তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিল। এই

স্নেহ যত্ন ও ক্ষুদ্র সেবায় এবং চিত্তরঞ্জনের দীর্ঘ অদর্শন ও সেই দীর্ঘকালে সংঘটিত অবস্থাবিপর্য্যয় ইত্যাদির স্মরণে গৃহিণীও জলভারাক্রান্ত চক্ষু-দুটী অঞ্চলাবৃত করিয়া কর্ম্মান্তরে গমন করিলেন। মালতীর ক্ষোভ ও অনুশোচনা পূর্ণামাত্রায় প্রকাশ পাইল। সে বেচারা সর্ব্বপ্রথম বাক্যো-চ্চারণ কালে বলিল, "তুমি আমাকে মাপ্ কর, আমি তোমাকে গৃহতাড়িত করিয়া পিতৃহন্তা হইয়াছি, নিজেরও অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণার সূত্রপাত করিয়াছি, আমাকে লইয়া আমার মায়ের ক্লেশের সীমা নাই। আমি অতি মন্দ, আমাকে ক্ষমা কর, আর আমি তোমাকে কষ্ট দিব না। আমি—আমি—তোমার—"আর কিছুই বলিতে পারিল না। আবার নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

চিত্তরঞ্জন পুনরায় চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া নীরবে উপবিষ্ট, এমন সময়ে হরিনাথ আসিয়া স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাঙ্গা দিদি! একটু ভাল আছ? তোমার স্যাঁঙাৎএর সঙ্গে দুটা কথা কহিলে?" এই কথা বলিতে না বলিতে চিত্তরঞ্জন লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হরিনাথ বলিলেন, "কি ভাই উঠছ কেন? আমার আসাটা কি সহ্য হ'লো না?" চিত্তরঞ্জন সপ্রতিভ ভাবে বলিল, "আজ্ঞে আমি অনেকক্ষণ ব'সে আছি, আমি একটু বাহিরে যাই।"

চিত্তরঞ্জন চলিয়া গেলে হরিনাথ মালতীর মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভুবন! মা, এমন সুপুরুষ, এমন সহজ সুন্দর সরল মুখ ত সচরাচর দেখিতে পাই না। এ ছেলে বামুন ছাড়া আর কি হবে? এমন ছেলেকে মেয়ে দিয়ে জাত গেলেও ক্ষতি নাই। আমি এই ছেলের হাতে তোমার মেয়ে দিতে আপত্তি করিব না। বেশ ছেলে।" মালতীর মা বলিলেন, "তাই ত এত দুঃখ কষ্ট করিয়াও মেয়ে নিয়ে এতদিন ব'সে আছি। খুব ভাল ছেলে।" বৃদ্ধ বলিলেন, "আমার রাঙ্গা দিদির সঙ্গে সত্যিই মানাবে ভাল। অমনি মালতী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "মানায়

মানাবে, আমার মানাবে, তোমার তাতে কি?" হরিনাথ বলিলেন, "রাঙ্গা দিদি! আমি যে তোমাকে ভালবাসি, ও ছোক্‌রা ত আমার জিনিসে ভাগ বসাবে। তাই আমার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।" মালতী বলিল, "আচ্ছা মন খারাপ হয় হবে। আমি তোমার মন যুগ্‌য়ে মন খারাপ সেরে দেবো।" হরিনাথ হাসিয়া বলিলেন, "দুই নৌকায় পা দিয়ে মানুষ জলে ডোবে, দুজনের মন যোগাতে তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে।" মালতী "হয় হবে" বলিতে না বলিতে চিত্তরঞ্জনকে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া লজ্জায় অঞ্চলে আনন আবৃত করিল। হরিনাথ বলিলেন, "রাঙা দিদি, স্যাঁঙাৎকে সব কথা বলে দেব?" মালতী আব্‌দা'রে সুরে বলিল, "দেখ না, মা! তোমার কাকাকে বারণ কর।" গৃহিণী বলিলেন, "তুই আমার কাকার কথার উত্তর দিস্‌ কেন? চুপ করে থাক্‌তে পারিস্‌ নে?" হরিনাথ বলিলেন, "তবে বলি—" বলিয়া চিত্ত-রঞ্জনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দেখ ভাই! তোমার ক'নে তোমার দেখা না পেয়ে আমার সঙ্গে মালা বদল ক'রেছিল, এখন তুমি এসেছ দেখে, সে আমার সঙ্গে লেখাপড়া করিয়া ফারখত চাহিতেছে, আমি রাজি নই, তাই আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে।" মালতীর মা হাসিয়া আটখানা হইলেন দেখিয়া মালতী অভিমানভরে পাশ ফিরিয়া বলিল, "তুমি যাও।" হরিনাথ বলিলেন, "কেন, ও এসেছে বলে?" মালতী হার মানিয়া নীরব হইল, হরিনাথ বলিলেন, "এতক্ষণ পরে মতলব ধরা পড়লো।"

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পিতৃচরণে

মোক্ষদাকে লইয়া কুমারনাথ কাশী যাত্রা করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদে মোক্ষদার হৃদয়ে বল বৃদ্ধি হইয়াছে। কুমারনাথ অন্তরের অন্তরতম স্থানে লুক্কাইত ভোগ-বাসনার তাড়নায় কতশত কল্পনাকে হৃদয়ে স্থান দিতেছেন, আর মোক্ষদার অসামান্য সৌন্দর্য্যসুধারসে আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া যাইতেছেন। কুমারনাথের ইচ্ছা মোক্ষদা কাশীধামে পিতৃসদনে না গিয়া কৃষ্ণনগরেই কুমারনাথের গৃহবাসিনী হইয়া থাকে। মোক্ষদা পথে বাহির হইয়া কুমারনাথের কোন পরিবর্ত্তন না দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে বলিল, "আপনার মনের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই দেখিয়া আমি অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিতেছি। আপনি শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি হইয়া আত্মশাসনে এতটা অপটু! আপনার ব্যবহার স্মরণ হইলে, পুরুষ জাতির প্রতি ঘৃণার উদয় হয়। আপনি ইতর বাসনা ত্যাগ করুন। আমাকে লইয়া আপনি কাশী চলিয়াছেন। কাশী তীর্থস্থান। কতশত সাধু-সজ্জনের পায়ের ধূলায় কাশীক্ষেত্র পবিত্র। সেখানে স্বয়ং ভগবান বিশ্বেশ্বর ও দেবী অন্নপূর্ণার আবির্ভাবের প্রভাবে কাশীর হাওয়া পর্য্যন্ত পবিত্র। আপনি এমন পবিত্র স্থানে যাইতেছেন বলিয়া আপনার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র আনন্দের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে না?

কু। তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার হৃদয়মনের উপর এমন আশ্চর্য্য একটা সৌন্দর্য্যের ছাপ পড়িয়াছে, যে আমি সে ছাপ তুলিতে অক্ষম। আমার পক্ষে তাহা পরিত্যাগ করা কঠিন।

মো। পশুরও ধর্ম্ম আছে, আপনার পশুধর্ম্মও নাই, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। আমার প্রতি আপনার ব্যবহার আমি যত বার স্মরণ করিয়াছি, ততবারই আপনাকে নির্ব্বোধ পতঙ্গের ন্যায় আত্মবিনাশপরায়ণ জীব বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। আগুনের যেমন পুড়াইবার শক্তি আছে, সন্ন্যাসীর স্পর্শবলে আমারও সেরূপ বলবৃদ্ধি হইয়াছে। আমার হৃদয়ের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা আমাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথের পথিক করিয়াছে; আমি আর সংসারের কোনও প্রকার বন্ধনে বাধ্য হইব না। আমি এখন ভিন্ন পথের পথিক। আপনি আমার কথা শুনুন, আপনার ভাল হইবে। আপনার গৃহে সংসারের অমূল্য ধন বিরাজ করিতেছে। সৌদামিনীর পতিপরায়ণতার তুলনা সংসারে বিরল। সে কেবল বাহিরে সুন্দরী নহে, সে হৃদয়েও সুন্দরী; আর তাহার স্নেহ মমতা ও দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, সে স্ত্রীর স্বামী নিজকে ভাগ্যবান মনে করিলেই স্ত্রীর যথেষ্ট সম্মান করা হইল না। সে পূজার যোগ্য। আপনি এমন গৃহলক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়া আমার মত একটা পাগলীর পশ্চাতে ছুটিয়াছেন, পরিণাম ভীষণ হইবে। এখনও শান্ত ও সাবধান হউন। দুটী ছোট ছোট সোণার চাঁদ বিধাতা আপনাকে দিয়াছেন, তাহাদের মানুষ করুন। সংসারটা ছেলেখেলার ও পাগলামীর স্থান নহে, এ বড় কঠিন ঠাঁই।

কুমারনাথ মোক্ষদার বাক্যাবলী শুনিতে শুনিতে সতৃষ্ণ নয়নে মোক্ষদার পানে তাকাইয়া সে রূপসাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন। মোক্ষদা দেখিল, রূপের মোহ কুমারনাথকে পাগল করিয়াছে। ইহার এ বিকার সহজে ইহাকে পরিত্যাগ করিবে না। সৌদামিনী ও তাহার শিশু দুইটীর জন্য মোক্ষদার প্রাণ কাতর হইল। তাহার চক্ষে জল আসিল।

এমন সময়ে কুমারনাথ মোক্ষদাকে লইয়া মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন। মোগলসরাই ষ্টেশনে রাজঘাটের গাড়ীতে উঠিলেন।

রাজঘাটে প্রতিদিন প্রত্যেক ট্রেণে মোক্ষদার জন্য কোন না কোন লোক উপস্থিত থাকেন। নামিবার সময় এক প্রবীণ সন্ন্যাসী অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা লক্ষ্মি! তুমিই কি অন্নপূর্ণা?" মোক্ষদা মস্তক নত করিয়া প্রশ্নের স্বপক্ষে উত্তর দিবামাত্র, তিনি পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট শকটে মোক্ষদা ও কুমারনাথকে উঠিতে বলিলেন, নিজেও উঠিলেন। সন্ন্যাসী-পরিরক্ষিত দেখিয়া পাণ্ডারা যাত্রীর নিকটে আসিল না। মোক্ষদা অতি কুণ্ঠিত ভাবে একদিকে জড়সড় হইয়া বসিল। কুমারনাথ ও সন্ন্যাসী অপর দিকে বসিলেন।

মোক্ষদা অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্ন্যাসীর আশ্রমে পিতৃসন্নিধানে নীত হইল। মোক্ষদা ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে দৃষ্ট পিতৃমূর্ত্তি দেখিয়া চিনিতে পারিল, দীর্ঘকালের যন্ত্রণাভোগে তিক্ত-জীবনের বিষাদভার মস্তকে লইয়া পিতৃচরণে লুটাইয়া পড়িল। গোলকনাথ গৃহত্যাগের সময় যে বালিকাকে সোণার পুতুলের মত দেখিয়া আসিয়াছিলেন, আজ দীর্ঘজীবন-ব্যাপী দুঃখের দাবানলে পুড়িয়া সেই সোণার পুতুল খাঁটি সোণার তালে পরিণত হইয়াছে। গোলোকনাথ দেখিলেন, গড়নের উপযুক্ত এক অপূর্ব্ব উপকরণ তাঁহার চরণতলে শতদলে পরিণত হইয়া অবিরল অশ্রুজলে পিতৃচরণ ধৌত করিতেছে। কন্যার কোমল করস্পর্শে গোলোকনাথের গতজীবনের স্মৃতিটুকু হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। পুত্রসহ মহামায়ার লোকান্তর গমন, কন্যার শতবিধ নির্য্যাতন-ভোগ, পাগলিনীর ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ, আত্মরক্ষা ও আত্মবিসর্জ্জনের সংগ্রাম ও শতবিধ ক্লেশভোগ একে একে তাঁহার চিত্তপথে উদিত হইতে লাগিল। গোলোকনাথ ক্ষোভে ও দুঃখে ক্ষণকালের জন্য ম্লান হইলেন। দুই চক্ষে দুই ফোটা শোকাশ্রু দেখা দিল। আশ্রয়প্রার্থিনী মোক্ষদার মলিন মুখে মাতৃ-বিয়োগ, সহোদরের অকাল-মৃত্যু, নিজ বৈধব্য, কুটীল সংসারের স্বার্থ-সাধন-চেষ্টার ফলে রত্নসম পুত্রধন হইতে বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদির রোমাঞ্চ-

কর বিবরণ শ্রবণ করিতে করিতে গোলোকনাথের হৃদয় আর্দ্র হইল, নয়নপ্রান্তে মিলিত জলকণা ধারায় পরিণত হইল। শিষ্যেরা দেখিল, গুরুদেব দীর্ঘ সাধনার বলে, বেদ-বেদান্তের আলোচনার ফলে, পুরাণাদি অসংখ্য শাস্ত্র-গ্রন্থের সার সঙ্কলনকালে যে দৃঢ়তা, যে মহাভাবের বিচিত্র বিন্যাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার যে অসামান্য চরিত্র-শোভা দর্শনে শত শত জনে সর্ব্বদা সাধুবাদ করিয়া থাকে, আজ নিজ শোণিতজাত কন্যার কাতরতায় সে আদর্শ-চরিত্রের পর্ব্বত গাত্রে ভূমিকম্প হইল। বেদাচার্য্য সে বেগ অনুভব করিলেন,— শঙ্করের শাসনে যে হৃদয় গড়িয়া উঠিয়াছে, সে হৃদয় আজ আচার্য্যের আসন ত্যাগ করিয়া স্নেহকোমল পিতৃদেব সাজিয়া স্নেহের পুত্তলি কন্যারত্ন অন্নপূর্ণাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিল। আচার্য্য স্নেহভরে পুনঃ পুনঃ কন্যার অশ্রুজল মুছাইয়া দিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষদার শোকাবেগ ভাগীরথী-ধারায় পরিণত হইয়া বর্ষার বেগে প্রবাহিত হইতেছে। সকলেই দেখিল, সকলেই অনুভব করিল, গিরিরাজ-ক্রোড়ে যেন পার্ব্বতী আসন গ্রহণ করিয়াছেন, আর সেই কন্যার নয়নকমল বিদীর্ণ করিয়া গঙ্গা-যমুনা-ধারা প্রবাহিত হইতেছে! সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! দেখিয়া বেদাচার্য্যের শিষ্যমণ্ডলী পুলকপূর্ণ স্তম্ভিতভাবে পলকশূন্য দৃষ্টিতে সে শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ উদ্বেলিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কি সুন্দর!

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হরিদ্বারে

বৈদ্যনাথ কৃষ্ণেন্দ্র বাবুর সঙ্গে তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। কুষ্টিয়ার বাড়ীখানি চূড়ামণি ও তাহার পুত্রকে দান করিয়া, সঞ্চিত অর্থের অনেকাংশ নানা কার্য্যে দান করিয়া এবং নিজের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ ব্যক্তিবিশেষের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তিনি তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন। সংসারের ক্রোড়ে আর ফিরিয়া আসিবার বাসনা তাঁহার প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি শেষ জীবন তীর্থে তীর্থে, না হয়, অনুকূল হইলে, কোন বিশেষ স্থানে, কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবেন। বারিধারা-বিক্ষিপ্ত গড়ুইএর নীল জলে নীল পদ্মে নীলকান্ত মণি দেখিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখনও তাঁহার হৃদয়াকাশের কুয়াসা কাটিয়া যায় নাই, তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু কি করিবেন, কোন্ পথের পথিক হইবেন, তাহা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। শূন্য হৃদয়ের মহাশূন্যতার পরিপূরণ সম্বন্ধে এখনও কোন পন্থা তাঁহার সম্মুখে দেখা দেয় নাই। কেবল ব্যাকুলতা সম্বল লইয়া তিনি এই নূতন পথের পথিক হইলেন। বৈদ্যনাথের জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনারাজির ক্রমবিকাশ সময়-সাপেক্ষ।

গয়া ও প্রয়াগ পরিভ্রমণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া প্রায় মাসাধিক কাল নানা ক্লেশভোগের পর বৈদ্যনাথ হরিদ্বারে পৌছিয়াছেন। বৈদ্য-নাথের বিদ্যা নাই, জ্ঞানেরও বিশেষ কিছু একটা উচ্চ পরিচয়ের লক্ষণ নাই। সামান্য বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন বৈদ্যনাথ নিজের দীর্ঘ জীবনে জ্ঞাতসারে সহৃদয়তার পরিচয় দিবার ও তদ্দ্বারা প্রতিবেশীমণ্ডলীর মধ্যে হৃদয়বান্

পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবার সুযোগ কখন পান নাই; পাইলেও গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং ভদ্রসন্তান হইলেও বৈদ্যনাথ হীনজীব; হীনজীবের হিংসা, প্রতিহিংসা, কাম, ক্রোধ, লোক-দলন ও অর্থোপার্জ্জন ইত্যাদি বিষয়েই বেশ পটু ছিলেন। জীবনে ও চরিত্রে উচ্চ চিত্র অঙ্কিত হইতে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন, বৈদ্যনাথকে সেগুলির প্রত্যেকটীই সাধনার দ্বারা অর্জ্জন করিতে হইবে, তবে তাঁহার জীবনে পরম বস্তুলাভের যোগ্য কর্ষিত-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে। বৈদ্যনাথ এক্ষণে মানব-সমাজের প্রান্তবর্ত্তী ওকড়াবন মাত্র। এ জীবনের উদ্ধার-সাধনের জন্য যে সাধনার প্রয়োজন, তাহা অতি কঠিন তপস্যালভ্য। এইরূপ অবস্থাপন্ন বৈদ্যনাথ হরিদ্বারের শান্তরসাস্পদ নির্জ্জনতা উপভোগ করিবার অনধিকারী। কিন্তু এই নির্লিপ্ত নীরব শান্ত ভাবই বৈদ্যনাথের ন্যায় রসশূন্য ব্যক্তির হৃদয়ে রসের সঞ্চার করিবার সম্যক্ উপযোগী।

সদ্যপ্রসূত শিশুর নয়নযুগল যেমন সূর্য্যালোক সহ্য করিতে পারে না, বৎসরাধিক বয়স্ক শিশু, দন্তোদ্গম হইতে না হইতে যেমন কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ করিবার শক্তি ধারণ করে না, কিশোরীর প্রথম যৌবন সমাগমে যেমন সে বালিকা সন্তান-ধারণে সক্ষম হয় না, তেমনি কেবল ব্যাকুলতা ধর্ম্মলাভের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে, কিন্তু যথেষ্ট নহে; বিশেষতঃ শান্তচিত্ত হইয়া দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসসম্বলিত উচ্চ ধর্ম্ম লাভের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। হৃদয় ব্যাকুল হইলে, মানুষ কেবল শান্তিলাভের অধিকারী। কিন্তু হৃদয় শান্ত হইলেই, ধ্যান-ধারণার উপযোগী ভাব হৃদয়ে স্থান পাইলেই, যাহারা নিশ্চিন্ত হয়, তাহাদের আর ধর্ম্মলাভ ঘটে না। তাহারা ধর্ম্মজীবনের নিম্ন-গ্রামেই থাকিয়া যায়। ভগবদ্দর্শনরূপ অমূল্য সম্পদ—এ মর্ত্ত্য-জগতের দুর্লভ ধন লাভে তাহারা চিরবঞ্চিত থাকিয়া যায়।

তাই যাহারা বৈদ্যনাথের ন্যায় সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে যায়, হরিদ্বার তাহাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রথম বাসস্থান। "এই খানেই মানবহৃদয়ে শান্তির সূত্রপাত হয়," কৃষ্ণেন্দ্র বাবু এই কথা কয়টী বলিবামাত্র কৌতুহলাবিষ্ট বৈদ্যনাথ বলিলেন—"কেন হয় ?"

কৃ। "কেন হয়," তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইয়া বলা আমার সাধ্য নহে, তবে সামান্য যাহা কিছু বুঝি তাহাতে বোধ হয়, ভগবানের অপূর্ব্ব লীলার আভাস এখানেই সর্ব্বপ্রথম অনুভূত হয়। সম্মুখের দিকে দূরে বিশালকায় হিমালয় গগন ভেদ কবিয়া উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিয়াছেন। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে এরূপ উচ্চতা আর কোথাও নাই। অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শিখর অনন্ত গগন স্পর্শ করিয়া মানবহৃদয়ে অনন্ত ভগবানকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিতেছে। যে ভাগীরথী-ধারী ধরাস্পর্শে সমল হইয়াও দেশে দেশে পুণ্য ও কল্যাণ বিতরণ করিতেছেন, তিনি এখানে কেমন স্বচ্ছ, সুন্দর, তরল ধারায় প্রবাহিত হইয়া মানবের হৃদয়ের মূলে পবিত্রতার ইঙ্গিত করিতেছেন। এই জল-প্রবাহের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যেমন নয়নগোচর হইতেছে, মানুষের প্রাণের মর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত যখন সাধনবলে এইরূপ স্বচ্ছ সুন্দর ভাব ধারণ করিবে, তখনই সে হৃদয় ধর্ম্ম-লাভের উপযুক্ত হইবে। হরিদ্বার এই দুই উচ্চ আদর্শ মানব-সমক্ষে ধরিয়া যাত্রি-গণের জীবনগত কর্ম্মফল খণ্ডনে ও মোক্ষ-লাভে সহায়তা করিতেছেন। আর এক কথা, এই পবিত্র তীর্থস্থানের নাম বৈষ্ণবের নিকট "হরিদ্বার," আর শাক্তের নিকট "হর-দোয়ার"। তাই ইহা হরি-হরের মিলন-স্থান বলিয়াও সকল হিন্দুরই পরম তীর্থ। ইহার অনতিদূরে ঐ দেখুন কনখল দেখা যায়। কনখলে থাকিবার স্থান আছে, কিন্তু এখানে নাই। ইহারও তাৎপর্য্য আছে। এখানে স্থায়ীভাবে কেহই বাস করেন না। জন-সমাগম-জাত বিষয়কোলাহল এখানে নাই, এখানকার স্থির গম্ভীর ভাব কেবল ভোগের বস্তু। যাঁহারা ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে

এখানে সাধন করেন, তাঁহারা কনখলে রাত্রি যাপন করেন। এখানে কেবল নিয়ত তপশ্চরণনিরত—দিবারাত্রির জ্ঞানবিরহিত ব্যক্তিই সমান ভাবে বসিয়া ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকেন। এরূপ লোকের সংখ্যাও অতি অল্প। আপনি এই গঙ্গাজলে স্নান করিয়া চিত্ত বিশুদ্ধ করুন ও ভগবদ্-চিন্তায় রত হউন, তাহা হইলে আপনি ত্বরায় তিন জনের দেখা পাইবেন।

বৈ। তিন জন কে কে?

কৃ। তাহা ত ঠিক জানি না। শাস্ত্রে বলে, সাধুমুখেও শুনিয়াছি, তিন জনের মিলন না হইলে, তিন জন একত্র না হইলে, তিন জনের আলিঙ্গনপাশে তিন জন আবদ্ধ না হইলে, মোক্ষলাভ হয় না। সেই তিন জন কে কে, সাধন-পথে অগ্রসর হইলে আপনা-আপনি তাহা প্রকাশ পাইবে।

বৈ। আপনি সাধন-পথে অগ্রসর হওয়ার কথা বলিতেছেন। কার সাধন, আর কেমন করিয়াই বা করিব, তাহা ত জানি না।

কৃ। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া কাঁদে, সে কি জানে কেন কাঁদে? কান্না তাহার কার্য্য তাই সে কাঁদে। আর শুনিবার কার্য্য যাঁহার তিনি শুনেন ও ব্যবস্থা করেন।

বৈ। মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হইয়া শিশু কাঁদে, আমি প্রসূত না হইয়াই কাঁদিব কেমন করিয়া? আমার মনে হয়, আমি এখনও সংসার-কারাগাররূপ মাতৃগর্ভের অন্ধকারেই বাস করিতেছি। শিশু ত সংসারের আলোক দেখিয়া ও বন্ধনমুক্ত হইয়া হাত পা মেলিবার অবস্থা অনুভব করিয়া কাঁদিয়া উঠে। আমার ত সে অবস্থাবোধ এখনও জন্মায় নাই। আমার গতি কি হবে?

কৃ। অপেক্ষা করুন, স্বভাবের কার্য্য আপনা-আপনি হইবে। আপনি যখন এতদূর আসিয়াছেন, তখন অবশ্যই আপনার অভিষ্টসিদ্ধ হইবে। ঐ শৈল-শিখরসকল যেমন মর্ত্ত্যমণ্ডলের মেঘমালা অতিক্রম

করিয়া অত্যুচ্চ গগনপথে অগ্রসর হইয়া আপনার সার্থকতা সাধন করিতেছে, ঠিক সেইরূপ আপনারও বিঘ্ন-বিপত্তি কাটিয়া যাইবে। আপনি এই পূত সলিল-স্রোতে স্নান করিয়া মঙ্গলময় ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া এখানেই অপেক্ষা করুন, ক্রমে মনের ময়লা কাটিয়া যাইবে, জীবনের পথ দেখিতে পাইবেন; উত্তম সঙ্গ মিলিবে, তখন একে তিন ও তিনে এক পরম বস্তু-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনি ধন্য হইবেন। আপনি আপাততঃ এখানেই অবস্থিতি করুন। হরিদ্বারে দিনযাপন ও কনখলে রাত্রিযাপন করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইতে থাকুন। তত্ত্বপথে একটু অগ্রসর না হইয়া আপনি এ স্থান ত্যাগ করিবেন না। আমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া আপনার সংবাদ লইব।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরিণাম-সমস্যায়

আজ মালতীর মায়ের হৃদয় মনে আনন্দের তুফান উঠিয়াছে। গৃহিণী স্বীপ্রহস্তে সংসারের সমস্ত কাজ শেষ করিয়া স্নানান্তে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া চিত্তরঞ্জন ও হরিনাথকে আহারে বসাইলেন। চিত্তরঞ্জন পূর্ব্বস্মৃতি নিবন্ধন মালতীর সঙ্গে একত্র আহারের কথা স্মরণ করিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইবা মাত্র মালতীর মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "সে এখন আর আট বছুরে খুকী নয়, সে বড় হ'য়েছে, সে কি আর এখন তোমার সঙ্গে খেতে বস্‌বে? সে আমার সঙ্গে খাবে, তুমি তোমার দাদা মশায়ের সঙ্গে খেতে ব'সো।" চিত্তরঞ্জন নতমস্তকে মাতৃ-আদেশ

পালনে অগ্রসর হইল। মালতী পাকশালার দ্বারের অন্তরালে দণ্ডায়মান। হরিনাথ আহারে বসিয়া বলিলেন, "ভুবন! তোমার মেয়ে কি তবে আমার ভায়ার সঙ্গে এক পাতে খেয়েছে? তা হ'লে ত ওর জাত গিয়েছে।" গৃহিণী বলিলেন, মেয়ে যখন আট বছরের, তখন বার তের বছরের ছেলে আমার ঘরে এসেছিল; ছেলেটা এত ভাল যে নিজেদের ঘরের ছেলে হয়ে গেল। তারপর প্রতিপালনে ছেলেমেয়েতে এক তিল প্রভেদ ছিল না। কাজেই এক সঙ্গে নাওয়া খাওয়া সবই হয়েছে।" হরিনাথ বলিলেন, "তবে ওর জাত গিয়েছে।"

চুপ করিয়া থাকা মালতীর স্বভাব নহে, সে অমনি দরজার পশ্চাৎ হইতে বলিল, "গিয়ে থাকে গিয়েছে।" হরিনাথ বলিলেন, "দিদিমণি, আমারও জাতটা খেলে!" মালতী পুনরায় বলিল, "বেশ হয়েছে।"

চিত্তরঞ্জন দীর্ঘকাল পরে আজ আবার সেই ঝগড়ার ঝঙ্কারপূর্ণ এই সুখের সংসারে আহারে বসিয়াছে, আজ আবার নূতন করিয়া সমস্ত সংসারটা মধুমিষ্ট বলিয়া অনুভব করিতেছে। আজ দীর্ঘকাল সে যুবক যে মালতীর পরিণামচিন্তায় পলে পলে ক্ষণে ক্ষণে সংসারটা অরণ্য বলিয়া অনুভব করিয়াছে, এই শোভা ও সৌন্দর্য্যভরা ধরা শূন্য বলিয়া অনুভব করিয়াছে—আজ আবার সেই ধরা সেই সংসারের অমৃতসেচনে সিক্ত হইয়া চিত্তরঞ্জন রক্তিমাভ মুখ নত করিয়া আহার করিতেছে। আহারের শেষভাগে চিত্তরঞ্জনের চক্ষের জলে ভোজনপাত্র ক্রমশঃ সিক্ত হইতেছে দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "বাবা, আজ আর চোখের জল ফেলিও না। কত যে কাঁদিয়াছি, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। আজ আর কেঁদ না।" এই কথা কয়টী গৃহিণীর মুখে উচ্চারিত হইতে না হইতে চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ের আবেগ প্রবলতর হইয়া উঠিল। সে যুবক উচ্চরবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা! আজ যাঁকে দেখ্‌তে পেলে, আমার কান্নাটা

সুখের কান্না হ'তো তিনি কোথায়? তিনি যে আমার জন্য অনেক ক্লেশ ভোগ ক'রেছিলেন। আমি যে সংসারে তাঁকে হারাইয়া পিতৃহীন হইয়াছি। তিনি কোথায়, আজ তাঁকে ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা হচ্চে, আপনি এসে দেখে যান্ আমি এসেছি।" এই আক্ষেপোক্তি শ্রবণে সকলের চক্ষে জলধারা দেখা দিল। আনন্দের তীব্র বিজলালীলা বিরহের ঘন মেঘের অন্তরালে লুকাইল। সকলেই নীরব।

হরিনাথ অপরাহ্নে চিত্তরঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া সহরের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার সময়ে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতি দেখিতে গেলেন। সে এক সুবৃহৎ সমারোহ। এ বিশাল সৃষ্টিরাজ্যে, মর্ত্ত্যমণ্ডল এক অতি ক্ষুদ্র বর্ত্তুলমাত্র। এ বিশ্ববিচিত্রতার মাঝখানে এই ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য সংসারে আবার মানুষ সম্পদ-সম্ভ্রমে আত্মহারা হইয়া কতই না অন্যায় কাজ করে! আবার কত মানবশিশু জীবন-যৌবন, সুখ-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করিয়া ধন্য হয়। আজ চিত্তরঞ্জন অসংখ্য সাধুভক্তের সমাগমে দেবালয় পূর্ণ দেখিয়া পুলকপূর্ণ হৃদয়ে বার বার মস্তক নত করিয়া দেবতাকে স্মরণ করিতেছে, আর অগণিত ধর্ম্মাত্মার সমাগমে আনন্দ অনুভব করিতেছে। সে "হর হর ব্যোম্ ব্যোম্" শব্দে চারিদিক নিনাদিত শুনিয়া চিত্তরঞ্জনের মনে হইল, স্বয়ং বিশ্বেশ্বর যেন ভক্তের আদর-আপ্যায়নে, স্তব বন্দনায় তুষ্ট হইয়া স্বশরীরে সেখানে প্রকাশিত। কি এক মনমাতান ভাবে সে স্থান পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা অতীত হইতেছে, এমন সময়ে হরিনাথ বলিলেন, "ভায়া, চল আমরা যাই, অন্য দিন বরং আরও অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে।"

বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে বাহির হইবার সময়ে সহসা একদল সন্ন্যাসীর সম্মুখে পড়িয়া চিত্তরঞ্জনের মনে হইল যেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ আপনার জন আছেন। এই সুদীর্ঘ কুড়িটী বৎসরের মধ্যে এমন একটা ভাব কখনও তার মনে স্থান পায় নাই। বালক, সংসারে শতবিধ দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে

সংগ্রাম করিতে করিতে, সময়ে সময়ে সজ্জনের স্নেহমমতায় স্বজনের ছায়াপাত অনুভব করিয়াছে সত্য, কিন্তু শোণিতসম্পর্কে আপনার জন অনুভব করার যে একটা স্বতন্ত্র সুখ, সে কখনও তাহার আস্বাদন পায় নাই। যে ব্যক্তি সংসারে তাহা ভোগ করে, সে তাহার মূল্য জানে না, সংসারে অনেকে সেটাকে মূল্যহীন কাচখণ্ডের ন্যায় উপেক্ষাও করে, কিন্তু সে বস্তুর মূল্য, সে সম্বন্ধের মধুরতা, সে স্বর্গীয় অধিকারপাশে আবদ্ধ হওয়ার সুখ ও আনন্দ চিত্তরঞ্জনের মত সর্ব্বসম্বন্ধচ্যুত যুবকের পক্ষে যে কি মহামূল্য সম্পদ, তাহা অন্যে বুঝিবে না। সে সর্ব্বদাই মনে করে, এরূপ ভাবে শোণিত-সম্পর্ক-সঙ্গ-চ্যুত না হইলে হয়ত তাহার সংসার-জীবনের সূচনা ইহা অপেক্ষা শত শত গুণে উত্তমতর হইত, কিন্তু হায়, মানুষ বুঝে না যে, এ সংসারে সমস্তটাই প্রত্যেক ব্যক্তির "অদৃষ্ট-লিপি"র ফল। এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ই যে তাহার জীবনের স্বার্থকতার মেরুদণ্ড তাহা সে বুঝে না, ইহাই তাহার সৌভাগ্য।

বারাকপুরের বারাণসী ঘোষের ঘাটে ঘনমেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার অন্ধকারে বিদ্যুতালোকে ঝলসিত হৃদয়পটে আলোক-গোলকে যে "বেদাচার্য্য নাম, বারাণসী ধাম" দর্শন করিয়া স্তম্ভিত ও ভীত হইয়াছিল, আজ মন্দির-প্রাঙ্গনে সাধুমণ্ডলে সেই মূর্ত্তির অনুরূপ এক মহাত্মাকে দেখিয়া চিত্তরঞ্জন অবসন্ন হৃদয়ে বসিয়া পড়িল। উৎসাহ ও উদ্যম-সহকারে অগ্রসর হইবার শক্তি হারাইল। হরিনাথ ব্যস্ত হইয়া নিকটে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় চিত্তরঞ্জন বলিল, "আমার চরণ চলিতে নারে, নয়ন দেখ্‌তে চায়। আমার জীবনের সর্ব্বস্ব যেন ঐ সন্ন্যাসী-দল অপহরণ করিয়া লইয়া গেলেন বলিয়া মনে হইতেছে। ঐ দলে আমার কেহ আছেন বলিয়া আমার মনে হইতেছে।" হরিনাথ বলিলেন, "চল চল, উঠ, অগ্রসর হইয়া দেখিগে, আমিও ত তাই চাই।" চিত্ত-রঞ্জনের সবল ও সুস্থ শরীরে সহসা এমন অবসন্নতা আসিল যে সে

উঠিয়া অগ্রসর হইতে না হইতে সন্ন্যাসীদল অদৃশ্য হইলেন। অন্ধকার ঘনতর হইয়া চিত্তরঞ্জনের হৃদয় অধিকার করিল।

দুই জনেই নীরবে গৃহে উপস্থিত হইলেন। উভয়ের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মালতীর মা বলিলেন, "কাকা তোমাদের দেখে বোধ হ'চ্চে যেন, কিছু হয়েছে।"

হ। মা লক্ষ্মি! যে জন্য এত ব্যস্ততা, তাহার অর্দ্ধেকের অধিকটা তোমার ঘরে, বাকিটা পেতে পেতে হারাইয়া গেল। ছেলেটার দোষেই হ'লো।

গৃ। কি হ'য়েছে?

চি। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতি দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। বাহিরে আসবার সময়ে একদল সন্ন্যাসীর মধ্যে একজনকে যেন আমার আত্মীয় বলে বোধ হ'লো। আপনি ত জানেন আমার পরিচয় সংগ্রহ করবার জন্য বাবা কত চেষ্টা ক'রেছিলেন। আমার আত্মীয় সম্ভাবনায় আমার মনটা কেমন অবশ হ'য়ে পড়্‌ল, আমিও বসে পড়্‌লুম। তাঁহাদিগকে ধরি ধরি ক'রে ধরা গেল না। এমন সুযোগ হাতছাড়া হ'লো, দাদা-মশাই সেই কথা বল্‌ছিলেন।

গৃ। আচ্ছা, আজ হয় নি কাল হবে, কাল না হয় পরশু হবে। এখানে ঠাকুরবাড়ীতে চৌকীদারী করিলে, সন্ধান পেতে বড় বেশী সময় লাগ্‌বে না?

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বেদাচার্য্যের আশ্রমে

কুমারনাথ বেদাচার্য্যের আশ্রমে অতিথি। অতিথির পরিচর্য্যা আশ্রমের প্রধান ধর্ম্ম। সংসারবন্ধনমুক্ত ধর্ম্মাচরণানুরক্ত সাধুদিগের মধ্যেও সেবাধর্ম্মের অভাব নাই। ইহারা যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, অভ্যাগতের পরিচর্য্যায় সর্ব্বদাই তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন। কুমারনাথ প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত এই আশ্রমের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শনে ও তাঁহার প্রীতিবিধানে যেন আশ্রমের সকলেই নিযুক্ত। কুমারনাথ সমস্ত দিনের সমগ্র ব্যাপারটা একটা শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া চলিয়া গেল বলিয়া অনুভব করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহ কাহাকেও কোন কার্য্য করিতে আদেশ করিল না। যেন সমস্তটা কলে হইয়া গেল; অথবা যেমন দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন আপনি আসে, আপনি যায়, ঠিক সেইরূপ আপনা-আপনি হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর সকলে ভগবান বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলে পর আশ্রমস্বামী কুমারনাথের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। সে কথাবার্ত্তার পশ্চাতে শীলতা ও স্নেহ-মমতার পরিচয় পাইয়া কুমারনাথ নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। বেদাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমার নাম কি?" কুমারনাথ নিজ পরিচয় দিবামাত্র আচার্য্য পুনরায় বলিলেন, "নিবাস কি কৃষ্ণনগরেই?"

কু। আজ্ঞে না। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কয়া গ্রামে। কয়া কুমারখালির নিকট।

বে। পিতৃপরিচয় ইত্যাদি বল।

কুমারনাথ যথাবিধি পিতৃপিতামহ ইত্যাদির পরিচয় দিয়া আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

বে। বংশপরিচয় বল?

এইবার কুমারনাথ কেবল ভরদ্বাজ গোত্র বলিয়াই নীরব হইলেন। কোন্ গাঁই, কোন্ মেল ইত্যাদির কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।

বে। এর বেশী কিছু জানা নাই?

কু। আজ্ঞে না।

বে। কেন?

কু। আজ্ঞে অল্প বয়স হইতে কৃষ্ণনগরে বাসায় থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতে হইয়াছে, তাই কুলপরিচয় ইত্যাদি যথারীতি শিক্ষার সুযোগ হয় নাই।

বে। এখনকার শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের কি সকলেরই এইরূপ অবস্থা, না তোমারই এইরূপ ঘটিয়া গিয়াছে?

কু। সকলের না হইলেও, আমার বোধ হয়, অধিকাংশেরই এইরূপ।

বে। তাহা হইলে, বঙ্গদেশ ত ক্রমশঃ বংশপরিচয়ে হীন হইয়া পড়িবে?

কু। সম্ভব।

বে। তোমার পিতা বর্ত্তমান, তিনি ত এ সকল বিষয় বেশ জানেন।

কু। তিনি প্রাচীন তন্ত্রের লোক। গৃহে গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠিত, তিনি নিত্য নিয়মিত পূজা আহ্নিক ও দেবার্চ্চনাশেষে জলগ্রহণ করেন।

বে। আর তোমরা?

এইবার কুমারনাথ নির্ব্বাক, কি উত্তর দিবেন! উপনয়নের পর কয়েকদিন ব্রহ্মচারীরূপে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিয়াছিলেন, শিবপূজা, নারায়ণের পূজার মন্ত্রও শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল জজ আদালতের দেবতার পূজার জন্য পেনাল কোড্, ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড্, রেণ্ট ল ইত্যাদির বিশাল বন্যামুখে সেই শিবের ধ্যান নারায়ণের স্তববন্দনা ও সন্ধ্যা-আহ্নিক ভাসিয়া গিয়াছে। আছে কেবল গায়ত্রীর বাক্য কয়টী, তাও অশুদ্ধ উচ্চারণদুষ্ট।

বে। বৎস! নতমস্তকে নির্ব্বাক হইয়া রহিলে কেন?

কু। আজ্ঞে, আর লজ্জা দিবেন না, আপনার নিকট সত্য বলিতে হইবে; আমরা এ সকলের কিছুই করি না।

বে। কেন কর না?

কু। এ সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন বোধ চলিয়া যাইতেছে।

বে। কেন যাইতেছে?

কু। ইংরাজী শিক্ষার ফলে।

বে। ইংরাজী শিক্ষা কি এই সকল ত্যাগ করিতে বলে?

কু। আজ্ঞে না, স্পষ্ট কিছু বলে না, কিন্তু সে শিক্ষার ফলে আপনা-আপনি এ দেশের প্রাচীন সংস্কার সকল ভাসিয়া যাইতেছে।

বে। দায়ী কে? ইংরাজী শিক্ষা, না এ দেশের শিক্ষিত সমাজ?

কু। আজ্ঞে, আমরা নিজেরাই এই অধঃপতনের জন্য দায়ী।

বে। তবে সংশোধন কর।

কু। আজ্ঞে, ক্ষমা করুন, এবার বাড়ী গিয়া সর্ব্বাগ্রে ইহার প্রতিকার করিব।

বে। কি প্রতিকার করিবে?

কু। পরিত্যক্ত পদ্ধতিগুলি পুনরায় গ্রহণ করিব।

বে। বিনা বিচারে গ্রহণ করিবে? তাতে কি ফল হইবে? বৎস!

তুমি আদালতে ওকালতী কর; কোথাও শুনেছ কি, আদালতের বিচারক বিনা বিচারে কখন দণ্ডের ব্যবস্থা করেন ?

কু। আজ্ঞে না। আমিও বিনা বিচারে ত্যাগ করিয়া অন্যায় করিয়াছি, বিনা বিচারে পুনরায় গ্রহণ করিয়া পরে রাখা ও পরিত্যাগ করার বিচারে প্রবৃত্ত হইব। আমায় ক্ষমা করুন।

বে। তোমার মুখে, তোমার ও তোমার মত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অবস্থা অবগত হইয়া বুঝিলাম, বাঙ্গালাদেশে সামাজিক ধর্ম্মের বিলোপসাধন সহজ হইয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজে ব্যক্তিগত আচরণ ও চরিত্রমর্য্যাদার জ্ঞানও হীন হইয়াছে। তাহা না হইলে, তুমি প্রাচীন তন্ত্রের উত্তম পিতার পুত্র হইয়া আশ্রিতার প্রতি অত্যাচারে সাহসী হইতে না। যাহা হউক, সে বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা তোমার ক্ষোভ ও লজ্জা উৎপাদন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার উপস্থিত বক্তব্য এই যে, তুমি শিক্ষিত, গৃহস্থ ও সামাজিক, তোমার প্রতি এই অনুরোধ যে আমার এই কন্যা কি অবস্থায় কিরূপে তোমার শ্বশুরালয় হইতে তাড়িত হইয়া পথে পথে ঘুরিয়াছে, তাহার ঠিক ঠিক সংবাদ আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। এ বিষয়ে কেবল তোমারই যত্ন চেষ্টা সফল হইবার কথা। তুমি যাহার প্রতি অত্যাচারে উদ্যত হইয়াছিলে, এক্ষণে তাহার মর্য্যাদা-রক্ষায় সহায়তা করিয়া তোমার ইতরানুষ্ঠানের প্রায়শ্চিত্ত কর। কেমন বৎস! এই কাজটুকু করিবে কি ?

কু। আপনার কন্যা আমার শ্যালক-পত্নী সে বিষয়ে আপনি কি একবারে নিঃসন্দেহ ?

বে। সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কু। আমার উপর এরূপ একটা অপ্রিয় কার্য্যের গুরুভার চাপাইয়া আমাকে বিপন্ন করিবেন ?

বে। এ বিষয়ে ঠিক সত্য ঘটনার উদ্ধারসাধনে, তোমার বিনা বাক্যব্যয়ে, সম্মত হওয়া উচিত ছিল। এই কাজের ভারগ্রহণ অপ্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আমার কন্যার মর্য্যাদাহরণ চেষ্টা অন্যায় বলিয়া বোধ হয় নাই। আশ্চর্য্য বটে! এটাই কি বর্ত্তমান শিক্ষার উত্তম ফল?

কুমারনাথ অধোবদনে ক্ষণকাল নীরবে অপেক্ষা করিয়া বেদাচার্য্যের দিকে কাতর দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আচার্য্য বলিলেন, "বৎস! তোমার পাপক্ষয় ও শরীর মনের স্বাভাবিক শক্তি অর্জ্জন এই প্রায়শ্চিত্তের উপর নির্ভর করিতেছে। আত্মীয়বোধে ইহার প্রণষ্ট মর্য্যাদার পুনপ্রতিষ্ঠাই তোমার ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অন্যের মুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না। যদি নিজ মঙ্গল চাও, অবশ্যই এ কার্য্যে অগ্রসর হইবে।"

কুমারনাথ বলিলেন, "আপনার বাক্য শিরোধার্য্য।"

বে। কত দিনে তোমার অনুসন্ধান ও তাহার ফলাফল নির্দ্দেশ করা শেষ হইবে?

কু। যত শীঘ্র সম্ভব, আমি এ কার্য্য সম্পন্ন করিব।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন সমস্যায়

পরদিন প্রাতঃকালে, চিত্তরঞ্জন বৃদ্ধ হরিনাথের সহিত গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া বাসায় ফিরিবামাত্র, পোষ্ট আফিসের পিয়ন একখানি রেজিষ্টারী চিঠি চিত্তরঞ্জনের হাতে দিল। চিত্তরঞ্জন পত্র পাঠ করিয়া এক নূতনতর হর্ষ-বিষাদ- বিমিশ্রিত অবসাদভারে আক্রান্ত হইয়া পড়িল।

সুম্‌না চা-বাগানের বড় কেরাণী বাবুর পত্র। পত্রের কথা এই যে, "এই পত্র হস্তগত হইবামাত্র একবার অন্ততঃ অল্প কয়েকদিনের জন্য এখানে আসিতেই হইবে। বিশেষ প্রয়োজন। তুমি এখানে আসিয়া পৌছিলে পর, ম্যানেজার সাহেব কলিকাতায় যাইবেন। তাঁহার না গেলেই নয়। যে মেম-সাহেবের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব বহু দিন হইতে স্থির হইয়া রহিয়াছে, সেই পাত্রী তাঁহার সহোদরের সঙ্গে অল্প দিনের মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিবেন। তাঁহার কলিকাতায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমাদের সাহেবকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে হইবে। সাহেব নিজেই পত্র লিখিতে গিয়া বিবিধ চিন্তায় বিব্রত হইয়া পত্র লেখা বন্ধ করিয়া আমাকে ডাকাইয়া নিকটে বসাইয়া নিজে এই পত্রখানি লিখাইলেন। এই সঙ্গে তোমারও একটা আশ্চর্য্য উপায়ে অনেকগুলি টাকা পাইবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সে টাকা আপাততঃ সাহেবের নিকটেই গচ্ছিত আছে।"

চিত্তরঞ্জন পত্র পাঠমাত্র আসাম-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। মালতী ও মালতীর মা বড়ই ব্যাকুল হইয়া কাঁদাকাটি করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ হরিনাথ প্রথমটা অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষে চিত্তরঞ্জনের

মুখের ভাব, মনের দৃঢ়তা ও কাজের ব্যবস্থা দেখিয়া অবাক্ দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন, এমন সময়ে সব কাজ গুছাইয়া চিত্তরঞ্জন বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া বলিল, "দাদা মহাশয়, এত দিন নিরুদ্দেশ ভাবে কাটিয়া গিয়াছে, তাতেও যখন সব বজায় আছে, তখন কয়টা দিন বিলম্ব করিলে, চলিবে না? অবশ্য চলিবে। আজ যে আমি বাঁচিয়া আছি, তাহা সেই চা-বাগানের বড় সাহেবের অযাচিত দয়ার ফল। তিনিও আমারই মত আত্মীয়-স্বজন-বিহীন। তাঁহার ক'নে আসিতেছে। তিনি কলিকাতায় বিবাহ করিতে যাইবেন। আমি না গেলে, যাওয়া হবে না। এমন অবস্থায় আমি কি বিলম্ব করিতে পারি?" তাহার পর মালতীকে শুনাইয়া শুনাইয়া মালতীর মাকে বলিল, "মা! আপনার হারাণ-ছেলে ফিরে এসেছে, আর ভাবিবেন না। বাড়ী থেকে বিদেশে যাওয়ার মত যাচ্চি। সাহেব কলিকাতা হইতে বি'য়ের পর ক'নে নিয়ে ফিরে এলেই, আমি চলিয়া আসিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। একটুও ভাব্‌বেন না। ভাতের বিলম্ব কত? আমাকে শীঘ্র খেতে দিন।"

মালতীর মা চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন, "না বাবা, তা হবে না। একবার ছেলে ছেড়ে দিয়ে একেবারে পাঁচ বৎসর নিরুদ্দেশ। আর আমি তোমাকে একলা ছেড়ে দেবো না। যদি একান্তই যেতে হয় ত, আমি সঙ্গে যাব।"

মায়ের মুখের ভাব দেখিয়া ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং মালতীমালার অবসাদাক্রান্ত মুখমণ্ডলে আশা ও আনন্দের রেখাপাত দেখিয়া চিত্তরঞ্জন প্রফুল্লমুখে হাসিতে হাসিতে বলিল, "চলুন, আমার সাহেব আমার সঙ্গে আপনার যাওয়ার সংবাদে আনন্দে আটখানা হইবেন, কিন্তু আপনার যাওয়া ত একেবারে অসম্ভব। আপনি আপনার কন্যাকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন?" তৎপরে ঈষৎ রক্তিমাভ মুখে,

সলজ্জ নতদৃষ্টিতে চিত্তরঞ্জন বলিল, "বৃদ্ধ দাদা মহাশয় কি আর একা আপনার ঐ দুরন্ত মেয়ের চৌকিদারী করিবেন? উনি কি পার্‌বেন?" বৃদ্ধ হরিনাথ বিগলিতদন্ত অধরওষ্ঠে হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া বলিলেন, "বা! ভুবন! তোমার হ'বো-জামাই কেবল ভালমানুষ নয়, বেশ ইয়ার ছোকরাও বটে। কথার ভামুরে আমার শুক্‌নো প্রাণে জোয়ার আসিল। ভাই, বেশ, বেশ, আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও। আমি কেন রাখ্‌তে পার্‌বো না? আচ্ছা ভাই! তুমি আজ চলিয়া গেলে পর, ঈশ্বর না করুন, যদি দৈবাৎ তোমার মায়ের একটা ভালমন্দ হয়, তা হ'লে কি আমি ঐ বাচ্ছাটাকে ভাসাইয়া দিব? না নিজে বি'য়ে কর্‌বো? তোমার ধন, তোমারই জন্য রক্ষা করিব না কি?"

চিত্তরঞ্জন অপ্রস্তুত হইয়া, বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং বলিল, "দেখুন, আমার সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষার সুযোগ ঘটে নাই! আমি সামাজিক আদব্‌কায়দাও ভাল জানি না, কেবল সহজ বুদ্ধিতে যা বুঝি, তাই ব'লেছি, আমার কথার দোষ ধরিবেন না। মাপ করুন।" তখন বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "রহস্য ছাড়িয়া দিলে, স্থির-চিত্তে ভাবিতে গেলে, তোমার কথাই উত্তম বুদ্ধির পরিচয় দেয়। তোমার সামাজিক শিক্ষা হয় নাই কে বলিবে? তুমি যাহা বলিলে, উহাই উত্তম আদর্শ। প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা পাত্রস্থা হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাতৃক্রোড়েই কেবল নিরাপদে বাস করিতে পারে। আর কোন আশ্রয়ই তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে। সুতরাং তুমি যাহা বলিয়াছ উহা বেদবাক্য।"

চিত্তরঞ্জন বিষণ্নমুখে বলিল, "তবে এখন উপায়?" মালতীর মা বলিলেন, "আমি বাবা, তোমাকে আর একলা ছাড়িয়া দিব না। তা কিছুতেই হবে না। কি কষ্টে যে দিন কাটিয়াছে তাহা আমার ই:দেবতা ভিন্ন কেহ বুঝিবেন না। আবার যে তোমাকে একা ছেড়ে দিয়ে, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পথপানে তাকাইয়া চক্ষের জল, আর

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে দিন কাটাইব, তা কিছুতেই হবে না। তোমার দাদামশাই পাঁজি দেখিয়া দিন ঠিক করিয়া দিন্, সেই দিনে তুমি যাত্রা করিবে, আর তুমি তোমার সাহেবকে তারে সংবাদ দাও যে, তুমি ঐ দিন যাত্রা করিবে। তাহা হইলে তোমার সাহেব নিশ্চিন্ত হইবেন; আর এদিকে কি করিলে ভাল হয়, আমরাও তাহা ভাবিবার সময় পাইব।"

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আসাম যাত্রা

আহারান্তে হরিনাথ পঞ্জিকা লইয়া বসিলেন। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন আগামী কল্য বেলা নয়টার পর আসাম যাত্রার পক্ষে অতি উত্তম সময়। গ্রহ নক্ষত্র অনুকূল, তাহার উপর ঐ সময়ে মাহেন্দ্র-যোগ, যাত্রাদি শুভ। বৃদ্ধ বলিলেন আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কল্যকার ঐ সময়ই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। অমন উত্তম যাত্রার কাল কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না। যাহা করিতে হইবে, ঐ সময় মধ্যে করাই চাই।

মালতীর মা বলিলেন, আচ্ছা কাকা, তুমি একটু বিশ্রাম কর। ছেলে একটা তার করিয়া দিয়া আসুক। আমি ততক্ষণ ঘরের কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া লই। পরে অপরাহ্নে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া একটা ঠিক করা যাবে। চিত্তরঞ্জন বলিল, "তারে কি বল্‌তে হবে? আমি একা যাব? না আপনি আমার সঙ্গে যাবেন? আপনার যাওয়া হ'লে, পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। না হ'লে বড় অসুবিধা হবে।" গৃহিণী বল্‌লেন, তবে ব'লে দাও, তোমার মা তোমার সঙ্গে যাবেন।"

চিত্তরঞ্জন টেলিগ্রাফ আফিসে চলিয়া গেল। হরিনাথ শয়ন করিলেন। মালতীর মা মালতীকে লইয়া কক্ষান্তরে আহারাদি ও অন্যান্য গৃহকর্ম্মের জন্য অগ্রসর হইলেন। মালতী সঙ্গে গেল। গৃহিণী আহারের আয়োজন করিতে করিতে কন্যাকে একাকী পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্, তোর দাদা মশাইয়ের কাছে মাসখানেক থাক্‌তে পার্‌বি ?"

মা। তোমাকে ছেড়ে ? তাও কি কখন সম্ভব ? একবারে অসম্ভব।

গৃ। সত্যিই যদি কাল আমি ম'রে যাই ? তাহ'লে কি হবে ? থাক্‌তে হবে না ?

মা। সে কথা স্বতন্ত্র। মরার বাড়া গাল নাই, এখনও ভাব্‌তে পারি না। মা ছেড়ে মেয়ে কি কখন থাক্‌তে পারে ?

গৃ। যে সব মেয়ের বি'য়ে হয়, তারা কি মাকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুর বাড়ী যায় ? ওর সঙ্গে তোর বি'য়ে হ'লে, মা ছেড়ে সেই চা বাগানে গিয়ে থাক্‌তে হবে না ?

মা। না, তা কেন থাকবো ? মায়ের কাছেই থাক্‌বো।

গৃ। (হাসিতে হাসিতে) ও সর্ব্বনাশি! তবে কি সে চাক্‌রি ছেড়ে তোর জন্যে এখানে এসে ব'সে থাক্‌বে নাকি ?

মালতী যুগল করে মায়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া আদুরে আব্‌দারে মাকে অভিভূত করিয়া বলিল, "না গো না, মা ঠাকরুণ! তা হবে না, হবে যা, তা আমার হাতে আছে।

গৃ। (সবিস্ময়ে) কি হবে ? তোর হাতে কি আছে, এই বেলা বল্, তা বুঝে আমি এ কাজে হাত দিই।

মা। কোন্ কাজে ?

গৃ। তোর বি'য়েতে।

মা। বি'য়েতে আবার হাত দেবে কি ? হাত ত দিয়েছ।

গৃ। হাত গু'টিয়ে নেবো।

মা। সে তোমার কর্ম্ম নয়। দাদা মশাই ত তোমার মেয়ে ভাস্'য়ে দেবার যোগাড়ে ছিলেন, তুমিও ত একবার যোগাড় করেছিলে, কই পার নি ত। তা হবে না, হবে না। এখন যা হবার আপনা আপনি হবে। আমি তুমি কে কোথায় কার কাছে থাক্‌বো, তোমার বিধাতা তাঁর ব্যবস্থা করিবেন, সেজন্য তোমার আর ভাব্‌তে হবে না।

গৃ। কেন সে কি তোকে কিছু ব'লেছে নাকি?

মালতী সলজ্জ মুখ নত করিয়া বলিল, "এখানে আসা অবধি আমার সঙ্গে একটি কথাও হয় নাই। আর হবেও না।

গৃ। কেন হবে না?

মা। কথার দরকার থাক্‌লেই কথা হয়। সত্যি কথা এই যে, আমি একদিনও তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বো না। যদি কিছু না পারি, তবে ঐ কাজটিই কেবল পার্‌বো না। এখন তুমি গেলে, আমাকে নিয়ে যেতে হয়।

গৃ। বাপ্‌রে, তা কি কখন হয়? আইবড়ো মেয়ে নিয়ে সম্পর্কহীন অবস্থায় কি এরূপ ভাবে যেতে আছে? নিন্দায় দেশ ভরে যাবে।

মা। তবে তুমি কেন যাবে? তুমি গেলে নিন্দা হবে না?

গৃ! না, হবে না। আর যদি হয়, তাতে যায় আসে না। কারণ সে আমার ছেলের মত। তাকে মেয়ে দেবো, পাছে হাত ছাড়া হয়, এই ভয়ে তার সঙ্গে যাচ্ছি। এর বেশী নিন্দা আমার হবে না।

মা। আচ্ছা তুমি আমি এখানে থাকি, আর দাদামশাই কেন সঙ্গে যান্ না?

গৃ! বুড়ো মানুষ, যেতে বল্‌তে ভয় হয়, আর নিতান্ত স্বার্থপর লোকের মত কথা হয়।

মা। কেন? অনেকবার তাঁরই মুখে শুনেছি গোহাটীতে তাঁর

কে আছেন, সে সংবাদ লইতেও তিনি অনেকবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছেন্ ত ?

গৃ। এই এতক্ষণ বকর্ বকর্ ক'রে, এইবার একটা কাজের কথা বলেছিস্। আচ্ছা কাকা উঠ্‌লে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, বেশ পরামর্শ, এইটাই সম্ভব বলে মনে হচ্চে।

বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করিয়া হাত মুখ ধুইলেন, তাহার পর ভ্রাতষ্পুত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভুবন ! কি স্থির করিলে ?

গৃ। কাকা তুমি কি এ বয়সে কাশী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে কয়েক দিনের জন্য যাইতে পার ?

হ। এই বালকের অনুসন্ধানের জন্য পূর্ব্বে কত সময়ে আমার মনে হইয়াছে "একবার যাই", কিন্তু সাহসে কুলায় নাই। বিশেষতঃ বড় দাদা গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর অনেকবার শুনিয়াছিলাম, যে, তিনি শেষ বয়সে কামরূপে দেবী-সদনে দীর্ঘকাল সাধন ভজনে নিযুক্ত আছেন। তোমার সে জ্যেঠামশাইকে তুমি দেখ নাই। তুমি হবার পূর্ব্বে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। তিনি আছেন কি দেহ রাখিয়াছেন, তাহাও জানি না। তাঁহার সংবাদ লইবার ইচ্ছাও সময়ে সময়ে মনকে ব্যাকুল করিয়াছে। কিন্তু লোকাভাবে এ কাজটি ঘটিয়া উঠে নাই। একবার গেলে হ'তো, কিন্তু আমি তোমাকে নিয়ে গেলে, তোমার মেয়ে কোথায় থাকে ? তাকে সঙ্গে নিয়ে এত দূর দেশ যাত্রা কোনও মতে সঙ্গত হইবে না।

শুনিয়া মালতীর মুখ শুকাইল। গৃহিণী বলিলেন "তা হ'লে, ত আর হয় না। মেয়ে নিয়েই যত বিপদ। আমি বলি, তুমি ওকে নিয়ে এখানে থাক, আমি ঘুরে আসি।

হ। সেও ভাল হয় না। আমি বলি, তুমিই মেয়ে নিয়ে এখানেই

থাক, আর আমি ভায়ার সঙ্গে যাই। সব দেখে শুনে আস্‌বো, আর দাদারও সংবাদ লইব। তোমাদের এখানে থাক্‌তে কি কোন অসুবিধা হইবে ?

গৃ। বোধ হয় হবে না। এত লোক জানা শুনা হ'য়ে গেছে। তোমার বন্ধু বান্ধবও দুচারি জন আছেন। তাঁহারাও দেখা শুনা করিতে ও সংবাদ লইতে পারিবেন। কিন্তু কাকা, এ বয়সে তোমাকে কোন প্রকারে ক্লেশ দিতে চাই না। কিন্তু যখন উপায়ান্তর নাই, তখন তোমার কথাই মাথা পাতিয়া নিলুম।

হ। এখন আর কিছু ভাবিবার সময় নাই। কাল সকালে যাত্রা করিতে হইবে। আমিই যাইব। যাকে যাকে বলার প্রয়োজন, এই বেলা সেরে আসি। দাসগিন্নী তোমার কাছে রাত্রিতে থাকলে কেমন হয়, তা'হলে সে চেষ্টাও করিতে পারি।

গৃ। মন্দ হয় না। লোক ভাল, একটা দোসর থাকা ভাল।

দ্বিতীয় স্তর

প্রথম পরিচ্ছেদ

কন্‌খলে কুটীর দ্বারে

কৃষ্ণেন্দ্রবাবু বৈদ্যনাথকে হরিদ্বারে রাখিয়া বদরিকা যাত্রা করিয়াছিলেন। সে আজ প্রায় তিন মাস হইতে চলিল। এই দীর্ঘকাল বৈদ্যনাথ কন্‌খলে রাত্রি ও হরিদ্বারে দিবা যাপন করিতেছেন। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট নির্জ্জন স্থানে প্রতিদিন আসন গ্রহণ করিয়া রত্নাকরের ন্যায় নাম সাধনে রত হন। বিধিপূর্ব্বক কোন বিশেষ নাম এখনও গ্রহণ করেন নাই। যে দিন যে নাম ভাল লাগে, বৈদ্যনাথ সে দিন সেই নামই সাধন করেন। দীক্ষাপ্রাপ্ত বা স্বভাবজাত কোন বিশেষ নাম এখনও বৈদ্যনাথের হৃদয়ে স্থান লাভ করে নাই। সুতরাং সাধনাতেও তাঁহার নিষ্ঠা ও নিষ্ঠাজাত গাঢ়তা জন্মায় নাই। বৈদ্যনাথের অত্যধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রবাবু যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন, "মানুষের উদ্ধার লাভের জন্য মহাপ্রভু দয়া করিয়া বলিয়া গিয়াছেন ঃ—এ যুগে ধর্ম্ম লাভের সহজ পন্থা "নামে রুচি ও জীবে দয়া।" এখানে অবস্থান কালে যথাসাধ্য অন্যের সুবিধা সাধন করিবেন, আর যে নাম আপনার ভাল লাগে, সেই নামে, সর্ব্বজীবের আশ্রয় ভগবানকে ডাকিবেন। উদ্ধারের পন্থা আপনা আপনি আপনার দ্বারস্থ হইবে।

তবে যদি একান্তই কোন নাম আপনার হৃদয়ে স্থান না পায়, তবে "কৃষ্ণ চৈতন্য দয়া কর বলিয়া, শ্রীভগবানকে ডাকিবেন।"

বৈদ্যনাথ অনেক সময় সমস্ত দিন বসিয়া হরিদ্বারের শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করেন, ধর্ম্ম কর্ম্মে নিযুক্ত জনমণ্ডলীর অনুষ্ঠানাদি দর্শন করেন। সময়ে সময়ে মুদ্রিত নেত্রে আত্ম-চিন্তা করেন। যখন হৃদয় বড়ই অস্থির হয়, তখনই কেবল পুনঃ পুনঃ "কৃষ্ণ চৈতন্য দয়া কর" বলিয়া হৃদয়ের অস্থিরতা ও পূর্ব্ব স্মৃতির যাতনা জুড়াইবার চেষ্টা করেন। এই ভাবেই বৈদ্যনাথের সময় কাটিয়া যাইতেছে।

এমন সময়ে একদা এক মালাতিলকধারী বৃদ্ধ বৈষ্ণবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বাবাজী রজনী শেষে মধুর কণ্ঠে সুমিষ্ট স্বর-লহরি তুলিয়া রজনীর নিস্তব্ধতা নিবারণে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি ঊষা-গগন কম্পিত করিয়া জয়দেবের পদাবলী গাহিতেছেন ঃ—

দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন! ভব-খণ্ডন!*
মুনিজন-মানস-হংস!
জয় জয়, দেব হরে।
কালিয়-বিষধর-গঞ্জন! জন-রঞ্জন!
যদুকুল-নলিন-দিনেশ!
জয় জয়, দেব হরে।
মধু-মুর-নরক-বিনাশন! গরুড়াসন!
সুরকুল-কেলি-নিদান!
জয় জয়, দেব হরে।

---

* রাগ গুর্জ্জরী—তাল নিঃসার।

অমল-কমল-দল-লোচন ! ভবমোচন !
ত্রিভুবন ভবন-নিধান !
জয় জয়, দেব হরে।
জনক-সুতা-কৃতভূষণ ! জিত-দূষণ !
সমর-শমিত-দশকণ্ঠ !
জয় জয়, দেব হরে।
অভিনব-জলধর-সুন্দর ! ধৃতমন্দর !
শ্রী-মুখ-চন্দ্র-চকোরে !
জয় জয়, দেব হরে।
(ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভব-জলধি-রত্নম্।) *
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়।
কুরু কুশলং প্রণতেষু
জয় জয়, দেব হরে।

গোপীযন্ত্র যোগে গান গাহিতে গাহিতে বাবাজী যখন বৈদ্যনাথের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন কৃষ্ণপক্ষের শেষ জ্যোৎস্নার ক্ষীণালোকে উষার আলো মিশিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব করিয়াছে। সে দিন রাতের ভাব বিবর্জ্জিত সময়ের বিচিত্র সন্ধিস্থলে বৈদ্যনাথ কুটীর ত্যাগ করিয়া বাবাজীর সম্মুখে দেখা দিলেন। বাবাজী গানের শেষ চরণ শেষ করিতে করিতে বৈদ্যনাথকে পাইয়া বৈষ্ণবোচিত বিনয় নম্রতা সহকারে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। বৈদ্যনাথ গৌর-কান্তি গৌরাঙ্গ-সেবকের বিনয় সৌজন্যে অভিভূত হইয়া ততোধিক

* রাগ দেশবরাড়ী—তাল অষ্টতাল।

আপনার হীনতা অনুভব করিয়া বলিলেন, "করিলেন কি? আপনি আমার ন্যায় পাতকীকে প্রণাম করিয়া পাপীর পাপভার বৃদ্ধি করিলেন। আমি কাহারও প্রণামের যোগ্য নহি," বলিয়া বৈষ্ণবের পায়ের ধূলা লইতে অগ্রসর হইলেন।

বাবাজী চতুর লোকের মত অল্প কয়েক পদ পশ্চাতে গিয়া যন্ত্রযোগে গানের সুরে মধুর স্বরে বলিলেন—

(তুমি) রসের সাগর রসিক বর,
চিনি চিনি চিন্‌তে নারি,
(তুমি) ছিলে কোথায়, এলে হেথায়,
বল দেখি হে কে কাণ্ডারী?
(দেখ) ধন মান বিসর্জ্জনে, হয় না ধর্ম্ম, জেনে শুনে
পায়ের ধূলা নিচ্ছি আমি, অবিচারে সর্ব্বজনে।
(বলি) তৃণের মত কোমল হয়ে, তৃণাকারে সব সয়ে,
(ভাই) সবার যদি সেবা কর, আপনারে বিলাইয়ে,
তোমায় চাহে না যে জন, যোগাও তারই মন,
তবেই হবে নীল-পদ্মে, নীলকান্তের দরশন।

বৈদ্যনাথ গানের শেষ চরণের বাক্যগুলি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না করিতে বাবাজী সরিয়া পড়িতেছেন। গড়ুই নদীর অপূর্ব্ব ঘটনা তাঁহার স্মরণ হইল। বাবাজীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইয়া দেখেন, বাবাজী অদৃশ্য হইয়াছেন। মনে হইল বাবাজী হরিদ্বারের দিকে দ্রুত চলিয়াছেন। বৈদ্যনাথ কুটীরের দ্বার বন্ধ করিয়া হরিদ্বারের দিকে সত্বরপদে অগ্রসর হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিক অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও বাবাজীর সন্ধান পাইলেন না; কিন্তু মনে হইতেছে, নদীর পরপারে, দূরে অতি দূরে পর্ব্বতগাত্রে যেন

সেই মধুর কণ্ঠনিনাদের প্রতিধ্বনি হইতেছে, শুনিলেন, বাবাজী যেন বলিতেছেন—"ধন মান বিসর্জ্জনে হয় না ধর্ম্ম, জেনে শুনে

পায়ের ধূলা নিচ্চি আমি, অবিচারে সর্ব্বজনে।"

আবার ক্ষণকাল পরে যেন শুনিলেন," "তৃণের মত কোমল হয়ে, তৃণাকারে সব সয়ে' সবার যদি সেবা কর, আপনারে বিলাইয়ে।" আজ বৈদ্যনাথের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। বৈদ্যনাথ কুষ্টিয়াতে আপন আলয়ে বসিয়া গড়ুইএর জলে "নীলপদ্মে নীলকান্তমণি দর্শন" অনুভব করিয়া কেবল কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছিলেন। কোন প্রকার উল্লাসের আবেগ অনুভব করেন নাই, আজ কিন্তু হৃৎকম্পের প্রবল বেগ ভোগ করিলেন। আজ বুঝিতেছেন, বেশ অনুভব করিতেছেন, বিষয় সম্পদ ও বাসনার প্রবল প্রবাহের অন্তরালে উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবন ধারণের স্তর সকল বিদ্যমান। আজ ভয়ে ভীত বৈদ্যনাথ স্নানান্তে উৎকণ্ঠিতচিত্তে আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিলেন, কিন্তু আজ মন বড়ই চঞ্চল ও উত্তেজনাপূর্ণ। বৈদ্যনাথ আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি ধন মান অর্জ্জনবৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বাবাজী বলিয়া গেলেন, তাতে ধর্ম্ম হয় না। তাই অবিচারে সকল লোকের পায়ের ধূলা নিতে হবে? ঠিক কথাই ত, সেই জন্য ঐ বাবাজী হয় ত আমার অবস্থা জেনেও, আমার পায়ে মাথা রাখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তবে কি সত্যিই মানুষ মানুষের ভিতরের ভাব বুঝিতে পারে? তেমন তেমন লোকের হাতে আত্ম-গোপন অসম্ভব বলিয়াই বুঝি, সাধুরা ভিতর বাহির এক করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তাই ত বটে, কৃষ্ণেন্দ্র বাবুও আমাকে বলিয়া গিয়াছেন, নীলাকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও হরিদ্বারের গঙ্গাজলের মত স্বচ্ছ হৃদয় চাই। আমার হৃদয় কি সেরূপ হইয়াছে?" নিজেকে এই প্রশ্ন করিয়া সহজ ও সরল ভাবে কোন উত্তর পাইলেন না। বৈদ্যনাথের

মন, বৈদ্যনাথের মুখের দিকে তাকাইয়াই ঠিক খাঁটি সত্য অনুভব করিয়া, সায় দিতে পারিল না। বৈদ্যনাথ বুঝিলেন, তাঁহার মনের ময়লা কাটে নাই। মানাপমানমুক্ত—মর্য্যাদাজ্ঞানবিরহিত ভাবে সত্যে নিষ্ঠা জন্মায় নাই। আজ বৈদ্যনাথ বুঝিলেন, ব্যবসাদারী সত্যে ও সত্য সত্যে কত প্রভেদ। আজ বুঝিলেন, ব্যবসাদারী সত্য সত্য হইলেও প্রয়াগের সমল গঙ্গাজল, আর ভ্যাজালবিহীন সত্য হরিদ্বারের গঙ্গাজল, দুয়ে অনেক প্রভেদ। "আমার হৃদয়ে দৃষ্টিপাত করিলে, আমি ত উহার তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি না, আমাকে দেখিয়া কেহ ত ঠিক নীলাকাশের নির্ম্মলতা অনুভব করিবে না। তবে আমার উপায় কি? আমি কেমন করে আমার কৃত কর্ম্মফলের আক্রমণ হইতে মুক্তি লাভ করিব?"

বেলা প্রায় দশটার সময়ে বৈদ্যনাথ দেখিতে পাইলেন, পথশ্রমে ক্লান্ত কলেবরে কৃষ্ণেন্দ্র বাবু আসিতেছেন। কৃষ্ণেন্দ্র বাবুকে আসিতে দেখিয়া, বৈদ্যনাথ আনন্দে আটখানা হইয়া আসন ত্যাগ করিলেন ও তাঁহার দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। নিকটস্থ হইতে না হইতে বৈদ্যনাথ বৃদ্ধ বৈষ্ণবের অনুকরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণেন্দ্র বাবু ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া বৈদ্যনাথকে ভূপৃষ্ঠ হইতে উঠাইয়া বক্ষে ধারণ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈদ্যনাথ হৃদয়ের নীরব আবেগে অশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত করিতে লাগিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্র বাবুর মুখে ভ্রমণ ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন উৎসাহজাত আনন্দের তরঙ্গ তুফান লক্ষ্য করিয়া বৈদ্যনাথ অশ্রুজল নিবারণ ও মোচন করিলেন, এবং বলিলেন "আমিও সহস্র অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগের ভিতরেও ভাল আছি। যে জন্য গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, হয় ত তাহা পাইলেও পাইতে পারি, তবে অনেক বিলম্ব হইবে। কত সময় লাগিবে, তাহা ভাবিতে গেলে ভয় হয়।" কৃষ্ণেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তর্কে

বহুদূর, একবার যদি শিশুর মায়ের উপর নির্ভরের মত সর্ব্বচিন্তামুক্ত হ'য়ে তাঁর উপর নির্ভর করিতে পারেন, তবেই ত্বরায় মঙ্গল হইবে। দেখুন, শাস্ত্রে বলে, 'প্রেয় ত্যাগ করিতে না পারিলে, শ্রেয় লাভ হয় না।' আপনি স্বেচ্ছায় যে পথে পা দিয়াছেন, এ পথে ক্লেশ ও ক্লান্তি থাকিলেও তাহারই মধ্যে শান্তি লুক্কাইত থাকিয়া মানুষকে সুস্থ ও সবল করিয়া থাকে। আপনি এই সময়ের মধ্যে সে সবলতা কি অনুভব করেন নাই? কোনও দিন কি বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছার উদয় হইয়াছে?"

বৈ। আজ্ঞে না, একবারও হয় নাই। কেবল কি করিলে উদ্ধার পাব, সেই ভাবনাই আমার হৃদয় মন অধিকার করিয়া আছে।

কৃ। এই তিন মাস কাল অবিরাম এই উদ্ধার লাভের চিন্তাই আপনাকে ব্যাকুল করিয়া রাখিয়াছে?

বৈ। আজ্ঞে হাঁ। অন্য চিন্তা আমাকে নূতন করিয়া অসুখী করিতে পারে নাই, তবে পূর্ব্বকৃত কুকর্ম্ম সকলের স্মৃতির নিত্য আক্রমণে মন প্রাণ সর্ব্বদাই বেদনা ভোগ করিতেছে। সে বেদনার বিষ বড় বেশী।

কৃ। এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহই একবারে মুক্তবিষ নহেন। সকলকেই অল্পাধিক বিষের জ্বালা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে আপনার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়াই বোধ হইতেছে, আচ্ছা বলুন ত এই তিন মাসের মধ্যে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে কোন অতিমানব ঘটনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই?

বৈ। সে বিষয়ে আমি বিগত তিন মাস সমান উপবাসী। কোনও দিন একটি আশার কথা শুনি নাই, কোনও অলৌকিক ঘটনা দেখি নাই, তবে আজ প্রাতঃকালে উষালোকে এক প্রাচীন বাবাজীর ব্যাপার দেখিয়া ও তাঁহার বিষয় এতক্ষণ চিন্তা করিয়া কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি।

কৃষ্ণেন্দ্র বাবুর সোৎসুক দৃষ্টিপাতে বৈদ্যনাথ উৎসাহিত হইয়া ঘটনাটি পূর্ব্বাপর বলিয়া গেলেন। কৃষ্ণেন্দ্র বাবু সেই বিবরণ শুনিতে শুনিতে ও বাবাজীর ব্যবহার এবং ত্বরিত পদে পলায়নের সংবাদে আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "হায় হায়, এমন ব্যক্তিকে ধরিতে পারিলেন না। এঁকে পেলে আপনার ও সঙ্গে সঙ্গে আমার বিশেষ উপকার হইত। বড়ই সুযোগ হাতছাড়া হইয়াছে। বাবাজী সাধু লোক সন্দেহ নাই।

'ধন মান বিসর্জ্জনে, হয় না ধর্ম্ম, জেনে শুনে
পায়ের ধূলা নিচ্ছি আমি, অবিচারে সর্ব্বজনে।'

এ কি সহজ কথা, বাবাজী নিশ্চয়ই সাধক বৈষ্ণব।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "বাবাজীকে দেখিয়াও তাই মনে হয়। বয়সে প্রাচীন হইলেও সে সবল ও সুস্থ দেহের গৌরকান্তি চারিদিকে যেন আভা ছড়াইতেছে, তাঁকে দেখেই আমার হৃদয়ে বিস্ময়সহ আনন্দের সঞ্চার হওয়াতে আমি একটু অভিভূত হইয়াছিলাম, তাই তিনি হাতছাড়া হইয়াছেন, তা না হ'লে কি তিনি পালাতে পারতেন? আমি তাঁহার সঙ্গ লইব বলিয়া শশব্যস্তে কুটীরের দ্বার বন্ধ করিতে গিয়াই তাঁহাকে হারাইয়াছি। সেই মুহূর্ত্ত অবসর পাইয়া বাবাজী অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন! আমি তাঁহার পশ্চাতে ছুটিলাম বটে, কিন্তু তাঁকে আর ধরতে পারলুম না!" এইবার কৃষ্ণেন্দ্র বাবুর নয়নপ্রান্তে বিষাদের অশ্রু দেখা দিল, তিনি বিষাদিত হৃদয়ে আক্ষেপোক্তি সহকারে বলিলেন, "আপনি করিলেন কি? সংসারের যথাসর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া আসিয়া এখানে কন্‌খলে কুটীরদ্বার বন্ধ করার প্রয়োজনে পড়িয়া বাবাজীকে হারাইলেন। কন্‌খলের কুটীর দ্বার খোলা পড়ে' থাকলে কি ক্ষতি হইত? দেখুন, ওকেই বন্ধন বলে,

ঐ কুটীর দ্বার রক্ষা করিতে গিয়া আপনি পরমধন হারাইয়াছেন। বড় শীঘ্র আপনার ভাগ্য প্রসন্ন হইতে হইতে হইল না। সংসারের লোক একেই বলে "সোণা ফেলে আঁচলে গেরো।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরানন্দের আশ্রমে

প্রায় দুই মাস অতীত হয়, বেল সাহেব কলিকাতায় গিয়াছেন। এখনও বিবাহ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসেন নাই। এক দুই করিয়া যত দিন যাইতেছে, হরিনাথ, মালতী ও মালতীর মায়ের জন্য ততই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। বৃদ্ধের এখানে আসার পরোক্ষ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। জ্যেষ্ঠ সহোদর হরনাথ "হরানন্দ স্বামী" পরিচয়ে কামাখ্যাতে অসামান্য প্রতিষ্ঠাভাজন সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত। দেশ বিদেশ হইতে সাধুসজ্জনের পদার্পণে তাঁহার আশ্রম সর্ব্বদাই অতিথি-শালার আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। হরিনাথ প্রায় এক মাস কাল সহোদরের আশ্রমে আনন্দে যাপন করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিষয়বাসনামুক্ত হৃদয়ে ধর্ম্মের উন্নততর ভাব স্থান পাইয়াছে। তাঁহার আসাম যাত্রার ইহাই উত্তমতর ফল। তিনি সহোদরের সঙ্গ সুখে এই প্রাচীন বয়সে কিঞ্চিৎ পথের সম্বল সংগ্রহ করিয়া সবল ও সুস্থ বলিয়া অনুভব করিতেছেন। কাশী যাত্রার পূর্ব্বে, আবার কয়েক দিন আশ্রমে বাস করিয়া যাইবার অঙ্গীকারে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন আবার একবার সেখানে যাইবার

জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। কেবল মালতার মায়ের সংবাদের জন্য চিত্তরঞ্জনের নিকট চা বাগানে অপেক্ষা করিতেছেন।

এমন সময়ে, সপ্তাহেব মধ্যে বেল সাহেবের ফিরিবার সংবাদ আসিল। সঙ্গে সঙ্গে মালতীর মায়েরও একপত্র পাইয়া হরিনাথ জানিতে পারিলেন কন্যাসহ ভ্রাতুষ্পুত্রী কুশলে আছেন, তবে আর অধিক বিলম্ব করিলে ক্লেশের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। হরিনাথ এই দুই সংবাদ পাইবামাত্র সহোদরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। চিত্তরঞ্জন পূর্ব্বের ন্যায় সহযাত্রী হইয়া তাঁহাকে কামরূপে পৌছাইয়া দিতে গেল।

দেবালয়ের অনতিদূরে আশ্রমে বসিয়া হরানন্দ স্বামী তাঁহার এক পুরাতন সন্ন্যাসী বন্ধুর সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। দুই জনেই সংসারাশ্রম ত্যাগের পর দীর্ঘকাল একত্র বার করিয়াছিলেন এবং সেই সূত্রে একই গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা পরস্পর গুরুভাই। প্রাচান সুখস্মৃতিবিমিশ্রিত শাস্ত্রালাপের মাঝখানে, চিত্তরঞ্জনসহ হরিনাথ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সহোদরের পাদ বন্দনা করিতে না করিতে, হরানন্দ অভ্যাগত সুহৃদের সহিত সহোদরের পরিচয় করিয়া দিবামাত্র হরিনাথ তাঁহারও পদধূলি গ্রহণ করিলেন। চিত্তরঞ্জনও বৃদ্ধের অনুকরণে উভয় সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল।

প্রণাম করিল বটে। হরানন্দ স্বামীকে বৃদ্ধ হরিনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্ঞানে গুরুজন ভাবিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল। কিন্তু অন্যজনের চরণস্পর্শে সহসা চিত্তরঞ্জনের চিত্তে পুলকসঞ্চার ও শরীরে রোমাঞ্চ হইল। কেন এমন হইল? কে বলিতে পারে, কেন এমন হইল? চিত্তরঞ্জন এখনও সন্ন্যাসীদ্বয়ের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিপাতও করে নাই। তাহার অন্তরের হর্ষ ও কণ্টকিত দেহের অবসন্নতা, তাহাকে বিহ্বল

করিয়াছে। সে এক অপূর্ব্ব চিত্তবৃত্তির তাড়নায় সন্ন্যাসীর প্রাচীন মুখ মণ্ডলে সাশ্রুনয়নে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, সন্ন্যাসী যুগলকর প্রসারিত করিয়া বালককে স্নেহালিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! দেখিয়া বোধ হইল যেন, তুষারমণ্ডিত স্নিগ্ধশির হিমালয় সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র সদৃশ দুই স্নেহধারায় যৌবনোদ্গমসম্পন্ন ও সবলকায় আর্য্যাবর্ত্তকে বক্ষে ধারণ করিয়া উভয় বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিলেন। সে সুন্দর দৃশ্য যে দেখিল, সেই মুগ্ধ হইল। সন্ন্যাসী ও বালক উভয়েই নীরব।

হরানন্দ ও হরিনাথ উভয় ভ্রাতা সবিস্ময়ে বালক বৃদ্ধের এই আকস্মিক আলিঙ্গন সন্দর্শনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে বেদাচার্য্যের দিকে তাকাইয়া আছেন। বেদাচার্য্যের সুপ্রাচীন মুখমণ্ডলে আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছে। তাঁহার বংশের উপর বিবিধ বিঘ্ন বিপত্তির ঘাত প্রতিঘাত আজ তাঁহার হৃদয় মথিত করিলেও, তিনি আজ এই যুবককে বক্ষে ধারণ করিয়া অপরিমেয় তৃপ্তি অনুভব করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বোধ হইতেছে, যেন দীপ্তশিরার অভিষেক হইতেছে। বহুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া আচার্য্য যুবককে আপন উরুর উপর বসাইয়া নীরবে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হরানন্দ স্বামী সাদরে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ, এ বালক কি তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্কে জড়িত?" আচার্য্য বলিলেন, "জানি না, বালকের মুখমণ্ডলে, আমার একমাত্র কন্যা অন্নপূর্ণার মুখচ্ছবি প্রতিফলিত দেখিয়া সহসা আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, কে যেন আমার অন্তর হইতে বলিয়া দিতেছে, ইহাই তোমার বংশের শেষ চিহ্ন।" আচার্য্য যুবকের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার উরুদেশে কোন চিহ্ন আছে?" চিত্তরঞ্জন প্রশ্নের স্বপক্ষে নীরবে সায় দিল। আচার্য্য বলিলেন "দেখাও ত?" গুরুজন সমক্ষে উরুর বস্ত্রাবরণ উত্তোলন

শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বোধে, সঙ্কোচ বোধ করিতেছে দেখিয়া, হরিনাথ, বিলম্ব অসহ্য বোধ হওয়াতে, স্বয়ং যুবকের দক্ষিণ উরুর বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিবামাত্র একটি রৌপ্যমুদ্রা পরিমাণের জবাকুসুম-কোরকাকার সুন্দর জড়ুর দেখা গেল। বেদাচার্য্য আনন্দে বিহ্বল হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে যুবকের কমলকান্তিপূর্ণ মুখমণ্ডলে বার বার চুম্বন দিয়া ও দক্ষিণ হস্তে শিরস্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন, এই বালকই আমার একমাত্র বংশগৌরব দৌহিত্র। আমার কন্যা অন্নপূর্ণার পুত্র।

অজ্ঞাত অথচ চিরপোষিত তত্ত্ব, এইরূপ অভূতপূর্ব্ব উপায়ে, চিত্তরঞ্জনের দিব্যদৃষ্টি পথে ফুটিয়া উঠার সূত্রপাতে, সে যুবক অতর্কিত ভাবে যেন তাহার ভগ্নপৃষ্ঠে মেরুদণ্ডের শক্তি অনুভব করিল। এতদিন কে যেন তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির কেন্দ্র হরণ করিয়া রাখিয়াছিল। আজ যুবক তাহার সেই শক্তিকেন্দ্র অধিকার করিল বলিয়া অনুভব করিতে যাইতেছে, এমন সময়ে এই দৈবানুগ্রহ দর্শনে মুগ্ধ মন ও নীরব হরিনাথ, ধীরে অতি ধীরে বেদাচার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "যদি অনুমতি হয় ত, দুএকটা বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি।"

বে। অবশ্য করিবে।

হ। আপনি কি দুই মাস পূর্ব্বে ৺কাশীধামে উপস্থিত ছিলেন?

বে। নিশ্চয় ছিলাম। ভাই! তুমি যে আমার পরমাত্মীয়ের সহোদর, তাহা জানিতাম না। কিন্তু আমার আশ্রমের অনতিদূরে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নানের সময়ে ও দেবালয়ে ৺বিশ্বেশ্বর ও ৺অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দিরে, তোমাকে কতশত বার দেখিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই।

হ। আশ্রমের নাম জানিতে পারি কি?

বে। বেদাচার্য্যের আশ্রম।

এই 'বেদাচার্য্য' নামের উল্লেখ হইতে না হইতে চিত্তরঞ্জনের সমগ্র শরীরে যেন সহসা একটা প্রবল তাড়িতপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। আর সে যুবক ভয় ও বিস্ময় বিজড়িত দৃষ্টিতে বেদাচার্য্যের মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবসাঙ্গপ্রায় হইতে হইতে ক্ষীণস্বরে বলিল, "সে ত্রিশূল ও কমণ্ডলু কই?" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার জ্ঞান লোপ পাইল। সে অবশদেহে বেদাচার্য্যের ক্রোড়ে শয়ন করিল। কিন্তু তাঁহার স্পর্শ প্রভাবে সে ত্বরায় সুস্থতা বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু কোন কথাই কহিতে পারিল না, কেবল আচার্য্যের মুখ একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুমারনাথের পরিবারে

পনের দিন হইল কুমারনাথ কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কাজকর্ম্মে মন দিতে চাহিতেছেন, কিন্তু মোক্ষদার রূপলাবণ্য এখনও তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া আছে, তাই কোন কাজেই নিবিষ্টচিত্ত হইতে পারিতেছেন না। রোগীকে আরোগ্য করার উপর ডাক্তারের, আর মক্কেলের মাম্‌লার কিনারা করার উপর উকিলের ব্যবসায়ের উন্নতি নির্ভর করে। কুমারনাথ নিজ ব্যবসায়ে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিলেন। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, তাঁহার লক্ষ্মীশ্রী বৃদ্ধি পাইতেছিল, কিন্তু অশুভক্ষণে মোক্ষদার প্রতি বক্রদৃষ্টি-পাতের ফলে, সবই বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে। ব্যবসায়ে বিঘ্ন, সঙ্গে সঙ্গে সংসারে অশান্তি বৃদ্ধি পাইতেছে।

সৌদামিনী সংসার-সম্পদে উৎফুল্ল বা স্ফীত হইবার পাত্রী নহেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা ও উপযুক্ত পাত্রে পরিণীতা বলিয়া সদা সন্তুষ্টচিত্তে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতেছিলেন। স্বামীর সুখসাধনে ও সন্তান দুটির প্রতিপালনে সদা ব্যস্ত। স্বল্পে সন্তুষ্ট, সদা প্রফুল্লপ্রাণ সৌদামিনী আজ প্রায় দুই মাসকাল দারুণ মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেছেন। সৌদামিনী বর্ণজ্ঞানের ধার ধারেন না, কিন্তু স্বভাবসৌন্দর্য্যে সৌদামিনী ভাগ্যবতী, সহজ জ্ঞানে সৌদামিনী লোকরহস্য বুঝিতে ও আত্মরক্ষায় বেশ পটু। শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি সৌদামিনীর শ্রদ্ধাভক্তি ও পূজার ভাব অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, স্বামীর সুখ সুবিধা সাধনের জন্যই, কৃষ্ণনগরে আসিয়া স্বামীর নিকট বাস করিতেছেন, কুমারনাথ, পূর্ব্বে, মাসে একবার করিয়া পিতামাতাকে দেখিতে যাইতেন। কিন্তু দুই মাসের মধ্যে ঘন ঘন বাটী যাওয়ার আয়োজনে সৌদামিনী বুঝিয়াছিলেন নূতন কিছু অঘটন ঘটিয়াছে। আর মাসাধিককাল যাইতে না যাইতে, তাঁহার সহজজ্ঞানজাত সরল সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়াছে। এখন নানা কারণে বিশেষভাবে তাঁহার প্রতি স্বামীর ব্যবহারে ব্যথিত ও কাতর হইয়া পড়িতেছেন, হৃদয়ের জ্বালা বানের জলের মত, দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে, বাড়িয়া যাইতেছে। তাই বলিয়া মোক্ষদার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র রাগ কি অভিমান নাই। সম্পর্কে ভ্রাতৃজায়া বলিয়া, ও তাহার উপর স্বামীর অসঙ্গত অনুরাগ দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া, তিনি মোক্ষদার প্রতি ননন্দার ঈর্ষার ভাব পোষণ করেন না। বরং পিতামাতার ব্যবহার স্মরণ করিয়া অন্তরে ক্লেশ অনুভব করিতেছেন।

কুমারনাথ কাশী হইতে ফিরিয়া আসা অবধি অতি বিষণ্ণভাবে কালযাপন করিতেছেন। বলপূর্ব্বক বন্ধুমণ্ডলে বাহিরের স্ফূর্ত্তি দেখাইবার চেষ্টা করিলেও, আত্মগোপন করিতে পারেন না। অনেক সময়ে ভিতরের ছবিখানি বাহির হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ কুমারনাথের

পিতার নিকট কুমারনাথের মনোবিকারের সংবাদ পৌঁছিল। পিতা মাতা পুত্রের জন্য ব্যস্ত ও বিব্রত হইলেন। পিতা পার্ব্বতীনাথ ভগিনীকে গৃহে আনাইয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহিণীকে কৃষ্ণনগরে পাঠাইলেন। কুমারনাথের মা, কৃষ্ণনগরে আসিয়া, বধূমাতার নিকট পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা শুনিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধা শোকতাপে জর জর, পুত্রটি ও পুত্রের সংসার লইয়া কথঞ্চিৎ সুখে শেষ জীবনটা কাটাইতেছিলেন। হৃদয়ের জ্বালায় বলিয়া ফেলিলেন, "এ সুখটুকু বিধাতার সহ্য হইল না, জানিনা, কত পাপই করিয়াছিলাম।" বলিতে বলিতে চক্ষের জলে ভাসিতেছেন, এমন সময় কুমারনাথ কাছারি হইতে ফিরিয়া মাতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন, মায়ের চক্ষে জলধারা দেখিয়া বুঝিলেন, সৌদামিনী মাকে কাঁদাইয়াছেন। রাগটা হইল সৌদামিনীর উপর।

মানুষ যখন চক্ষু থাকিতে অন্ধ হয়, তখন সে আর নিজের দোষ ত্রুটি দেখিতে পায় না। অন্যের দোষটাই সর্ব্বদা নয়ন-সমীপে ভাসিতে থাকে। অন্যের দোষ না থাকিলেও, কল্পনায় অনেক দোষ অল্প সময়ের মধ্যে গড়িয়া উঠে। সৌদামিনীর বিরুদ্ধেও সেইরূপ এক দুইকরিয়া অনেক দোষ আকার ধারণ করিল। কাছারির পোষাক পরিত্যাগ করিতে করিতে কুমারনাথ কোপদৃষ্টিপাতে সৌদামিনীর অন্তরে তীব্র বেদনার সঞ্চার করিয়া বলিলেন, "মা আসিতে না আসিতে তাঁহাকে 'এক গুণ সাত গুণ' করিয়া বলিবার, আর তাঁর চোখের জল ফেলানর কি দরকার ছিল? একটু দেরি সইল না?" সৌদামিনী বলিলেন, "আমি তাঁকে কিছুই বলি নাই। কেবল তিনি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেইগুলির উত্তর দিয়াছি, তুমি জানো, মিথ্যা কথা বলা আমার অভ্যাস নাই, যাহা জানি ঠিক ঠিক উত্তর দিয়াছি, এর অধিক কোন অপরাধ করি নাই।" কুমারনাথ বলিলেন, "আচ্ছা বেশ।"

কুমারনাথ আদালতের পোষাক ছাড়িয়া মাতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া

জননীর পাদবন্দনা ও পিতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। মা পুত্রকে দেখিয়া অশ্রুমোচনপূর্ব্বক শান্তভাবে বসিয়াছিলেন, বলিলেন, "ভালই আছেন, তবে তোমার পিসির নিকট তোমার সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিব্রত ও ব্যস্ত হইয়া আমাকে এখানে পাঠাইয়া দিলেন, ও বলিলেন, "প্রয়োজন হইলে সংবাদ দিবামাত্র আমিও যাইব।" এই বয়সে তাঁর কি আমার এরূপ দৌড়াদৌড়ি করা সম্ভব? কি করিব বাবা, আমাদের সবে ধন নীলমণি তুমিই 'একরত্তি' আছ।

কু। আমার জন্য ব্যস্ত হইবার ত কোন দরকার ছিল না। আমি বেশ আছি। কোন অসুখ বিসুখ নাই, কাজকর্ম্ম করিতেছি, না না কারণে মনটা একটু চঞ্চল হ'য়েছিল। তাও সেরে যাচ্ছে।

মা। (পুত্রের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া) আহা! তাই হোক, আমার 'সাত রাজার ধন এক মাণিক' তুমি, তুমি ভাল থাকলেই বুড়ো বুড়ী নিশ্চিন্ত থাকে। কে একজন সন্ন্যাসী এসেছিল না?

কু। হ্যাঁ এসে ছিলেন।

মা। কে তিনি?

কু। বাড়ী থেকে যে মেয়েটিকে এখানে এনেছিলুম, তাহার বাপের বন্ধু-শিষ্য।

মা। কি সর্ব্বনাশ! তাঁহার গুরু! তবে বৌমার বড় ভাজের বাপ গোলকনাথ আচায্যি? তিনি শুনেছি সিদ্ধপুরুষ, তিনি ত সামান্য লোক নন, যাকে যা বলিবেন, তার তাই ফলে যাবে! তিনি তোমার উপর রাগ টাগ করেছেন না কি? তা হইলেই ত সর্ব্বনাশ! হায় হায়! মা ষষ্ঠি! আমার বাছাকে রক্ষা কর।

কু। (সভয়ে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে মায়ের দিকে তাকাইয়া) মা! আমার কোন অসুখ নাই, তবে মনের মধ্যে এমন কতকগুলা গোলমাল সেই শিষ্য সন্ন্যাসী বাঁধাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে, আর আমার ঘর সংসার ছেলেমেয়ে

স্ত্রী, এ সকলের কাহাকেও ভাল লাগে না। তোমাদের অমন বৌ অমন নাতি নাত্‌নী, এ সব কিছুই ভাল লাগে না। তবে তোমাদের দুজনের উপর কোনও প্রকার ভাবান্তর হয় নাই। এই যে একটা উদাসীনের অবস্থা মন অধিকার করিয়াছে, কোন মতেই এর হাত হ'তে মুক্তি নাই। কি জানি কি মন্ত্রবলে সন্ন্যাসী এই অবস্থা ঘটাইয়া গিয়াছেন।

মা। শুনেছি, তিনি এবং তাঁর শিষ্যেরা কখন কাহারও অনিষ্ট করেন না। লোক বড় ভাল, তুমি ত উকিল মানুষ, ভাল, বিচার করে বল দেখি, দোষ কার? তাঁর না তোমার?

কু। (এইবার অশ্রুমোচন করিয়া শান্তভাবে) তিনি ভাল লোক, তাঁহার অপরাধ নাই।

মা। তবে অপরাধ কার? তোমার?

কুমারনাথ নীরব।

মা। আমাকে সকল কথা ভেঙ্গে বল, তবে ত একটা উপায় কর্‌বো।

কু। বাবাকে কোন কথা বলিবে না, অঙ্গীকার কর, তবে বলিব।

মা। এতটা কাল সংসার করিলাম, কখন একটা কথা গোপন করি নি, কি ছোট কি বড় সকল কথাই তাঁকে বলেছি, আর আজ কেমন ক'রে তাঁর কাছে বলিব, 'সব খবর ভালই' তারপর অকারণে আমার একটামাত্র ছেলে মনের আগুনে পুড়ে পুড়ে যখন খাক্ হয়ে যাবে, যখন আর সার্‌বার উপায় থাকবে না, তখন তোর খাতিরে বঞ্চনার ফল ভোগ কর্‌বো, তুই কি এই চাস্? তা হবে না, আমি সব কথাই বল্‌বো, তবে তিনি তোমাকে একটি কথাও বল্‌বেন না। এমনটা করতে পারি। তাতে সম্মত হ'য়ে সব বল্‌তে চাও ত বল, আর না বল, তাঁকে সংবাদ দিয়া আনাই, যা যা বল্‌তে হয়, তাঁকেই বল্‌বে।

কু। না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে এখানে এনো না। তোমাকেই সব বল্‌বো। এখন না, রাত্তিরে তোমাকে একা বল্‌বো।

রাত্রিতে কুমারনাথের মাতৃদেবী একটী একটী করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পুত্রের বর্ত্তমান অবস্থা বেশ বুঝিয়া লইলেন। মোক্ষদাকে কয়া হইতে কৃষ্ণনগরে আনার পূর্ব্ব হইতে কুমারনাথের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থার সূত্রপাত ও পরে কাশীযাত্রা ও সেখানে বেদাচার্য্যের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সকল ও তৎসঙ্গে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার বিষয়, সমস্ত শুনিয়া, পরে যখন তিনি পুত্রকে বলিলেন, "গোলকনাথের নিকট এরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া আসিয়া আজ এক মাস হইতে চলিল সে অঙ্গীকার পালনের কি করিয়াছ?" তখন রাত্রি একটা! পুত্র মাকে বলিলেন, "আজ রাত অনেক হইল, তুমি শয়ন কর। আমি ভাবিয়া উপায় স্থির করিব, কাল প্রাতঃকালে তোমাকে বলিব।"

মা। তা হবে না! আমার ঘুম হবে না। আমি আজই এ কথার শেষ করিতে চাই! তুমি এত দিনে যখন কিছু কর নাই, তখন আজ রাত্তিরেই তুমি কিছু ঠিক করিবে, আমার এমন মনে হয় না। করবার হ'লে, এ সব কথা আমাদের কাণে উঠ্‌বার আগেই ক'রে ফেল্‌তে। তুমি ত নির্ব্বোধ নও। এখন বুঝ্‌লুম, মোক্ষদার রূপই তোমাকে বিরূপ করে রেখেছে। আমি আর একটু ও বিলম্ব কর্‌বো না। কাল রবিবার আছে। আজই ঠিক কর, কাল কি কর্‌বে।

কু। তুমি কি কর্‌তে বল?

মা। কাল রবিবার আছে। বাসুদেবপুরে যাও, তোমার শ্বাশুড়ীর সঙ্গে দেখা কর। সন্ন্যাসীর নিকট যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া আসিয়াছ, তাহা না করিলে তোমার ও তোমার সংসারের যে অনিষ্ট হইতেছে, তাহাতে তোমার ও তাঁহার মেয়েরও যে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বুঝাইয়া বল, বলিয়া মোক্ষদার সম্বন্ধে ঠিক খাঁটী সত্য ঘটনা সব জানিয়া এবং কোন লিখিত প্রমাণ থাকৃলে তাহা সংগ্রহ করিয়া গোলোকনাথের নিকট পাঠাইয়া দাও, তাঁহার শুভদৃষ্টি ও আশীর্ব্বাদ

ভিন্ন, তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় নিরাপদ হইবার উপয়ান্তর নাই। এ কাজে একদিনও বিলম্ব করা হইবে না। তুমি এমন নির্ব্বোধ! এতদিন কেন বিলম্ব করিলে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মায়ের উপদেশে

কু। মা! আমি কেমন জড়ের মত হ'য়ে গিছি! কোন কাজে উৎসাহ ও উগুম নাই। তুমি বল্‌ছ আমি কালই যাব, কিন্তু আমার দ্বারা বিশেষ কিছু কাজ হ'বে বলে আমার মনে হয় না। তুমি মা, তাই তোমার নিকট এত কথা বল্‌তে পার্‌লুম। এ জগতে অন্যের নিকট এ সকল কথার একটাও বল্‌তে পার্‌বো না। তাই বলি, আমার সাধ্যাতীত।

মা। আচ্ছা, আমিই উপায় কর্‌বো, এখন তুমি শোওগে।

কুমারনাথের মা পরদিন প্রাতঃকালে নিজের জবানী একখানি পত্র পুত্রের দ্বারা লিখাইয়া, সে পত্রে সকল কথা প্রয়োজন মত বিবৃত করিয়া, বধূমাতার মায়ের নিকট পাঠাইয়া, তাঁহাকে পত্র পাঠ একবার কৃষ্ণনগরে কন্যার আলয়ে আসিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

সৌদামিনীর মা পত্র পাইয়া ও পত্রার্থ অবগত হইয়া, নানা বিপদ কল্পনা করিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। পলাতক পুত্র ভিন্ন অন্য কেহ নিকটে নাই। উত্তম পরামর্শ দিবার লোক নাই, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সংসারের সমস্ত-ব্যবস্থা করিয়া দিয়া—পর দিন কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইয়া কন্যার মুখে, বৈবাহিকপত্নীর মুখে, ঘটনাগুলি পরপর

শুনিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। "বড়কর্ত্তার পুত্রবধূ এখনও জীবিত, সে এতকাল পরে তাহার বাপের আশ্রয় পাইয়াছে। এই দীর্ঘ কুড়িটি বৎসরেও কোন একটা ভালমন্দ হয় নাই, ইহার পর যদি ছেলেটা বেঁচে থাকে এবং ক্রমে যদি তারও সন্ধান হয় ও তাকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তার মান-মর্য্যাদা, সম্ভ্রম ও সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি সকলই যাইবে! হায় হায়! তাই, তখনই বলেছিলুম, এমন কর্ম্ম কখন ক'রো না, ধর্ম্মে সবে না। শেষটা তাই হ'লো! এখন উপায় কি?" এই চিন্তাটুকু পলকমধ্যে তাঁহার মাথার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎবেগে ফুটিয়া একটা গভীর যাতনার দাগ রাখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সব অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল। তিনি অবসন্ন মনে ও শিথিল দেহে অনেকক্ষণ মেয়ে ও বেহাইনের পাশে বসিয়া রহিলেন। ইহার উপর জামাতার কার্য্যকলাপ ও তাহার ফলাফল চিন্তা করিয়া আরও বিব্রত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

কু-মা। বেয়ান্ আমাদের কর্ত্তার মুখে গোলকনাথ আচার্য্যের অনেক গল্প শুনেছি! তিনি সাধু সন্ন্যাসী, সিদ্ধপুরুষ বলিয়া তাঁহার খুব মান। তাঁহার মেয়ে কি তোমাদের বাড়ীর বৌ?

সৌ-মা! হ্যাঁ বোন্, শুনেছিলাম, সে মারা গিয়েছে। এখন শুন্‌ছি সে বেঁচে আছে। সে আমার ভাশুরপোর স্ত্রী। আমার ভাশুরপো দক্ষিণারঞ্জন তম্‌লুকে চাকরি করিত, ঝড়ে গঙ্গায় ডুবে মারা যায়। তারপর বৌএর খবর আর কিছু পাই নাই, আছে কিনা, তাও জানি না।

সৌ। মা! অন্নপূর্ণাই বেঁচে আছে। সে মরে নাই, আমি তাকে দেখে বেশ চিন্‌তে পেরেছি, তারপর তোমার জামায়ের মুখে শোন না, দাদার শ্বশুর বলেছেন, সে তাঁহারই কন্যা, আর আমারও বিশ্বাস সে দাদার বৌ।

কু-মা। দক্ষিণারঞ্জন গঙ্গায় ডুবে গেলে, তার বৌকে কি বাড়ী আনা হয় নাই? সে কি তম্‌লুক থেকেই কোথাও চলিয়া যায়, না বাড়ীতে এসেছিল।

সৌ-মা। না দিদি, তাকে বাড়ীতে আনা হ'য়েছিল। শ্রাদ্ধশান্তির পর একটা গুজব উঠ্‌লো যে তার স্বভাব ভাল নয়। ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা। দেখে আমাদের কর্ত্তা তাকে বাড়ী থেকে বিদেয় করে দিয়েছিলেন। সে আজ কুড়ি বৎসরের কথা, তখন বৌএর বয়স কেবল ১৫ বৎসর মাত্র। পরে কি হ'লো কিছুই জানি না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরিচয় লাভে

চিত্তরঞ্জনের প্রকৃতিস্থ হইতে বহুক্ষণ বিলম্ব হইল। প্রায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে সর্ব্বপ্রথম কথা কহিতে গিয়া যুবক পুনরপি বলিল, "আপনার সে ত্রিশূল ও কমণ্ডলু কই?" আচার্য্য দেখিলেন, ত্রিশূল ও কমণ্ডলুর চিন্তা যুবক পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। আর বোধ হয় ঐ দুই বস্তুর অন্তরালে কোন তত্ত্ব লুকাইয়া আছে, তাই বালকের সুস্থতা-সম্পাদনপ্রয়াসী বেদাচার্য্য আস্তে আস্তে বলিলেন, বৎস! কোন্ ত্রিশূল ও কমণ্ডলুর কথা তুমি বলিতেছ?

চি। সেই যে আপনার হাতে দেখেছিলুম।

বে। কবে কোথায় দেখেছিলে?

চি। আট বৎসর পূর্ব্বে, বারাকপুরের বারাণসী ঘোষের ঘাটে,

এই মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল আর বাম হস্তে কমণ্ডলু দেখিয়া চকিত ভীত ও কম্পিত হয়েছিলুম।

বে। কেমন ক'রে দেখেছিলে ?

চি। আপনি ত্রিশূল ও কমণ্ডলু লইয়া এই বেশে আমার অন্তরাত্মাতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সেই অবধি আপনার ঐ মূর্ত্তি আমার ধ্যান জ্ঞান হইয়া রহিয়াছে।

বে। বৎস! আমি ত কই তোমাকে দেখা দিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মূর্ত্তি তোমার অন্তরে মুদ্রিত হইল, ইহা কি সম্ভব ?

হরানন্দ স্বামী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সম্পূর্ণ সম্ভব। তোমার কি মহাভারতের উপাখ্যান স্মরণ নাই ?

বেদাচার্য্য বলিলেন, "ভাই! বালকের কথা শুনিতে শুনিতে, আমারও সে কথা স্মরণ হইয়াছে। কিন্তু সেখানে একলব্যের তপস্যা ছিল। একলব্য সাধন বলে দ্রোণ-মূর্ত্তি রচনা করিয়া তাহাতে দ্রোণ-শক্তির সঙ্কল্প করিয়া সে মহাপুরুষের শক্তি ও কৌশল অর্জ্জন করিয়াছিল। এখানে ত সেরূপ তপঃপ্রভাব দেখিতেছি না।

এইবার চিত্তরঞ্জন প্রবল উত্তেজনাসহকারে বলিল, আর্য্য! আমার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন। সে নিষাদ তনয় আমাপেক্ষা কি অধিক তপস্যা করিয়াছিল। ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন হইতে আমার প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ধরণীবক্ষের স্নিগ্ধতা হরণ করিয়াছে, আমি জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বজনবর্জ্জিত হইয়া শৃগাল কুক্কুরের মত দ্বারে দ্বারে জঠরানল নির্ব্বাণ করিয়া আপন অদৃষ্টকে অভিসম্পাত করিতে করিতে স্বজনানুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়াছি। আমার বাল্যসুহৃদ্‌গণের আত্মীয় স্বজনের বিদ্যমানতা ও পরিচয় নিয়ত আমাকে একলব্যের অপেক্ষাও অধিকতর আকুল করিয়া রাখিয়াছিল। আপনার দর্শন

লাভের দিন আমিও অমাবস্যার রাত্রিতে একাকী গঙ্গার ঘাটে শ্মশান-প্রান্তে আত্মহারা হইয়া, আমার উৎপত্তির মূল অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলাম। আর আপনি সেই শুভক্ষণে আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আশা দিয়া গিয়াছিলেন। দেবতা! আজ আপনার সেই ইঙ্গিতে অনুভূত আশীর্ব্বাদের উত্তম ফল অধিকার করিয়া আপনার ক্রোড়ে শয়ন করিতে পাইয়াছি। এখন আমি মরিলেও, আমার আর দুঃখ নাই।

বেদাচার্য্য বলিলেন, "বৎস, অমন কথা কি বল্‌তে আছে? আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও।"

চিত্তরঞ্জন পুনরপি বলিল, "আপনি আমায় দেখা দিয়াছিলেন, সে কথা আপনার স্মরণ নাই? তবে কি সবটাই আমার কল্পনা ও ভ্রম?

বে। না, বৎস! তোমার ভ্রম নহে। আমারই ভ্রম।

চি। আপনার ভ্রম! তাহা হইতেই পারে না। আমারই ভ্রম। আর না হয়, বলুন, আমার কাতর ক্রন্দনে আপনার হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল, আর আপনি আমাকে দেখা দিয়াছিলেন, আর ইহা আমার তপস্যার ফল।

বে। আমার স্মরণ হয়, আট বৎসর পূর্ব্বে আমি শ্রাবণের অমাবস্যার রাত্রিতে আমার সহোদর তোমার ছোট দাদা মহাশয়ের গঙ্গাযাত্রার প্রতীক্ষায় লোকদৃষ্টির অপরিজ্ঞাত উপায়ে ক্ষণকাল তথায় উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু আমাকে কাহারও দেখিবার উপায় ছিল না। তুমি আমাকে কিরূপ ভাবে দেখিয়াছিলে?

চি। আজ্ঞে, গঙ্গার ঘাটে চাতালের উপর একবস্ত্রে রুগ্ন শরীরে একাকী বসেছিলুম।

বে। তারপর বল! আমারই শুনিতে কৌতূহল জন্মিতেছে, কি অলৌকিক বিবরণ! বল—বল, আমাকে কেমন করে দেখ্‌লে?

চি। আজ্ঞে, শ্রাবণের ধারাসিক্ত অমাবস্যার রাত্রিতে খরবিদ্যুতালোক অসহ্য হওয়াতে, আমি, চক্ষু মুদ্রিত করিতে না করিতে, দেখিলাম আমার সমগ্র অন্তরটা সেই শুভ্রালোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর সেই আলোক-গোলকের মধ্যস্থলে কমণ্ডলু ও ত্রিশূল শোভিত এই মূর্ত্তি আমার মানসপটে অঙ্কিত হইয়াছিল। সে দৃশ্য আজি সত্যে পরিণত হইলেও, যেন প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছে।

বে। আশ্চর্য্য বটে। আমি কি কিছু বলেছিলুম?

চি। আজ্ঞে না, তবে আপনার সেই সৌম্যসুন্দর মূর্ত্তি আমাকে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শান্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়াছিল মাত্র।

বে। এমন অদ্ভুত ঘটনার কথা ত কখন শুনি নাই। আর এরূপ ঘটিতে পারে বলিয়াও জানা ছিল না। আমার অজ্ঞাতসারে আমার এরূপ প্রকাশ পাইবার সঙ্গত কারণ ত অনুভব করিতে পারিতেছি না।

এই কথা বলিতে বলিতে আচার্য্য ক্রমে নীরব ও ধ্যানস্থ হইলেন। সকলেই ক্ষণকালের জন্য নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ধ্যান ভঙ্গে আচার্য্য প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে চারিদিক পুলকপূর্ণ করিয়া হাসি মুখে বলিলেন, "সন্ধান পাইয়াছি। আমি সে রাত্রিতে ঐ ঘাটের ভূমি স্পর্শ করিতে করিতে তোমার বিষয় চিন্তা করিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, যে সহোদর দীর্ঘকাল তোমার ও তোমার মাতৃদেবীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি সংসারবন্ধন মুক্ত হইয়া চলিলেন, কে আর অসহায় বালকের ও তাহার মাতার সন্ধান করিবে? সে সময়ে আমার ঐরূপ চিন্তার ফলে তুমি নিকটে থাকায় তোমার হৃদয়ে আমার মূর্ত্তির ছাপ পড়িয়াছিল। তুমি অত নিকটে না থাকলে আমাকে দেখ্‌তে পেতে না। এই আমি যে সেই ব্যক্তি, তা কেমন ক'রে জানলে?"

চি। আজ্ঞে, মূর্ত্তি দর্শনের পর দেখ্‌লুম আলোক-গোলকে পৃষ্ঠদেশের উত্তরীয় বস্ত্রে লেখা আছে, "বেদাচার্য্য নাম বারাণসী ধাম।" তাই আপনার নাম শুনে সেই দীর্ঘ পোষিত স্মৃতি অন্তরে জেগে উঠ্‌ল ও আমি অবশ হ'য়ে পড়্‌লুম।

বে। বৎস! তোমার পরিচয়ের দুটা প্রমাণ পাওয়া গেল। আর একটা প্রমাণের প্রয়োজন। আশা করি তাহাও ত্বরায় আমার হস্তগত হইবে। তুমি অন্নপূর্ণার পুত্র জড়ুর তাহা প্রমাণ করিল; দৈব আমার দৌহিত্রত্বের প্রমাণ প্রদান করিল। কেবল পিতৃপরিচয় বাকি রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুই বন্ধুতে

কৃষ্ণেন্দ্রবাবু ও বৈদ্যনাথ সন্ধ্যার পর আহারান্তে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। বৈদ্যনাথ কৃষ্ণেন্দ্র বাবুকে হরিতকী দিতে দিতে বলিলেন, "এত ক্ষুদ্র ঘটনা মানুষের ভাল মন্দের নিয়ামক হয়? আশ্চর্য্য বটে, আমার এখন বেশ বিশ্বাস হইতেছে, আমার কুটীরের দ্বার বন্ধ করিতে যাওয়া ভাল হয় নাই। কুটীরের প্রতি মায়াবশত সাধুসঙ্গ হারাইলাম।

কৃ। আপনি ত সাধন-পথে শিশু। আপনার পক্ষে এরূপ ভ্রান্তি কিছু আশ্চর্য্য নহে। সাধকপ্রবর শুকদেবই দ্বিতীয় কৌপিন রক্ষা করিতে গিয়া জনক-সদনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। অথচ তিনি মাতৃগর্ভবাস কালেই শাস্ত্র জ্ঞানে পুষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সুতরাং

এরূপ ভুল ভ্রান্তি ও তজ্জাত বিড়ম্বনা ভোগ মানব মাত্রেরই নিয়তি। এই নিয়তির বন্ধন মুক্ত হইতে অনেক তপস্যার প্রয়োজন। অনেক সময়ে তপস্যাতেও কুলায় না। আপনার প্রাণের গভীর ব্যাকুলতা থাকলে, আবার ঐ বাবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।

বৈ। বাবাজী গোপীযন্ত্র হাতে সঙ্গতসহ যে গানটি গাহিতে গাহিতে আমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন সে, মনমাতান গানটির সব স্মরণ নাই। কেবল শেষ চরণদুটি স্মরণ আছে, দেখুন কেমন সুন্দর :—

ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং,
ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নম্।
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়।
কুরুকুশলং প্রণতেষু
জয় জয়, দেব হরে!

কৃ। বাবাজী সত্যই ভক্ত, আর বোধহয় বৃন্দাবনবাসী। আমি শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবন ধামে যাইতেছি। সেখানে আপনার বর্ণীত বাবাজীর সন্ধান পাইলে আপনাকে সংবাদ দিব।

বৈ। আপনি যাইবেন? আমাকে সঙ্গে লইবেন না?

কৃ। আপনার এখনও সময় হয় নাই। এখানে আরও কিছুদিন আপনাকে থাকিতে হইবে। 'ডোর পড়া' বলিয়া একটা কথা আছে।

বৈ। 'ডোর পড়া' কাকে বলে?

কৃ। একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষার ফলে মন প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সেখানে না গিয়া থাকতে পারে না। সকল বন্ধন কাটিয়া চলিয়া যায়।

বৈ। আমি সব ছাড়িয়া আপনার সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছি, তবে আমি কেন যাইব না?

কৃ। আপনি যা করেছেন, সচরাচর সকলে তাহা করে না, কর্‌তে পারেও না, কিন্তু সে সমস্তটাই একটা অবস্থার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া। কোন উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর অবস্থা অর্জ্জনের লোভ এখনও পূর্ণ মাত্রায় আপনাকে অধিকার করে নাই। তাহার পর, মনের সেরূপ অবস্থা সংঘটন হইলেও, আবার তাহার প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর সব নির্ভর করে।

বৈ। প্রকৃতি ও পরিমাণ অর্থে আপনি কি বলিতেছেন।

কৃ। পরিমাণ কথাটা—এক কথায় আপনাকে বুঝাইতে গেলে, বলিতে হয়, হৃদয়ের অনুরাগের গাঢ়তা বা অল্পতা বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতি, বিশেষ ভাবে প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য বুঝাইয়া দেওয়া বড়ই কঠিন কাজ। পুরুষপরম্পরাগত শারীরিক গঠনের ফলে, কতকটা পরিমাণে, শারীরিক প্রকৃতি বলিয়া একটা বস্তু আছে, সেটা অনেক সময় মনের প্রকৃতিকেও শাসন করিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃমাতৃগণের প্রদত্ত মানসিক শক্তির স্বতন্ত্র প্রবাহ নাই বলিয়া মনে করিবেন না। তাহাও আছে। সৎ ও অসৎ এই উভয়বিধ স্বভাবের লোকের শরীর মনের সংগ্রাম ও শান্তির সূক্ষ্মতর সূত্র সকল এমনই অদ্ভুত, যে সহজে সে সকলের একটুও বুঝা যায় না, ধরাও পড়ে না! একবারে বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মলাভের সূক্ষ্মপথ, ঐ সকলের দ্বারা অনেক সময়ে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

বৈ। আমি ত ইহার কিছুই বুঝিলাম না। একদিকে আমার শাস্ত্র ও ধর্ম্মজ্ঞান যেমন নাই, অপর দিকে তেমনি আপনার আলোচিত ঐ সকল উচ্চাঙ্গের সাধারণ আলোচনাও বুঝিবার শক্তি আমার অল্প। আমি বুঝি না, কেমন ক'রে আমার ধর্ম্ম লাভ হবে।

কৃ। যাক্, ও সকল গুরুতর বিষয় লইয়া আপনার মাথা গরম করিবার প্রয়োজন নাই। আর আমি বুঝলুম্ ওতে কোন লাভও

নাই। আপনি বালক কালে যাত্রা ও কথকতায় ধ্রুব ও প্রহলাদের উপাখ্যান শুনিয়াছেন ত ?

বৈ। শুনিয়াছি মাত্র, তাতে যে সকল উপদেশ আছে, সে গুলি যে কখন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, আমার ত এমন মনে হয় না।

কৃ। তবে বোধহয় বুঝাইলে বুঝিতে পারিবেন। আমি আপনাকে ধর্ম্ম সাধনের পন্থার প্রভেদটা বুঝাইতে চাই। ধ্রুবচরিত্রে সকাম ধর্ম্মেও কিরূপে সিদ্ধি লাভ হয়, তাহাই দেখান আছে, আর প্রহ্লাদ চরিত্রে নিষ্কাম ধর্ম্মের পূর্ণ স্বার্থকতার চিত্র অঙ্কিত আছে। এখন আপনি আপনার স্বভাব ও মন প্রাণ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, আপনি সম্পূর্ণ কামনাশূন্য হইয়া ভগবানে প্রতিষ্ঠা চান, না, কোন কামনা আপনার অন্তরের অন্ধকার কক্ষে লুকাইয়া থাকিয়া সেই বস্তু অর্জ্জনের জন্য সর্ব্বত্যাগী করাইয়াছে ?

বৈ। (সভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া) সে কথার বিচার ও মীমাংসা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন।

কৃ। কঠিন হইলেও, তাহা বুঝিতে ও তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে।

বৈ। আপনার নিকট ত আমার পূর্ব্ব জীবনের অনেক কথাই পরিজ্ঞাত, আপনার নিকট গোপন করিয়া আমার লাভ কি, বিশেষতঃ আপনি সাধু, সুহৃদ্ ও ধর্ম্ম পথের সহায়। আমার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর, এক অত্যাশ্চর্য্য লোকবিরল সুন্দরীর সঙ্গলাভ ঘটিয়াছিল। আমি তাহাকে পথে পাগলিনীর অবস্থায় কুড়াইয়া পাই। খুব সম্ভব সে বিধবা, কিন্তু উন্মাদ অবস্থা নিবন্ধন, তাহার আহারাদির বিচার ছিল না, আরোগ্য হওয়ার সঙ্গে সে বিষয়ে নূতন পরিবর্ত্তনও কিছু দেখি নাই। সেই স্ত্রীলোককে রোগমুক্ত করিতে আমি অপরিমেয় শ্রম স্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়াছিলাম। তাহাকে প্রথম যখন আনিয়াছিলাম, তখন তাহাকে চা

বাগানে পাঠাইবার কল্পনা ছিল, কিন্তু তাহার আরোগ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি আমার হৃদয়ের আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম। ইহার পূর্ব্বে, আমি অতি অত্যাচারী লোক ছিলাম, সে বিষয়ে বোধহয় আপনার কিছু কিছু জানা আছে! কিন্তু ইহার প্রতিই সর্ব্ব প্রথমএকটা অন্তরের আকর্ষণ অনুভব করি। আমার মনে হয়, সে স্ত্রীলোকও সামান্যা নহে। তাহাকে রোগমুক্ত করিতে প্রায় তিনচারি বৎসর কাটিয়া যায়, এই দীর্ঘ সময়টা আমি তাহার প্রতি আমার প্রাণের টান অনুভব করিয়াছি, কিন্তু আমার পূর্ব্ব অত্যাচার-বৃত্তি একবারে শান্ত ছিল। সেই নারীর বাহিরের সৌন্দর্য্যের তুলনা ছিল না, কিন্তু তাহার স্বভাব সৌন্দর্য্য তদপেক্ষা শতগুণে অধিক। আমি স্বপ্নেও কখন তাহার প্রতি বল প্রয়োগের প্রয়াস পাই নাই। আমার কোনও দিন সে সাহসে কুলায় নাই। তাহার সমাদর করিয়াছি, তাহাকে সম্মান করিয়াছি, আর দীর্ঘ সাধনার পর অল্প কয়েক দিনের জন্য তাহাকে আমার সংসারের কর্ত্রীরূপে লাভ করিয়াছিলাম। সকলই করিত, কিন্তু কখনও সেবিকার স্থান গ্রহণ করে নাই। আমার শয্যায় ভ্রমক্রমেও কখন শয়ন করে নাই! সে সাবধানতা ও সঙ্গে সঙ্গে পরিচর্য্যা, সে আত্মরক্ষা ও সঙ্গে সঙ্গে সমাদর প্রদর্শন এক আশ্চর্য্য বস্তু! ঐ অল্প কয়েক দিনের প্রত্যহই তাহার সঙ্গসুখে ধন্য হইবার আশা করিয়াছি, কিন্তু আশা সর্ব্বদাই মরীচিকায় পরিণত হইয়াছে। তাহার পর এক বালকের প্রতি অত্যাচার করায় সে সম্বন্ধ বিনষ্ট হয়। তাহার পরও বৎসরাধিক কাল সে আমার আলয়ে রহিল, কিন্তু আর সে পূর্ব্ব সম্বন্ধটুকুর লেশমাত্রও রহিল না। পুনরায় উন্মাদিনীর ন্যায় কাল যাপন করে। পরে সহসা চলিয়া যায়। কোথায় গেল, তাহার সন্ধান পাইলাম না। এখনও তাহার স্মৃতি হৃদয় মনকে জ্বালায়। কিন্তু আমার সে লালসার লোপ হইয়াছে, এখন

তাহাকে দেবতা বলিয়া মনে হয়, তাহাকে এখন দেবতার ন্যায় পূজা করিতে পাইলেই যেন ধন্য হই। এই বাসনা এখনও আমার হৃদয় মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আমি তাহার বিষয় ভাবিতে গেলে, আমার সমস্ত দেহ মন তাহার স্বভাবের শোভা-সৌরভে মাতোয়ারা হইয়া উঠে। অন্য কোন চিন্তা বা কামনা আমাকে বিব্রত করে না। কেবল সেই নারীমূর্ত্তি সময়ে সময়ে আমার প্রাণের দ্বারে প্রকাশিত হইয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলে। সেই সময়ে আমার মনে হয় যেন, তাহারই রূপে জগৎ আলোকিত, যেন মনে হয়, তাহারই স্বভাব সৌন্দর্য্যে সমস্ত সংসারটা জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। যত দিন যাইতেছে, যত সেই নারীর দর্শন লাভ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ততই তাহাকে পাইবার, তাহার সেবা করিবার, তাহাকে সন্তুষ্ট ও সুখী করিবার বাসনা প্রাণের অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, আর তাহাকে পাইলে, তাহাকে কেবল দেখিতে,—দূর হইতে তাহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতে, তাহার শুভ দৃষ্টি ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে হৃদয় মন নিয়ত ব্যাকুল, আপনি কি বলিতে পারেন এ অবস্থার ঔষধ কি? আমি কেমন করিয়া আমার নিজকৃত অবস্থার আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিব? ইহার হাত হইতে নিস্তার না পাইলে কি আমার কোনও প্রকার ধর্ম্মলাভের সম্ভাবনা আছে? আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি, কিন্তু ঐ যে অল্প কয়েকদিনের জন্য ঐ নারীমূর্ত্তিধারিণী দেবতার দয়া দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলাম, ঐ দৃষ্টির অসীমতায় যেন হাবুডুবু খাইতেছি বলিয়া নিয়ত অনুভব করিতেছি। ইহার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় বলিয়া দিন।

কৃ। আপনার সর্ব্বত্যাগের ভিতরে যখন ঐ ভাবের বিশালতা বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন মলিন চিন্তামুক্ত হইয়া—রক্তমাংসময় দেহে তাঁহাকে ভোগ করিবার বাসনামুক্ত হইয়াও আপনাকে ঐ অবস্থার ভিতর দিয়া, ঐ বস্তু

অবলম্বন করিয়া সাধনার পথে—ধর্ম্ম লাভের পথে,অগ্রসর হইতে হইবে,ঐ নারী জীবিত থাকিলে, তিনিই আপনার উদ্ধারের সেতুরূপে—পথ প্রদর্শক রূপে, আপনাকে বিধাতার চরণতলে লইয়া যাইবেন। আর তিনি লোকান্তরিত হইলে,তাঁহার আদর্শের ছায়াতলে বসিয়া সাধনা করুন। আপনি আশাসূত্র ধরিয়া—ভোগলালসার আগুনে ধূপ ধুনার সুগন্ধ বিস্তার করিয়াও তাঁহার প্রদত্ত নিষ্কাম সেবামাত্র পাইয়াছেন। সুতরাং সে নারী মানবী হইলেও দেবী! ঐ দেবতার সঙ্গসূত্রে আপনার সংসার ত্যাগের সূত্রপাত হইয়াছে। ঐ নারীমূর্ত্তির ভাব সর্ব্বাবয়বে প্রকাশিত হইয়া আপনাকে ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিবেন। আপনাকে ঐ মূর্ত্তির সম্বন্ধে বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাসম্পন্ন হইতে হইবে। একনিষ্ঠ হইয়া আপনি ঐ আদর্শের শরণাপন্ন হউন। তিনিই আপনার সাধন বলে কলেবর পরিগ্রহ করিয়া অন্তরাত্মাতে প্রকাশিত হইবেন ও আপনার উদ্ধার সাধনে সহায়তা করিবেন, আপনার আর অন্য গুরু গ্রহণ চলিবে না। আপনার আমার মত ধর্ম্ম বন্ধু আরও অনেক মিলিতে পারে, কিন্তু আপনার সাধনায় সিদ্ধি লাভের পক্ষে ঐ আদর্শকে জীবনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। উহাই আপনার প্রধান এক তৃতীয়াংশ। নারদ যেমন নারায়ণের নির্দ্দেশে এক তৃতীয়াংশ হইয়া ধ্রুবের উদ্ধারের পথ দেখাইয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ ঐ আদর্শের ইঙ্গিতে ভগবানের চরণে পৌছিতে পারিবেন। ধ্রুব যেমন বিমাতার বাক্যবাণে জরজর হইয়া হরিনামে মাতিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ আত্মকৃত বিরহ-বেদনার আগুনে পুড়িতে পুড়িতে ঐ নারীমূর্ত্তিকে বিধাতার বিশেষ দান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া ঐ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার শান্তিপ্রদ চরণকমল লাভের জন্য ব্যাকুল হউন। ঐ নারী জীবিতই থাকুন, আর মৃতই হউন, আপনার উদ্ধার সাধনে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইবেন। তাঁহারই উপদেশে পথ দেখিতে পাইবেন! আপনি সাধন করিলে,

আপনার সহিত পুনরায় তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে। এখন তাঁহার স্মৃতিই আপনার ধর্ম্ম লাভের পক্ষে প্ররোচনা মাত্র। কিন্তু ক্রমে উহাই আপনার ধ্যান ধারণার সম্বলে, ও পরে পরে সাধনায় বল সঞ্চারে ও সিদ্ধি লাভে সহায়তা করিবে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহাকেই রাধাসাধনা বলে, বৈষ্ণব সাধুরা মনের এরূপ অবস্থার একান্ত পক্ষপাতী, তবে আপনাকে কামগন্ধ মুক্ত হইয়া ঐ সাধনায় লিপ্ত হইতে হইবে। আপনি যদি আপনার হৃদয়ের এই প্রবল আগ্রহের গতি ফিরাইয়া তাঁহার রাধাভাবে প্রাণ প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন, অর্থাৎ ঐ নারীরভাব যদি আপনার স্বভাব হইয়া যায়, তাহা হইলে হয় ত একদিন আপনার হৃদয়-যমুনার নীলজলে নীলকান্তমণির শোভা দেখিয়া ধন্য হইবেন।

বৈদ্যনাথ সভয়ে ও সকাতরে কৃষ্ণেন্দ্রবাবুর দিকে তাকাইয়া ছল ছল নেত্রে বলিলেন, সে কি মহাশয়! তাও কি কখন হয়? সে কি সম্ভব? সত্য সত্য কি সেরূপ কোন ঘটনা ঘটিতে পারে? আমার ত বিশ্বাস হয় না।

কৃ। কেন হয় না? আর এ কথায় আপনাকে এত ভীত ও ত্রাস্ত বলিয়া বোধ হইতেছে কেন? ব্যাপার কি?

বৈ। আজ্ঞে আপনি যে দিন সন্ধ্যার সময়ে আমার বাসায় সর্ব্বপ্রথম পায়ের ধূলা দিয়াছিলেন, আর যাহার ফলে আজ আমি হরিদ্বারে। সে দিন অপরাহ্নে ঝড়জল হ'য়েছিল, আপনার কি স্মরণ আছে? ঐ সময়ে আমি অতি কাতর প্রাণে ও অবসন্ন হৃদয়ে বসিয়া গড়ুইএর নীলজলে নীল পদ্মে নীলকান্তমণি ভাসিতে ও ডুবিতে দেখেছিলাম। আবার আজ আপনিও নীলজলে নীলকান্তমণির কথা বলিতেছেন, তবে কি আমার সে দেখার কোন অর্থ আছে?

কৃষ্ণেন্দ্রবাবু আনন্দবিস্ফারিত নেত্রে বৈদ্যনাথের দিকে তাকাইয়া

বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, নানা অপরাধে অপরাধী হইলেও, আপনার কোন অজ্ঞাত পুণ্যফলে আপনি শীঘ্রই উদ্ধার লাভ করিবেন। আপনার যত্ন চেষ্টার ফলে, আপনার রাধাহৃদয়ে ত্বরায় নীলমণির বিহারধ্বনি শুনিতে পাইবেন, আপনার কোন অসীম পুণ্যফলে স্বয়ং ভগবান আপনার হৃদয় অধিকার করিয়া আপনার নরজন্ম ধারণ স্বার্থক করিবেন। আমার বিশ্বাস আপনার সে দিন বহুদূরে নহে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জন্মভূমি দর্শনে

বেদাচার্য্য আরও কয়েক দিন হরানন্দের আশ্রমে যাপন করিয়া চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনের জন্য যাত্রা করিয়াছেন। সেখান হইতে মাসাধিক কাল পরে পুনরায় স্বস্থানে সমাগত হইবেন, হরিনাথ ও চিত্তরঞ্জনকে এইরূপ আশা দিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

বেদাচার্য্য চন্দ্রনাথ ও সীতাকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থস্থানে দেবদর্শন তীর্থকর্ম্ম সম্পাদন ও দেশ পর্য্যটন শেষ করিয়া, জীবনের শেষ প্রহরে, একবার বাল্যস্মৃতি-বিজড়িত জন্মভূমির পথে অগ্রসর হইলেন। শ্রীকৃষ্ণপুর ও বাসুদেবপুরের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ ও প্রাচীন পুষ্করিণী, নাম "ঠাকুর পুকুর।" ইহা এত প্রাচীন যে স্থানীয় লোকেরা কেহই, কতকালের পুকুর, তাহা বলিতে পারে না। বংশের পর বংশ এই পুকুরের সম্বন্ধে নানাবিধ প্রবাদ প্রচলন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন,

আর সেইসূত্রে পুষ্করিণীর পাড়ে, মাঠে ও গভীর জলে শতবিধ উপদেবতার আবির্ভাবের কল্পনা জড়িত হইয়া গিয়াছে। আর দেখিলেও পুকুরটিকে সেইরূপ নানা বিচিত্রতার আলয় বলিয়া মনে হয়। আয়তন অতি বৃহৎ। জলের চারিদিকে বহুবিস্তৃত গোচারণের মাঠ। মাঠের মধ্যে অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ সকল বিশাল দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া পুষ্করিণীর পুরাতত্ত্বের সাক্ষ্যদান, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য জীবকে ছায়াদান ও পথিক-গণকে সুশীতল বিশ্রাম স্থান দান করিতেছে। মাঠ অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে পুকুরের পাড়, তাকে ছোট আকারের পাহাড় বলিলেই ঠিক হয়। এই পাহাড়ের উপরও বড় বড় বৃক্ষ ও ঘননিবিষ্ট বন। সময়ে সময়ে শীতকালে ঐ বনে বাঘের আবির্ভাবও হইয়া থাকে। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারিদিকের পাড়ের মধ্যস্থল কাটা চারিটা প্রশস্ত পথ বর্ত্তমান। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার সহজ পথ পুষ্করিণী মধ্যস্থিত মাঠের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকের ঘাটে স্নান, পানীয় জল গ্রহণ ও মাঠ দিয়া গ্রামান্তরে যাতায়াত নিবন্ধন প্রাতঃকাল হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘাটে ও মাঠে জনসমাগম দেখিতে পওয়া যায়। পুকুরের চারিদিকের গ্রামগুলি বহুলোকে পূর্ণ, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থের সংখ্যাই অধিক। প্রয়োনানুরূপ অন্যান্য জাতির বাসও নিতান্ত অল্প নহে। পুষ্করিণীর চারিপার্শ্বের গ্রামগুলি ও তাহাদের লোক সংখ্যা হিসাবে ভাবিতে গেলে, ইহাকে একটা বৃহৎ সহর বলিয়া মনে হইত। কেহই বলিতে পারে না, ইহার “ঠাকুর পুকুর” নাম কেন হইল। তবে প্রাচীনেরা তাঁহাদের বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছেন, স্মরণাতীত কাল হইতে পুষ্করিণীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের পূজার প্রতিমা সকল ঐ পুকুরেই বিসর্জ্জন হইয়া থাকে। প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে পুকুরের নামকরণের কোন সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে।

পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকে বাসুদেবপুরের পথে বেদাচার্য্য পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পারস্থিত নিজ জন্মভূমি শ্রীকৃষ্ণপুরে যাইতেছেন। আজ বেদাচার্য্য দীর্ঘ—দীর্ঘকাল পরে এই পুকুরের মাঠে এক পূর্ব্ব পরিচিত বটবৃক্ষ তলে দাঁড়াইয়াছেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মভূমি হইতে বিদায় লইবার সময়ে তাঁহার প্রিয় "ঠাকুর পুকুর"কে যেমন দেখিয়া গিয়াছিলেন, আজও সে ঠিক তেমনি আকারে বর্ত্তমান, আর ঠিক তেমনি ভাবে লোকসেবায় নিযুক্ত দেখিয়া বেদাচার্য্যের হৃদয় আর্দ্র ও আনন্দপূর্ণ হইল। আজ ঐ বৃক্ষতলে দাঁড়াইবা মাত্র তাঁহার বাল্য ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শৈশব স্মৃতি পিতৃমাতৃ স্মৃতি, আত্মীয় স্বজন স্মৃতি, পূজাপার্ব্বণ ও দেবদেবীর বিসর্জ্জন স্মৃতি সম্বলিত হর্ষবিষাদ বিমিশ্রিত এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি সে পূর্ব্বানুভূত বিচিত্র ভাবের আক্রমণে মথিত হইতে লাগিলেন, আজ সেই ষাট্‌বৎসর পূর্ব্বের প্রতিষ্ঠাপন্ন ও পরিজনপূর্ণ গৃহের শতবিধ সম্বন্ধের বন্ধন স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে গ্রাম্য বিরাট সমাজের শাসন শৃঙ্খলা ও সে সকলের সহিত পূর্ব্বপুরুষদিগের নিত্য সম্বন্ধ স্মরণ হইল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, আজ আমার "ঠাকুর পুকুর" ঠিক থাকিলেও সে বিরাট সমাজ, সে বিরাট ব্যবস্থা, এই পুষ্করিণী-প্রান্তরে সে বিজয়ার বিরাট জনকোলাহল, আর নাই, সে সব লোপ পাইয়াছে। সে সব পুরুষ নাই, সে সব নারী নাই, সে কালের সে মা বাপ নাই, সে স্নিগ্ধ শীতল শান্তিপ্রদ সমাজের ছায়াতল নাই, আছে কেবল স্নিগ্ধ সলিলপূর্ণ সেই "ঠাকুর পুকুর" সেই অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ, সেই প্রান্তর, আর সেই স্বজন ও সমাজ স্মৃতি। আছে কেবল সেই শৈশবে ও বাল্যকালে কত শতদিন মাতৃসঙ্গে ঐ ঘাটে স্নান ও ঐ ঘাটের জলে সন্তরণ স্মরণ, ঐ মাঠে কতদিন সঙ্গীসহ দিবসের অপরাহ্ন ভাগে ক্রীড়ামোদে কালকর্ত্তন স্মরণ; বালকে বালকে কত কলহ, কত ভালবাসা, কত বিচার আচার স্মৃতি অধিকার করিল।

আজ তাঁহার অপেক্ষাও বয়স্ক ও প্রাচীনতর বট ও অশ্বথ বৃক্ষ সকল, সেই জল সেই মাঠ ঘাট, ও প্রান্তর, তাঁহার বাল্যলীলার, তাঁহার পিতামাতা, ভার্য্যা ও পুত্রকন্যার বিচরণ ক্ষেত্র হইয়া সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান। আজ এ স্মৃতি বেদাচার্য্যের পরিণত বয়সের সংসারবন্ধন-মুক্ত হৃদয়েও অপার আনন্দ বিতরণ করিতেছে! তিনি দেহী হইয়াও তপস্যাবলে জীবনের যে উচ্চগ্রামে বিচরণ করেন, আজ তাহা ত্যাগ করিয়া বালকের ভাবে বিভোর হইয়া বৃক্ষতলে বসিলেন। মুদ্রিত নেত্রপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিয়াছে, তাঁহার স্থির গম্ভীর মূর্ত্তিতে সরল শিশুর কোমল মাধুরী প্রকাশ পাইতেছে। মুখের সে মাধুরীতে যশোদার শিশু কৃষ্ণভাব পূর্ণভাবে পরিস্ফুট। আজ বেদাচার্য্য পুষ্করিণী, প্রান্তর, বৃক্ষলতা ও উপবন পরিবেষ্টিত স্থানটাকে স্নেহক্রোড় প্রসারিত মা যশোদারূপে দর্শন করিয়া, গলবস্ত্রে ও করজোড়ে মাতৃস্তোত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া বারবার বলিতেছেন:-

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

আর সঙ্গে সঙ্গে বারবার প্রণাম করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতেছেন, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে হইল, স্বর্গ সুখও ইহার নিকট ক্ষুদ্রতম তুচ্ছ বস্তু! আশ্চর্য্য বটে, সাধকের হৃদয়েও এই চেতনাচেতন স্মৃতি-জড়িত জন্মভূমি আজ মাতৃসমা গরিয়সী হইয়া তাঁহার পূজা গ্রহণ করিতেছেন, আর তিনি মাতৃপূজা করিয়া ও মাতৃভক্তি প্রদর্শন করিয়া ধন্য বোধ করিতেছেন!

বেদাচার্য্যের নাম দেশে বিদেশে পরিচিত। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা কাশীধামে একবার গিয়াছেন, তাঁহারাই বেদাচার্য্যের পরিচর্য্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান ও সাত্বিক

ভাবের পরিচয় পাইয়া আনন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন। বেদাচার্য্যের জন্মভূমি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে সেকালে, সেরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প না হইলেও, আজ এই মুহূর্ত্তে ঠাকুর পুকুরের প্রান্তরে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট বেদাচার্য্যের চারিপার্শ্বে যে সকল লোক এক এক করিয়া সমাগত হইতেছে, তাহাদের কেহই তাঁহাকে জানিত না—চিনিত না, তাই চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল "ঠাকুর পুকুরের মাঠে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তেমন মানুষ কেহ কখন দেখে নাই, দেখিলেই বোধ হয় যেন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সবই বলিতে পারেন, আশ্চর্য্য মানুষ।" বায়ুগতিতে এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, দলে দলে স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, প্রৌঢ়া যুবতী আপন আপন দীর্ঘস্থায়ী বিঘ্নবাধা, রোগ শোক, নিবারণের ও সুখশান্তি লাভের উপায় জানিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিল। যেন চারিদিকের গ্রাম সকল শূন্য করিয়া লোক ব্যাকুল ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া গলবস্ত্রে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ প্রার্থনা জানাইতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাগমনে

হরানন্দের আশ্রম হইতে বেদাচার্য্যের চন্দ্রনাথ যাত্রার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে হরিনাথ চিত্তরঞ্জনকে লইয়া কাশী যাত্রার আয়োজন করিতেছেন। বেল সাহেব বিবাহান্তে বধূসহ কর্ম্মস্থানে আসিয়াছেন, নিজের কাজকর্ম্ম সব যথাবিধি করিতেছেন; নূতন প্রভুপত্নীর সহিত চিত্তরঞ্জনের পরিচয় করিয়া দিয়া তাহার বিবিধ গুণের কথা বলিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন যে তাঁহার মত নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি ভোগ করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার গভীর স্নেহের পাত্র হইয়াছে, তাহাও বলিয়াছেন। বেল সাহেবের নূতন গৃহিণী অল্প কয়েক দিনের পরিচয়ে কর্ম্মচারী চিত্তরঞ্জনকে নিজের ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ প্রদর্শনে অগ্রসর হইলেন।

বৃদ্ধের অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া, বেল সাহেব চিত্তরঞ্জনকে দুই মাসের বিদায় দিয়া কাশী যাত্রার অনুমতি দিলেন এবং পাথেয় ও বিবাহ ইত্যাদির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এক হাজার টাকা দিয়া বলিলেন "Tell your grand old man that Mrs Bell and myself shall be extremely happy to welcome you with your good bride." (১) চিত্তরঞ্জন বৃদ্ধকে সাহেবের অনুরোধ বুঝাইয়া দিবা মাত্র, হরিনাথ হাসিমুখে সাহেবকে সেলাম করিয়া ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন "যত শীঘ্র সম্ভব সকল কাজ শেষ করিয়া বরকন্যা বিদায় দেওয়া যাইবে;

(১) তোমার বৃদ্ধ দাদা মহাশয়টিকে বল যে আমরা উভয়ে নূতন বধূসহ তোমাকে সাদরে গ্রহণ করার অপেক্ষায় রহিলাম।

এবং তিনি আশা করেন, সদাশয় মহাত্মা প্রভু ও প্রভুপত্নীর আশ্রয়ে নব দম্পতি সুখে সংসার যাত্রা আরম্ভ করিবে ও নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে কালযাপন করিবে। সাহেব বুঝিতে পারিয়া হাসিমুখে বলিলেন "As sure as the sun rises in the east," (১)

ইহার পর চিত্তরঞ্জন সাহেবকে বলিল, "হিসাব দৃষ্টে আমার আপনার নিকট এত টাকা মজুত থাকে না। আমি এত টাকা লইব না।" সাহেব বলিলেন "তোমার ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক টাকা আমার হাতে মজুত আছে। এ টাকা, তোমার সঞ্চিত প্রাপ্য আট শত টাকা, আর তোমাকে বেনারস হইতে ফিরাইয়া আনা ও পুনরায় যাওয়ার খরচ বাবদ দুইশত, এই হাজার টাকা দিতেছি। ইহা ভিন্ন তোমার আরও অনেকগুলি টাকা আমার নিকট গচ্ছিত আছে। চিত্তরঞ্জন বলিল "টাকা গচ্ছিত আছে! আমার বেতনের টাকা? অসম্ভব।" সাহেব বলিলেন "হাঁ গচ্ছিট্ আছে। বেটনের টাকা নয়, এরূপ ঘটনা সম্পূর্ণ সম্ভব। টুমি ছেলে মানুষ, কখন্ কাহার ভাগ্যে কি ঘটে, টুমি কি বলিটে পার?"

চিত্তরঞ্জন, বড় বাবুর চিঠির কথা স্মরণ হইবা মাত্র, বিনম্র ভাবে বলিল, "সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সংসারে আমার প্রতি এরূপ দয়া করিবার লোক ত দেখি না, কে আমাকে টাকা দিল, আর কেনই বা দিল, জানিতে কৌতূহল হইতেছে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলুন।" সাহেব বলিলেন "টুমি এখন যাট্রা কর, সে সব কঠা পরে হবে। কট টাকা, কে ডিল, সে সব এখন ঠাক্। আরও টাকার ডরকার হ'লে আমাকে লিখ্‌বে। আমি পাঠাবো।" চিত্তরঞ্জন বলিল "অনুগ্রহ করিয়া সব কথা এখনই বলুন।" সাহেব বলিলেন "এখন কিছুটেই বলিব না।"

(১) সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হও, পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় তাহা সুনিশ্চিত।

চিত্তরঞ্জন চা বাগানের প্রত্যেক কর্ম্মচারীর নিকট বিনম্র ভাবে বিদায় লইয়া, বাগিচার মজুর দিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া, প্রভু ও প্রভুপত্নীর নিকট সাভিবাদন বিদায় লইয়া, বৃদ্ধের সঙ্গে কাশী যাত্রা করিল। হরিনাথ পথে নানা অসুবিধা ও তজ্জাত ক্লেশ ভোগ করিয়া কাশী পৌঁছিলেন। বেদাচার্য্য চন্দ্রনাথ যাত্রার সময়ে বৃদ্ধকে গোপনে বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি কাশীধামে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত,- আশ্রমে যেন যান না। সেখানকার কোন সংবাদও যেন জানিতে উৎসুক না হন। তিনি নিজে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সংবাদ দিবেন, এবং যাহা যাহা করিতে হয়, করিবেন। বেদাচার্য্যের এই আদেশ পালন জন্য হরিনাথ কাশীতে পৌঁছিয়া কিছুদিন আচার্য্যের আশ্রম প্রান্তস্থ ঘাটে নিজের ও চিত্তরঞ্জনের স্নান ও ঠাকুরবাড়ী যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। আশ্রমের লোকদের হইতে অজ্ঞাতবাসে রহিলেন।

যে দিন চিত্তরঞ্জন কাশীধামে পুনরায় হরিনাথের বাসায় উপস্থিত হইল, সে দিন সে গৃহে আবার নূতনতর আকারে আনন্দের সূত্রপাত হইল। চিত্তরঞ্জনের বংশমর্য্যাদা ও পরিচয়ের যে দৈব. সুযোগ ঘটিয়াছে, তাহা অবগত হইয়া মালতীরমায়ের হৃদয়ের একটা গুরুভার দূর হইল। সঙ্গে সঙ্গে এই কাজের জন্য মালতীর বাবার বহু ক্লেশ স্বীকার স্মরণ হইল, ও নয়ন-প্রান্তে অশ্রুকণা দেখা দিল। মালতী আনন্দের আবেগ গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে ; মায়ের চক্ষে জল দেখিয়া কাতর ভাবে মাকে বলিল, "মা কাঁদ কেন ?" মা বলিলেন "মা ! এই ছেলের পরিচয় সংগ্রহ করিতে তিনি কি কষ্ট ভোগই না করিয়াছিলেন, আজ তিনি থাক্‌লে, তাঁহার আনন্দের সীমা থাক্‌তো না, আমাদেরও সুখের অবধি থাক্‌তো না। বিধাতা তাঁহাকে এ সুখে বঞ্চিত করিয়া আমাদের সুখের সংসার অঙ্গহীন করিয়াছেন।" মালতীও মায়ের নিকট নত মস্তকে বসিয়া মায়ের মর্ম্ম-বেদনায় ও আজ বাবার অভাব অনুভব করিয়া অশ্রুপাত করিতেছে,

এমন সময়ে চিত্তরঞ্জন সেখানে উপস্থিত হইয়া কন্যাসহ মাতাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বিষাদিত চিত্তে বলিল ;—"মা ! আপনি কন্যাসহ বসিয়া চক্ষের জল ফেলিতেছেন কেন ? আবার কি হইল ?" গৃহিণী বলিলেন "বাবা আজ এই সুখের দিনে কর্ত্তা নাই, তাই প্রাণটা ছটফট করিতেছে। আজ তিনি থাকৃলে কত আনন্দই না হ'তো। চিত্তরঞ্জন অপ্রস্তুত হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া এ অবস্থায় কোন প্রবোধ বাক্য নাই দেখিয়া, ধীরে ধীরে স্থানান্তরে গেল।

মধ্যাহ্ন সময়ে আহারে বসিয়া চিত্তরঞ্জন হরিনাথকে বলিল "দাদা-মহাশয় ! এখন যে কয়দিন অনির্দ্দিষ্ট ভাবে এখানে থাকৃতে হবে, সে কয়দিন আমার স্বতন্ত্র বাসের স্থান থাকা আবশ্যক।"

হ। কেন ভাই ! এ বাড়াতে কি তোমার স্থানাভাব হইয়াছে ?

চি। আজ্ঞে না, তবে বিবাহের সম্ভাবনা থাকৃলে, এক বাড়ীতে পাত্র পাত্রীর থাকাটা ভাল দেখায় না। বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে।

মা। ও আবার কি কথা ? এত কাল একবাড়ীতে কাট্‌ল, এখন এ কয় দিন চল্‌বে না ?

চি। তখন আমরা ছোট ছিলুম্। সে দিন যে কারণে একত্র খাওয়ায় আপত্তি করে ছিলেন, আমিও ঠিক সেই কারণে, এক বাড়ীতে থাকা উচিত মনে করি না। দাদা মশাই কি বলেন ?

হ। ভুবন ! কথাটা একবারে উড়াইয়া দিবার নহে, ভাবিবার কথা। আচ্ছা ভাই, তুমি ত সেবার এসে আমার ঘরে শুয়ে ছিলে ? এবার এ কয়দিন কি আমার কাছে থাকা চলে না ?

চি। আজ্ঞে না, কোন মতেই উচিত নহে।

হ ! কেন নয়, বুঝাইয়া বল।

চি। আপনি বুঝিতে চাহিলে, আমার আপনাকে বুঝাইতে চেষ্টা

করা বেয়াদবি হইবে। আপনি বলিলেন "ভাবিবার কথা" ভাল ভাবিয়া দেখুন। নিজেই বুঝিতে পারিবেন।

হ। ভুবন! তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। আমি ভাবিয়া তোমাকে বলিব।

হরিনাথ অপরাহ্নে পল্লীর এক বন্ধুর বাহিরের ঘরে চিত্তরঞ্জনের শয়নের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বলিলেন "মা লক্ষ্মি! দেখ, এ ছেলে বড় ভাল, ইহার আচার ব্যবহার রীতি নীতি অতি উচ্চ ভাবের পরিচয় দিতেছে। যেখানে বিবাহ সম্ভাবনা আছে, সেখানে পাত্র পাত্রী এক বাড়ীতে রাত্রি যাপন কোন মতে সমাজসঙ্গত কাজ নয়, তাই ঐ বালক, পাত্র পাত্রী উভয়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, এরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছে। এ ছেলে বড় ভাল! তোমার ও তোমার মেয়ের ভাগ্য ভাল যে এমন সুস্বভাবসম্পন্ন পাত্র যুটিয়া গেল। মেয়েটির সৌভাগ্যের সীমা নাই। এখন বেদাচার্য্য আসিলে ভা'লয় ভা'লয় কাজটি হ'য়ে গেলেই নিশ্চিন্ত হই।

মালতীর মা বলিলেন "কাকা! ও ছেলেটা যে কত ভাল, তা তুমি জান না, আমার এই বেয়াড়া মেয়েটা ছেলেটাকে চারিটি বৎসর ধরিয়া সমানে কষ্ট দিয়াছে। আর সে অম্লান বদনে সে সব কষ্ট সহ্য করেছিল। সে যে মালাকে বিয়ে কর্‌তে চাবে, আমার এ বিশ্বাস ছিল না, ছেলেটা যে দিন অভিমান ভরে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়, আমার মেয়ের সে দিনকার সে নিষ্ঠুর ব্যবহার স্মরণ হ'লে আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

এই কথা শুনিয়া মালতীর লজ্জা ও দুঃখে চক্ষে জল আসিয়াছে। মালতী বিষণ্ণ মুখে মায়ের মুখের দিকে তাকাইবা মাত্র, গৃহিণী বলিলেন "থাক্‌ আর সে সব কথায় কাজ নাই। তোমার নাতিনীর চক্ষে জল আসিয়াছে।"

হরিনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "রাঙাদিদি এখন বুঝি বুঝেছ":—

"সে তোমার দেখন হাসি
তার জন্যে ভেবে ভেবে
ঘুম ধরে না দিবানিশি"

মালতী একটা মিষ্ট ঝঙ্কারে চমকিত করিয়া সাদর মুখভঙ্গিমায় দাদা মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া অশ্রুজলে হাসির আলো ফুটাইয়া বলিল :—"তুমি আমার সঙ্গে অত লেগেছ কেন? আমি তোমার কি ক'রেছি?"

হরিনাথ। "আর কি করবে? আমার হাতছাড়া হ'য়ে আমার সর্ব্বনাশ করলে!"

মা। বেশ হ'য়েছে।

হরি। কোনটা? ওকে পাওয়াটা?

মা। দেখ না—মা!

নবম পরিচ্ছেদ

পরিচয় দানে

সংসারে প্রায় পনের আনা লোকই আশার ছলনাকেই সম্বল করিয়া, কল্পনার গোপন ইঙ্গিতে উন্মত্ত হইয়া, জল্পনাকেই জপমালা করিয়া, সর্ব্বত্র ভূতভ্রমণ ভয়ে ভীত হইয়া, নিজ নিজ জীবনের গুরু ভার বহন করিতে করিতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাই সহসা কোথাও কোন আকারে দৈবের আবির্ভাব সম্ভাবনা দেখিলে, বা শুনিলে, জনমণ্ডলী সর্ব্বাগ্রে সেই দৈবের দ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করে ও আশা করে, শ্রান্ত পুরুষকার দৈবাধীন হইয়া ও তদ্দ্বারা নূতন শক্তি অর্জ্জনে সবল হইয়া, নিজ নিজ জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবে।

এইজন্যই আজ সমস্ত দিন ঠাকুর পুকুরের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণের বটবৃক্ষতলে লোক ধরে না। ব্যর্থচেষ্ট নরনারীগণ মনস্কামনার পরিপূরণ জন্য, রোগক্লিষ্ট নরনারীগণ রোগ যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, অপুত্রক নরনারী বংশ রক্ষার উপায় লাভের জন্য, মৃতবৎসা নারীগণ সন্তান রক্ষার ঔষধের জন্য, আরও অসংখ্য লোক নানাবিধ প্রার্থনা লইয়া, বেদাচার্য্যের সমীপে সমুপস্থিত।

বেদাচার্য্য দিবসের প্রথম ভাগে নীরব ছিলেন। মধ্যাহ্ন কালে স্নান ও পূজা আহ্নিক সমাপনান্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ আনাইয়া পান করিয়া আসনে উপবিষ্ট আছেন। তৃতীয় প্রহরে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সকলকে বুঝাইতেছেন যে, সিংহের কাজ যেমন শৃগালে সম্ভব নহে, তেমনি মালিকের কাজ তাঁবেদার করিতে পারে না। আমি এ দুনিয়ার মালিক নহি, যে তোমাদের এই সব অভাব

পূরণ করিব, আমি তাঁহার সেবক মাত্র, আমার হাতে এমন কিছু নাই, যাতে তোমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। আমি কেবল কিছু কিছু উপায় ও ঔষধ বলিয়া দিতে পারি, কিন্তু পাত্রদোষে তাহার উত্তম ফল না'ও ফলিতে পারে। এইরূপে যখন বেদাচার্য্য উপদেশ 'ও ঔষধের দ্বারা সমবেত জনমণ্ডলীকে এক এক করিয়া বিদায় করিতেছেন; ঠিক সেই সময়ে গ্রামের প্রধান দুর্গানাথ ন্যায়রত্ন পুষ্করিণী প্রান্তে বটবৃক্ষ তলে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইবামাত্র বেদাচার্য্য প্রতিনমস্কার করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। আসন গ্রহণ করিতে করিতে দুর্গানাথ সন্ন্যাসীর মুখের দিকে বার বার দৃষ্টিপাত করিয়া মনে করিতেছেন যে সন্ন্যাসী পূর্ব্ব পরিচিত কেহ হইবেন। এমন সময়ে বেদাচার্য্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দুর্গানাথ তুমিও আমাকে চিনিলে না?"

দুর্গানাথ অবাক দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিস্মৃতির পর্দ্দা উল্টাইতে উল্টাইতে স্মৃতিফলকের অতি প্রাচীন জীর্ণ প্রান্তে যেন কিছু লেখা আছে বলিয়া অনুমান করিতেছেন, এমন সময়ে আচার্য্য বলিলেন, "পূর্ব্ব পরিচয়ে আমি গোলকনাথ, একবার তোমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছি" এখন স্মরণ হয়? তুমি আমার বাল্যসহচর খেলার সঙ্গী ও সতীর্থ;" বলিয়া গোলোকনাথ বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক দুর্গানাথকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন ও বলিলেন "আমি ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে যাহাদিগকে বালক দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহাদের অনেককে আজ বয়স্ক প্রৌঢ় দেখিয়া চিনিতে পারিলাম, কিন্তু তাহারা আমাকে চিনিবে না বলিয়া পরিচয় দিই নাই।"

দুর্গানাথ বলিলেন "ভাই! এখানে এ মাঠে বৃক্ষতলে বসিয়া কেন? বাড়ীতে চল।" বলিয়াই পল্লীবাসী দুই ব্যক্তিকে বলিলেন

"শীঘ্র যাও, দীনবন্ধু ও জগবন্ধুকে সংবাদ দাও, তাদের জ্যাঠামহাশয় আসিয়াছেন।" আদেশ প্রাপ্ত দুইব্যক্তি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। দুর্গানাথের সঙ্গে দুচারিটি কথা হইতে না হইতে, উভয় ভ্রাতা সংবাদ পাইবা মাত্র ছুটিয়া আসিলেন, আসিয়াই পদপ্রান্তে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলেন। বেদাচার্য্য মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও উভয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ উভয় ভ্রাতার আগমনে ও আচরণে আচার্য্য পরিবারের বধূরা ত্বরায় গোপনে স্থান ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে সমবেত স্ত্রীমণ্ডলে, লজ্জা ও ভয়ের আবির্ভাব হইল ও সংখ্যাধিক্য হ্রাস হইতে আরম্ভ করিল। বেদাচার্য্য ভ্রাতুস্পুত্রদ্বয়কে ও দুর্গানাথকে বলিলেন, "আমি গৃহত্যাগী, সংসারাশ্রম আমার পক্ষে নিষিদ্ধ, তাই এই পূর্ব্ব পরিচিত বৃক্ষতলেই আসন গ্রহণ করিয়াছি। যে দুএকদিন এখানে থাকিব, এই বৃক্ষতলেই যাপন করিতে হইবে। গৃহে প্রবেশ করিব না। কেবল স্থান ত্যাগের সময়ে একবার বাড়ী গিয়া তোমাদিগকে দেখিয়া যাইব ও সেই প্রাচীন ভিটার ধূলিকণা মস্তকে লইব। এখন এখানে থাকাই ব্যবস্থা।"

গোলোকনাথ আচার্য্য দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া, গ্রাম ও গ্রামান্তরের প্রাচীন ব্যক্তিরা অপরাহ্ণ সময়ে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাশীধামে বেদাচার্য্যের প্রতিষ্ঠা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং সন্ধ্যার সময়ে প্রাচীনেরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, এমন ব্যক্তির আদর আপ্যায়নে, পরিচর্য্যা ও পর্য্যবেক্ষণে কোন ত্রুটি না হয়, সে বিষয়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সর্ব্বপ্রথম চারিজন লোককে রজনী যাপন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। তৎপরে তাঁহার আহারাদি ও বিশ্রামের উপযোগী শয্যাদির ব্যবস্থা করিলেন। অনেকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত

নিকটে বসিয়া নানাবিধ শাস্ত্রালাপ ও তত্ত্বকথায় সময় ক্ষয় করিলেন। এইরূপে বেদাচার্য্য সকলের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে প্রায় অর্দ্ধ যামিনী যাপন করিয়া, পরে বিশ্রামার্থে শয়ন করিলেন। যে চারিজন লোক তাঁহার নিকট রাত্রি যাপন করিবে, তাহারা আহারার্থে স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়াছে। অপর সকলে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলে পর, দীনবন্ধু ও জগবন্ধু উভয় ভ্রাতা বেদাচার্য্যের নিকট বসিয়া নিজেদের সাংসারিক সুখ দুঃখের কথা কহিতে কহিতে জ্যেষ্ঠ দীনবন্ধু আচার্য্যের অনুমতি লইয়া অন্নপূর্ণার কথা উত্থাপন করিলেন। এবং বলিলেন "পিতৃদেব স্বর্গারোহণের সময়ে গঙ্গাগর্ভে আমাকে অঙ্গীকার করাইয়া ছিলেন যে, তাঁহার মত আমিও অন্নপূর্ণার সংবাদ সংগ্রহে প্রাণপণ চেষ্টা করিব, কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় বলিয়া আমি এ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোন চেষ্টাই করিতে পারি নাই। বাবা নানা স্থানে যাতায়াত করিয়া, কত লোককে পত্রাদি লিখিয়া, অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বহুশ্রমকর অনুসন্ধানে কোন ফল লাভ হয় নাই বলিয়াও, আমার সেরূপ আগ্রহ জন্মে নাই। সত্য কথা এই যে, আমি পিতৃচরণে অঙ্গীকার করিলেও তদনুরূপ কিছুই করি নাই। কেবল কতকগুলি চিঠিপত্র ও দলিলাদি তাঁহার আদেশমত যত্নে রক্ষা করিতেছি, আশা এই যে, যদি কখন সে গুলির দ্বারা কোন উপকার হয়।"

বেদাচার্য্য বলিলেন "আজই সেই সব চিঠিপত্র একত্র করিয়া রাখিবে। কাল প্রাতঃকালে সেগুলি আমাকে দিবে, আমি একবার দেখিব, হয়ত তাহা হইতে কোন সংবাদ পাওয়া গেলেও যেতে পারে।" সহোদরদ্বয়ের কনিষ্ঠ জগবন্ধু প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ভাবে জ্যাঠা-মহাশয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন দেখিয়া, আচার্য্য বলিলেন "বৎস! তুমি কি কিছু জিজ্ঞাসা করিবে?" তিনি সপ্রতিভ

ভাবে "আজ্ঞে হ্যাঁ" বলিবামাত্র আচার্য্য বলিলেন "জিজ্ঞাসা কর ?" প্রশ্ন—"স্বপ্ন কি কখন সত্য হয় ?" আচার্য্য বলিলেন "স্বপ্ন সত্যের ছায়া লইয়া গঠিত, সেই জন্য প্রায় সেগুলি ছায়ামূলক চিন্তা মাত্র, কিন্তু কখন কখন সেই ছায়ামূলক চিন্তা সত্যে পরিণত হইয়া থাকে। বৎস! এখন এ কথা জিজ্ঞাসার কি কোন বিশেষ কারণ আছে ?" উত্তর "আজ্ঞে, আছে।" আচার্য্য বলিলেন "যদি থাকে তবে তাহাও বল।" উত্তর "গত পরশু রাত্রি শেষে আমি স্বপ্নে দেখেছিলুম যে আপনি দেশে আসিয়াছেন, আর অন্নপূর্ণা ও তাঁহার পুত্রের সন্ধান পাইয়াছেন, এ কথা আমি গতকল্য প্রাতঃকালে মাকে ও দাদাকে বলেছিলুম। ইহার প্রথমার্দ্ধ সফল হইয়াছে, শেষার্দ্ধের তথ্য জানিবার জন্য মনে বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে।" বেদাচার্য্য বলিলেন "বৎস তোমার মাকে বলগে, যে এক্ষেত্রে দৃষ্টস্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়াছে। অন্নপূর্ণা ও তাহার পুত্রের সংবাদ পাইয়াছি। কিন্তু উহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার মত অবস্থায় তাহারা এখনও আসে নাই। সে কাজ পরে হইলে হইতে পারে।" আনন্দে উভয় ভ্রাতার নয়ন আর্দ্র হইল। তাঁহারা জ্যেষ্ঠতাতের পদধূলি লইয়া ত্বরায় মাতৃদেবীকে সংবাদ দিবার জন্য গৃহে গমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

হল্‌দে খাতা

পরদিন প্রাতঃকালে দীনবন্ধু ও জগবন্ধু উভয় ভ্রাতা কতকগুলি কাগজ পত্র লইয়া পিতৃব্য সদনে উপস্থিত হইলেন। বেদাচার্য্য সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ করিলেন। সে সকলের মধ্যে মোক্ষদা নাম্নী এক অসামান্যা সুন্দরী যুবতীর পাগলিনীর বেশে বিচরণ সংবাদ লিখিত আছে, কিন্তু কেহই পত্রে এ কথা বলেন নাই যে এখানে আসিলে তাহাকে দেখিতে ও তাহার বিষয় জানিতে পারিবেন। সকল পত্রেই লেখা আছে, কিছুদিন পূর্ব্বে এইরূপ একটি স্ত্রীলোক এখানে ছিল, এখন নাই। কোন কোন পত্রে কেহ কেহ একটি শিশু ক্রোড়ে ঐরূপ স্ত্রীলোকের বিচরণ সংবাদ দিয়াছেন। কিন্তু কোন পত্রেই, গিয়া দেখিবার জন্য আহ্বান নাই। তথাপি বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া বেদাচার্য্যের কনিষ্ঠ সহোদর শিবনাথ নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য্যের কুটিল বুদ্ধিপ্রসূত দাবার চা'লে তাঁহার সকল চেষ্টা সর্ব্বদাই ব্যর্থ হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত তত্ত্ব ঐ সকল পত্রে পাওয়া যায়। আর একটা সংবাদ ঐ সকল পত্রের তারিখ হইতে জানা যায় যে, ঐ স্ত্রীলোক ২৪ পরগণার স্থান বিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখেই চলিয়াছে। কোথায় যে নিরুদ্দেশ হইল, তাহা আর কেহ ধরিতে বা বলিতে পারে নাই।

বেদাচার্য্যের প্রাতঃকালটি এই কার্য্যে কাটিয়া গেল। তিনি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃক্রিয়া ও স্নান পূজাদি সমাপন করিয়া আসন গ্রহণ করিয়া এ পর্য্যন্ত ইহার অধিক আর কিছুই সংগ্রহ করিতে

পারিলেন না। সামান্য একটু অবসাদ তাঁহার হৃদয়ে ছায়াপাত করিতেছে, এমন সময়ে দীনবন্ধু বলিলেন ঃ—"এই সকল লইয়া আসিবার সময়ে মা আমাদিগকে বলিলেন যে পিতৃদেবের গঙ্গাযাত্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে মায়ের হাতে একটা বাক্স দিয়া বলিয়া গিয়াছেন, যে এটা যেন দাদার সম্মুখে ভিন্ন খোলা না হয়। উহার চাবি নাই। ভাঙ্গিতে হইবে, কিন্তু সে কাজ দাদা ভিন্ন আর কেহ যেন না করেন। তাই ঐ বাক্স মা এতদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। এখন এখানে আসিবার সময় বলিয়া দিলেন যে ঐ বাক্স ভাঙ্গিবার ও ভাঙ্গিয়া দেখিবার জন্য আপনাকে একবার বাড়ীতে যাইতে হইবে। বাবার আদেশ যে মায়ের সম্মুখে আপনি বাক্স গ্রহণ করিয়া আপনার ইচ্ছামত কাজ করিবেন।

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—"বাক্সটি কোথা হইতে কিরূপ অবস্থায় তোমার বাবার হস্তগত হইয়াছিল। ছোট বৌমা সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই? দীনবন্ধু বলিলেন "আজ্ঞে না।" আচার্য্য পুনরপি বলিলেন ঃ—

"বাড়ী যাও, মাকে জিজ্ঞাসা কর, শিবনাথের লিখিত কোন স্বতন্ত্র পত্রাদি তাঁহার নিকট আছে কি না? যদি থাকে তবে লইয়া এস।"

দীনবন্ধু জগবন্ধুকে সংবাদ আনিবার জন্য প্রেরণ করিয়া নিজে সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে জগবন্ধু এক মোড়ক হস্তে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মায়ের নিকট এই মোড়কটি ছিল। বোধ হয় ইহাতে কিছু কাগজ পত্র আছে। এগুলিও বাবা মাকে দিয়া সাবধানে রাখিতে বলিয়াছিলেন।

আচার্য্য মোড়ক খুলিয়া একটি বহু বিস্তৃত বিবরণ পূর্ণ একখানি হল্‌দে কাগজের খাতা দেখিতে পাইলেন। হল্‌দে খাতার সার মর্ম্ম ঃ—

"জামাতা দক্ষিণারঞ্জন তমলুকে চাকরি করিতেন। পিতা মাতার

লোকান্তর গমন নিবন্ধন গৃহে অন্নপূর্ণার থাকার সুব্যবস্থার অভাবে তাহাকে কর্ম্মস্থলে লইয়া গিয়াছিলেন। সন্তান সম্ভাবনা সন্দেহে অন্নপূর্ণাকে রাখিয়া যাইবার জন্য দক্ষিণা নৌকাযোগে তমলুক হইতে গৃহে আসিবার সময় পথে ঝড়বৃষ্টি নিবন্ধন নৌকা ডুবি হয়। সেই দুর্ব্বিপাকে জামাতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নদীতে নৌকা ডুবির সময়ে কয়েজন ধীবর অন্নপূর্ণার চুলের গোছা ধরিয়া অর্দ্ধচেতন অবস্থায় জল হইতে নৌকায় উঠাইয়া ছিল। অন্নপূর্ণা নিজ নৌকার মাঝিমাল্লা ও ধীবরদের হাতে পায়ে ধরিয়া স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্য কাঁদাকাটি করায় তাহারা দক্ষিণাকে উঠাইবার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টার ফলে অন্নপূর্ণার একটি বাক্স নদীগর্ভ হইতে তাহারা উঠাইয়াছিল। দক্ষিণারঞ্জন পুলিশের দারোগা ছিলেন। ছয়মাস পূর্ব্বে তিনি ২৪ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলে থানার দারোগা ছিলেন। সুতরাং ঐ অঞ্চলের পুলিশ ও স্থানীয় লোক তাঁহাকে চিনিত, জানিত ও সজ্জন বলিয়া সম্মান করিত। তাই এ সময়ে অন্নপূর্ণার বিপদে তাহারা সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া থানার লোকও তথায় উপস্থিত হওয়াতে অন্নপূর্ণা নিরাপদে শ্বশুরালয়ে প্রেরিত হইয়াছিল। অন্নপূর্ণা স্বামী-সঙ্গচ্যুত হইয়া একাকিনী যখন শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হয়, তখন সে তিনমাসকাল সম্ভাবিতপুত্রা। দক্ষিণারঞ্জন এই সন্তান সম্ভাবনা সংবাদ শ্বশুরালয়ে তৎপূর্ব্বেই পাঠাইয়াছিলেন। সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দীনবন্ধুর গর্ভধারিণী দানবন্ধুর দ্বারা কন্যাকে পিতৃগৃহে প্রেরণের জন্য যে পত্র লিখাইয়া ছিলেন, সে পত্র বোধ হয় নদীগর্ভে দক্ষিণার সঙ্গে সঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

পুলিশ অন্নপূর্ণাকে শ্বশুরালয়ে পৌঁছাইয়া দিলে পর, আমি শঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিকট কন্যা পিতৃগৃহে আনয়নের প্রস্তাব করায় শঙ্কর তখন

আমায় শিষ্ট ব্যবহার ও মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া অন্নপূর্ণাকে শ্বশুরালয়েই রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। দক্ষিণার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাধা হইবার পর, আমার গৃহিণী পুনরায় পুত্র পাঠাইয়া কন্যাকে আনিতে চাহিলে, শঙ্কর ও তদীয় পত্নী রুক্ষভাবে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাহার অল্প কয়েকদিন পরেই শঙ্করের গূঢ় দুরভিসন্ধির তাৎপর্য্য হাটে বাজারে চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। সঙ্গে সঙ্গে চারি পাঁচ মাস সন্তান সম্ভাবনা কালে অন্নপূর্ণা স্বামীঘাতিনী কুলটা এবং স্বামীর মৃত্যু হইতে না হইতে পরপুরুষানুগতা বলিয়া প্রচারিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না! শঙ্কর তাহাকে গোপনে বাড়ী হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছে, ইহাই জানিতে পারা গেল। এই নিরপরাধিনী বালিকার প্রতি শঙ্করের ন্যায় পদস্থ ব্যক্তির নিদারুণ নির্ম্মম ব্যবহার স্মরণ করিলে, মনুষ্য সমাজকে দস্যু দানবের আলয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিশেষতঃ কয়েকশত বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি ও সামান্য একটু তালুকের অপর অর্দ্ধাংশ, নিজ পুত্রগণের ভোগের সহজ পথ করিবার জন্য, শঙ্কর শাস্ত্রজ্ঞ ও জনসমাজে সম্মানিত ব্যক্তি হইয়াও এরূপ হীন, নীচ ও ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিল, ইহা যখন চিন্তা করি, তখন মনুষ্য নামে পরিচিত হইয়া জনসমাজে বাস ও নরকভোগ উভয়ই তুল্যমূল্য বলিয়া মনে হয়। ভগবান কবে যে এ নরকরূপ সমাজ হইতে উদ্ধার করিবেন, তাহারই জন্য ব্যাকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছি, আর নিয়ত মনে হইতেছে, দাদা এমন সংসার ও এমন সমাজসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া বনবাসে গিয়া উত্তম কাজই করিয়াছেন, এরূপ মানব সমাজ অপেক্ষা বনের পশুসমাজ ও শত গুণে শত সহস্রগুণে প্রেয় ও শ্রেয়। দুঃখ এই যে, আমি তাঁহার কনিষ্ঠ বলিয়া আমাকে এই নিদারুণ নিষ্পেষণ সহ্য করিবার জন্য সংসারে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যার পরিরক্ষণ ও প্রতিপালন ভার এই হতভাগ্যের মাথায় চাপাইয়া নিশ্চিন্ত আছেন। ইহাই আমার

মর্ম্মবেদনার উপরের জ্বালাময় আবরণ। আজ তিনি থাকিলে, আমাকে এতটা যন্ত্রণা একাকী ভোগ করিতে হইত না।"

বেদাচার্য্য সেই দীর্ঘ বিবরণের মধ্যস্থলে আত্মহারা হইয়া দরদর ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে খাতাখানি রাখিয়া দিলেন, এবং বলিলেন "আর পারি না। এ যাতনা অসহ্য। আমার বনবাস ও ধর্ম্মকর্ম্ম, সকলই পণ্ডশ্রম। এমন সোণার সহোদর মনস্তাপে পুড়িয়া পুড়িয়া তুষানলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, আর আমি ইহার হৃদয়ের শান্তি বিধানে কোন চেষ্টাই করি নাই, কেবল শেষ মুহূর্ত্তে একবার গঙ্গার ঘাটে চোখের দেখা দেখিয়া শান্তি অনুভব করিয়াছিলাম। এখন উপায় কি?"

ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া ও হৃদয় মনের মর্ম্মান্তিক আবেগ সম্বরণ করিয়া আচার্য্য পুনরায় পত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন:—"দক্ষিণার শ্রাদ্ধের দিন আমি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত সময়টা শঙ্করের আলয়ে ছিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে অন্নপূর্ণা আমাকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া, নিজ পরিণাম স্মরণ করিয়া অনেক চক্ষের জল ফেলিল। অনেক ক্লেশ ও মনস্তাপের কথা বলিল, আরও বলিল, সেখানে আর এক মুহূর্ত্ত থাকিতে ইচ্ছা নাই, আরও বলিল, গহণাপত্রগুলি হাত করিবার জন্য কর্ত্তা এখন হইতে ফাঁদ পাতিতেছেন। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কিছু লইবার চেষ্টায় ছিলেন, শেষে গিন্নীর তিরস্কারে সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। কাকা! তুমি আজই এই বাক্সটা লইয়া যাও। এখন কাহাকেও কিছু বলিও না, গোপনে তোমার কাছে, না হয়, খুড়ীর কাছে রাখিয়া দিবে। তার পর আমি বাড়ী গিয়া বাক্স লইব! সেই অবধি বাক্সটি আমার নিকট থাকিয়া গিয়াছে। ঐ বাক্স যেমন পাইয়াছিলাম তেমনি রাখিয়া দিয়াছি।

অন্নপূর্ণার সন্ধানের পূর্ব্বে আমার লোকান্তর গমন ঘটিলে, এ বাক্সটি যাঁহার হাতে পড়িবে, তিনি যেন ধর্ম্মভয়ে ইহা অন্নপূর্ণার জন্য রাখিয়া দেন! ইহার চাবি অন্নপূর্ণার নিকট আছে!" শিবনাথ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অন্নপূর্ণার আগমনে

সন ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাসের ২রা তারিখে কাশীধামে বেদাচার্য্যের আশ্রমে শিষ্যমণ্ডলীর প্রধান, পণ্ডিত ধর্ম্মানন্দের নামে এক পত্র আসিল। পত্র পাঠে জানা গেল, আচার্য্য তীর্থ পর্য্যটনান্তে জন্মভূমি দর্শনে গিয়াছেন। আর পত্রপাঠ, কাল বিলম্ব না করিয়া কন্যা অন্নপূর্ণাকে সঙ্গে লইয়া পণ্ডিতকে স্বয়ং সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। বলা বাহুল্য বেদাচার্য্য ঐরূপ আর একখানি পত্র হরিনাথকে লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লেখা ছিল, আপনি যদি কাশী আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই পত্র আপনার হস্তগত হইবা মাত্র বালক চিত্তরঞ্জনকে এখানে প্রদত্ত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। আর যদি আপনার পক্ষে পুনরায় ক্লেশ স্বীকার করিয়া এত দূর আসা সম্ভব হয়, তবে প্রস্তাবিত পাত্রী ও তাহার মাতাকে সঙ্গে লইয়া আপনিও বালকের সহযাত্রী হইতে পারেন। সেরূপ অবস্থায় বিবাহাদি কার্য্য এই খানেই সম্পন্ন হইবে!

পত্রার্থ অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার হৃদয়ে গভীর বিষাদের ঘন ছায়াপাত হইল। সেখানে পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়, উভয় কুলের আত্মীয় স্বজন; খুড়শ্বশুরের অত্যাচার ও নির্ম্মম ব্যবহারের ব্যাপার এক এক করিয়া অন্নপূর্ণাকে অভিভূত করিল। যাইবেন কি না, সে বিষয়ে মতামত দিবার অধিকার তাঁহার নাই, কারণ ইহা পিতৃ-আদেশ। দারুণ দুঃখভার হৃদয়ে চাপিয়া পিতৃ-আদেশ পালনে অগ্রসর হইলেন।

বেদাচার্য্য তৎপূর্ব্বে গ্রামের প্রধানগণকে ডাকাইয়া অন্নপূর্ণাকে গৃহে আনাইবার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করেন। আর তাহার সম্বন্ধে

যতটুকু জানিতে পারিয়াছেন, তাহাও ব্যক্ত করেন। সহোদর শিবনাথের লিখিত খাতাখানি তাঁহাদিগকে শুনাইয়া, পরে তাহার পুত্রের পিতৃসম্বন্ধ নিরাকরণ জন্যই তাহাকে এখানে আনায় প্রয়োজন হইয়াছে। তাহাকে এখানে আনিলে, কোথায় রাখা হইবে, ইহাই স্থির করিবার জন্য বেদাচার্য্য বন্ধুমণ্ডলীর অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন।

কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে অন্নপূর্ণার প্রতি ভট্টাচার্য্যের নিরতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার স্মরণ করিয়া অনেকেই নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, এবং সে সময়ে শিবনাথের পক্ষ হইয়া অনেকেই গভীর পরিতাপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই সে সময়ে শঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই! এখন সকলেই একমত হইয়া বলিলেন "কেন অন্নপূর্ণা আসিয়া শ্বশুরবাড়ীতে, খুড়শ্বাশুড়ীর নিকট অবস্থিতি করিলেই ভাল হয়, কারণ তাহার পুত্র যখন বর্ত্তমান, তখন আপনার সে কন্যার শ্বশুরবাড়ীর উপর সম্পূর্ণ দাবী আছে। বিনা কারণে সে অধিকার ত্যাগ করিবার কোন কারণ দেখি না। তবে তাহার শ্বশুরবাড়ীর সকলে বিশেষ কারণ দেখাইয়া গৃহে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিলে, তখন সে বিষয় বিবেচনা করা যাইবে।" বেদাচার্য্য এই মীমাংসা গ্রহণ করিয়াও বলিলেন, "আপত্তি থাকিলে, তাহা খণ্ডন করাইয়া পরে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইলে ভাল হয় না?" গ্রামের লোকেরা আপত্তি খণ্ডন কথাটা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। বেদাচার্য্য বলিলেন "শঙ্কর ধর্ম্মবিগর্হিত কাজ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ উভয়ের চক্ষে পতিত হইলেও, তাঁহার পরিজনদিগকে সহজে নির্য্যাতনের অবস্থায় নিক্ষেপ করা কি ভাল? ধর, যদি অন্নপূর্ণার পুত্রের পিতৃ-পরিচয় সন্তোষজনক রূপে প্রতিষ্ঠিত না হয়? আমি সন্ন্যাসী, আমার কন্যাকে ধর্ম্মার্থে আমার আশ্রমে স্থান দিতে পারি, কিন্তু সমাজধর্ম্ম

হিসাবে সমাজে যখন স্থান দিবার নিয়ম নাই, তখন পরম শত্রুকেও এরূপ ভাবে সমাজের চক্ষে বিপন্ন করা বিধেয় নহে।"

কেহ কেহ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিয়া বসিলেন "আপনি অদ্ভুত লোক, তাহারা আপনার সর্ব্বনাশ করিল, আর আপনি তাদের সমাজ-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ব্যস্ত কেন?. কত ঘরে কত অনাচার গোপনে পার পাইয়া যায়, আপনি ত সে সকলের খবর রাখেন না। তারা যেমন অন্যায় করিয়াছে, তেমনি এখন ঘরের বৌ ঘরে নিয়ে তার মান রক্ষা করুক।" বেদাচার্য্য বলিলেন, "সহজ উপায় থাকৃতে এতটা অত্যাচারপরায়ণ হইবার কি প্রয়োজন?" দুর্গানাথ বলিলেন, "যদি সহজ উপায় থাকে, তবে তাহাই কর। আমাদের আপত্তি নাই।" বেদাচার্য্য বলিলেন, "অন্নপূর্ণা আসিয়া আমার নিকট অপেক্ষা করিবে। তাহার পর সকলের সকল সংশয় দূর হইলে, তাহাকে তাহার পিতৃভবনে বা শ্বশুরগৃহে যেখানে ইচ্ছা পাঠাইয়া দিলে ভাল হয় না?"

দুর্গানাথ নীরব, অপর কেহ কেহ বলিলেন, "সে, গৃহ ও গ্রাম হইতে তাড়িত হইয়া যেমন অবস্থায় পড়ুক না কেন, কিন্তু গ্রামে আসিয়া শ্বশুরবাড়ী ও বাপের বাড়ী থাকৃতে গাছতলায় বাস করিবে কেন? তাই যদি হয়, তবে আপনি এখান হইতে এখনই বিদায় হউন। আমরা এ দৌরাত্ম্য সহ্য করিব না।" দুর্গানাথ বলিলেন, "অন্নপূর্ণা, ব্যক্তি হিসাবে বন্ধু-কন্যা, সমাজ হিসাবে প্রতিবেশী-কন্যা ও ওদের বাড়ীর বৌ, আমার বাড়ীতে আমার গৃহিণীর নিকট তাহাকে উঠাইতে কি কিছু আপত্তি আছে? আমি তাহাকে আমার বাড়ীতে উঠাইব। কেহ সে জন্য আমাকে কিছু বলিবেন না।" দীনবন্ধু ও জগবন্ধু একবারে বলিয়া বসিলেন, "বাড়ী থাকৃতে অন্যত্র সে কেন উঠিবে? তাকে বাড়ীতে উঠাইয়া বিপদে পড়িতে হয়, আমরা পড়্‌বো। সে আমাদের বোন্। শ্বশুর বাড়ীর লোক আপত্তি করে, করুক, আমরা কেন কর্‌বো?"

বেদাচার্য্য বলিলেন, "বৎস! শান্ত হও, আমিই ব্যবস্থা করিব। কন্যার পক্ষে পিত্রালয় ও শ্বশুরগৃহ দুই সমান। দুর্গানাথের প্রস্তাবই সঙ্গত, তাঁহার গৃহে আমার কন্যা উঠিলে, কোন প্রকার সামাজিক দোষ হইবে না, আর আমাদের দেশে এই সমাজ-জ্ঞান লোপ পাওয়াতে কতশত নিরপরাধিনী স্ত্রীলোককে আশ্রয়চ্যুত হইয়া ইতর জীবন যাপন করিতে হইতেছে, সমগ্র সমাজ মৃত হস্তিবৎ অচল শয়নে শায়িত, এ অবস্থা হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার লোক নাই, ইহাই দুঃখ।"

অন্নপূর্ণা কাশী হইতে যাত্রার তৃতীয় দিবসে দ্বিপ্রহরের পর আড়াই প্রহরের মধ্যে জন্মভূমির সীমানায় পদার্পণ করিলেন। বেদাচার্য্যের নিযুক্ত লোক অন্নপূর্ণাকে একবারে পিতৃসমীপে উপস্থিত করিল, সে সময়ে সেখানে গ্রামের প্রবীণরা কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মানন্দ ও অন্নপূর্ণা আচার্য্যের পাদ বন্দনা করিতে না করিতে, স্থানটা লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। আচার্য্য অন্নপূর্ণাকে গুরুজনদিগকে প্রণাম করিতে বলিলেন, ও এক এক করিয়া পরিচয় করিয়া দিতে লাগিলেন। নানা ভাবের পরস্পর মিশ্রণে অন্নপূর্ণার মন নিতান্তই অবসন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে পিতৃসান্নিধ্যে একটু সবল বোধ করিয়া অতিকষ্টে পিতৃ আদেশ পালন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে দীনবন্ধুর ইঙ্গিতে জগবন্ধু গোপনে ছুটিয়া গিয়া অন্নপূর্ণার পৌছান সংবাদ মাতৃদেবীকে দিবা মাত্র তিনিও লজ্জাভয় অতিক্রম করিয়া ভাশুরঝিকে দেখিতে আসিলেন। অন্নপূর্ণার বাক্সটিও সঙ্গে আনিলেন। বেদাচার্য্যের আসা অবধি তিনি ঠাকুর পুকুরে স্নান করা ও পানীয় জল লওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আর পারিলেন না। অবগুণ্ঠিতা ভাদ্রবধূ আসিয়া আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া অন্নপূর্ণাকে ক্রোড়ে লইতে না লইতে, অন্নপূর্ণার মুখ হইতে অস্ফুটস্বরে "খুড়ীমা" শব্দটি বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণা বাক্শক্তিহীন ও অবসন্ন হইয়া সেই

মাতৃ-ক্রোড়ে শয়ন করিলেন। আচার্য্যের পরিচর্য্যায় কন্যা ত্বরায় সুস্থতা বোধ করিতে না করিতে, দুর্গানাথ বলিলেন, "একবারে আমার বাড়ীতে উঠাইলেই ভাল হইত। এত জনতার মধ্যে মেয়ে আনা ভাল হইল না।" আচার্য্য বলিলেন, "এখনই তোমার বাড়ীতে যাইবে। একটা কাজ এখনই শেষ করিয়া লইব। এই কথা বলিয়া আচার্য্য কন্যাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকট তোমার কোন পুরাতন বাক্সের চাবি আছে? কন্যা সভয়ে ও বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে পিতার দিকে তাকাইয়া ক্ষীণ স্বরে বলিলেন "হ্যাঁ ছিল।"

বে। হ্যাঁ ছিল কি? এখন নাই?

অ। অনেক কাল ধরিয়া দিনে রেতে একটা চাবির স্বপ্ন দেখিতাম বলিয়া আমার স্মরণ হইতেছে, কিন্তু এখন আর সে স্বপ্নও দেখি না!

বেদাচার্য্যের মূর্ত্তি স্থির ও গম্ভীর, একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে সহসা কৃষ্ণনগরের উকিলবাবু কুমারনাথের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দৃষ্টিপাত মাত্র কুমারনাথ সভয়ে অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিলেন।

বে। কি বৎস! এখানে কেন?

কু। আজ্ঞা, আপনি আসিয়াছেন, সংবাদ পাইয়া আপনার চরণ দর্শন ও আপনার আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য আসিয়াছি।

বে। আমার কন্যার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কিছু করিয়াছিলে কি?

কু। আমি এ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারি নাই, এখন আপনার অনুমতি হইলে, বোধহয় আমি কিছু করিলেও করিতে পারি।

বে। কি করিতে পার?

কু। ওকালতি আমার ব্যবসায়, আমার মনে হইতেছে, আমার শ্বশুরালয়ে অনুসন্ধান করিলে, আপনার কন্যার করচ্যুত কুঞ্জির কিনারা হইলে হইতে পারে। আদেশ দিলে আমি অনুসন্ধান করিতে যাই।

বে। অনুসন্ধান কর।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চাননের পরিচয়ে

কুমারনাথ পঞ্চাননকে সঙ্গে লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। ত্বরায় শ্বাশুড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "দেখুন, আচার্য্যের প্রীতি বৃদ্ধির, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শুভদৃষ্টি ও আশীর্ব্বাদ লাভের এক উপায় উপস্থিত! দেখুন দেখি, আপনার ঘরে কোন পুরাতন হাতবাক্সের চাবি আছে কি না? আমার বিশ্বাস আপনার ঘরে খোঁজ করিলে একটা চাবি পাওয়া যাইবে।

পঞ্চানন সকলই জানিত, এতক্ষণ মায়ের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবে না বলিয়া চুপ করিয়া ছিল। এখন মাকে বলিল, "তুমি কি কোন চাবির সন্ধান জান, আর জানিলে, তাহার কি খোঁজ করিতে এবং পাইলে তাহা দিতে সম্মত আছ?"

গৃহিণী বলিলেন, "বৌএর বাক্সটা খুজিয়া না পাইয়া কর্ত্তা একটা চাবি তাঁহার নিজের বাক্সে রাখিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি বাক্সটা পাও, তাহা হইলে ঐ চাবি বাহির করিবে, নতুবা উহা আর বাহির করিও না। যেমন আছে, তেমনি পড়িয়া থাকিবে। এখন তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সুখের বিষয় পঞ্চানন সে চাবিটি পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার বাক্স হইতে বাহির করিয়া নিজের স্ত্রীর নিকট রাখিয়া দিয়া বলিয়াছিল, "এটা খুব সাবধানে রাখিবে। সময়ে কাজে লাগিতে পারে, এই চাবির সাহায্যে এক সময়ে কিছু অলঙ্কার ও টাকা পাইলেও পাইতে পার।" এখন সে, সে চাবিটার সংবাদ দিতে অনিচ্ছুক, কারণ কৃপণের ধনের ন্যায় সে তাহা দীর্ঘকাল গোপনে রাখিয়াছিল। আজ

দেখিল, বেদাচার্য্যের কোপানলে পড়িলে, পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির মূল শিকড়ে টান পড়িবে, তাই ভয়ে ভয়ে মাকে বলিল "তুমি কি সে চাবি চাও?" মা বলিলেন, "তোমার জানা থাকে ত এখনই দাও। সম্ভ্রম হানি যতদূর হবার তা হ'য়েছে, আর বেশীদূর না গড়ায়।"

কুমারনাথ চাবি লইয়া পঞ্চাননের সঙ্গে বেদাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম পুরঃসর চাবিটি পায়ের নিকট রাখিয়া দিলেন। বেদাচার্য্য প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে কুমারনাথকে বলিলেন "তোমার অঙ্গীকার পালন করা হইল। আমি সর্ব্বান্তকরণে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি সুস্থ শরীর মনে দীর্ঘ জীবন যাপন কর।"

কুমারনাথের মনের উপর বিশমণ বোঝা চাপান ছিল, আজ যেন কে পদ্মহস্ত বুলাইয়া সে গুরুভার হরণ করিল! কুমারনাথ আপনাকে সবল ও সুস্থ বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন!

অন্নপূর্ণা দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বপ্নেদৃষ্ট চাবিটির এরূপ অভাবনীয় উপায়ে উদ্ধার সাধন দেখিয়া, স্মৃতিপটে অঙ্কিত প্রাচীন কাহিনীর স্মরণে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে,দেবর পঞ্চাননের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে, তুমি তোমার পিতৃ আদেশে দস্যুর ন্যায় আমার ঘুন্‌সি হইতে ঐ চাবি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছিলে। আজ তোমার ও তোমার পিতার সেই কুকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত কর। তোমার বাবার আর তোমার চক্রান্তে আমি পাগলিনী, পথের ভিখারিণী, জাতি বিচার না করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে লোকের উচ্ছৃষ্ট ভক্ষণ করিয়াও মরি নাই, আজ অনুভব করিতেছি, বেশ বুঝিতেছি, বিধাতা তোমার ও তোমার বাবার প্রেতাত্মার প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্যই আমার এই ঘৃণিত জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। আজ আমার স্মরণ হইতেছে, তুমি ও তোমার বাবা আমাকে কুকুরের মত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে—স্থান হইতে স্থানান্তরে, চালান দিবার ও সেই সূত্রে আমাকে সংসার হইতে মুছিয়া ফেলিবার শত শত চেষ্টা করিয়াও

যে শেষ করিতে পার নাই, সে আমার পুণ্যফল নহে, সে তোমাদের পাপের ফল ভোগের জন্য। নরাধমের পুত্র নরাধম! আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, তোমার মুখ দর্শন করিলেও পাপ হয়, তোমার প্রতি দয়া দৃষ্টি করিলেও পাপ হয়। সংসারের পরপারে কোন লোকেই তোমার স্থান হইবে না। নরক তোমার বাবাকে গ্রহণ করিতে ভয় পাইয়াছে, আর তোমাকেও গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে না। পাষণ্ড নরাধম! তোমার বাবা স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থাদাতা, বেদাচার্য্যের কন্যা, তোমার জ্যেষ্ঠতাতের পুত্রবধূ, তোমার শাস্ত্রজ্ঞ বাবার সেই ব্যবস্থার ফলে কুলটা? স্বামীর শ্রাদ্ধ-বাসরে গর্ভাবাস পুত্রের জারজত্ব প্রচার করিয়া, আমার আত্মীয় স্বজনের অজ্ঞাতসারে আমার প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলি? পেটের ছেলেটাকে নষ্ট করিবার জন্য কত না চেষ্টা করিয়াছিস্, শেষে তাহা না পারিয়া, তাহাকে—সেই এক বৎসরের দুদের ছেলেকে, পথে ঘাটে মাঠে নিরাশ্রয় পাইয়া, তাহার একমাত্র আশ্রয় ও সঙ্গ, তাহার মাতৃক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলি। কেন লইয়াছিলি? মারিয়া ফেলিবার জন্য? সুবর্ণপুরের চাড়ুর্য্যেরা বলপূর্ব্বক তোর নিকট হইতে আমার বাছাকে কাড়িয়া না লইলে, তুই ত তাহাকে শেষ করিতিস্? জানি না, তাহার পর, তাহার আর কোন বিপদ ঘটাইতে পারিয়াছিস্ কি না? আমার বাছা! আমার সোণার চাঁদ! সংসারে দুটা পয়সার জন্য তুই না করিতে পারিস, এমন কর্ম্ম নাই। তুমি দূর হও, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। আমি সাধু ও ধর্ম্মাত্মা পিতার কন্যা, আমি এই কুড়ি বৎসর সীতার ন্যায় নির্ব্বাসনে জলে কুমীর কুমার নাথের কবল ও বনে ব্যাঘ্র বৈদ্যনাথের বাসে আত্মরক্ষা করিয়াছি, সত্য মিথ্যা তোর উকিল ভগ্নীপতিই তার সাক্ষ্য দিবে। তোর ঐ পায়ের তলায় যে ধূলিরাশি সংলগ্ন, সেই সকলের এক কণার পরিমাণ ধর্ম্মজ্ঞান যদি তোর অন্তরে থাকে, তবে তুই তুষানলে আত্মহত্যার ব্যবস্থা কর, আর না হয়, কুষ্টিয়ার কুলিডিপোর

বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তীর চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাকে এই খানে আনিয়া আমার দীর্ঘ আট বৎসর তাহার গৃহে বাস ও তাহার শতবিধ সাধনা ও যত্ন চেষ্টার ফলেও আমার নারীধর্ম্ম অপহৃত হয় নাই; তাহা প্রমাণ কর। সে ব্যক্তি কতশত স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কিন্তু জানি না, কোন্ পুণ্যফলে আমি তাহার হাতে নিস্তার পাইয়াছি। তাহার গৃহে পরিচারিকা সাজিয়া, তার বাড়ীতে তাকে পোষ মানাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছি। তাহার অনুসন্ধান ও তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ তোর দীর্ঘ পাপানুষ্ঠানের যৎকিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত; তাহাই তোকে করিতে হইবে। তবে আমি জলস্পর্শ করিয়া জীবন রক্ষা করিব, নতুবা সীতা যেমন রাম সমীপে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া জগতের চির সমাদরের পাত্রী হইয়াছেন, আমিও আজ পিতৃসমীপে এ জীবন বিসর্জ্জন দিয়া তোদের অত্যাচারজাত যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার লাভ করিব!" কুমারনাথ অধোবদনে উপবিষ্ট, পঞ্চানন মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে, অন্নপূর্ণা আবার বলিলেন "কুমারনাথ আমার কড়া কাথায় বল প্রয়োগে উদ্যত হইলে, আমি নারীর লজ্জা নিবারণ মধুসূদনকে স্মরণ করিয়াছিলাম। তাহারই ফলে পিতৃশিষ্য সন্ন্যাসী আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিও আজ এখানে উপস্থিত! আর ব্যাঘ্র বৈদ্যনাথকে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষায় সক্ষম হইয়াছিলাম। আমার বাবার পায়ে হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা কর, যে তুই বৈদ্যনাথকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, আমার বাবার সম্মুখে আর এই সকল সজ্জনের সম্মুখে আমার পাতিব্রত্যের বা সতীত্বের সাক্ষ্য দান করিবি। এই অঙ্গীকার করিলেই তোকে অব্যাহতি দিব, নতুবা বেদাচার্য্যের কন্যা মনঃক্ষোভে আজ যে অভিসম্পাত করিবে, সে সাধ্বী হইলে, তাহাই ফলিয়া যাইবে। এখনও স্বীকার কর। পঞ্চানন আর কালবিলম্ব না করিয়া, মরা মানুষের মত অন্নপূর্ণার পদতলে গড়াইয়া পড়িতে যাইতেছে দেখিয়া, অন্নপূর্ণা

বলিলেন, "তুই আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস না। আমাকে উলঙ্গপ্রায় করিয়া ঘুন্‌সি ছিঁড়িয়া চাবি কাড়িয়া লইয়াছিলি, সেই নরকের হাতে আমার পায়ের ধুলা উঠিতে পারে না। তোর হাতের চেয়ে আমার পায়ের ধুলার মূল্য অধিক। পঞ্চানন নিরাশ হইয়া অবসন্ন হৃদয়ে বেদাচার্য্যের পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মা ও ছেলেতে

বেদাচার্য্যের নিযুক্ত অপর দুই ব্যক্তির একজন মালতী ও তাহার মাকে বেদাচার্য্যের গৃহে লইয়া গিয়াছে। অপর জন হরিনাথ ও চিত্তরঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া বহু লোকের জনতা অতিক্রম করিয়া যখন বেদাচার্য্যের সমীপে উপস্থিত করিল, ঠিক সেই সময়ে পঞ্চানন বেদাচার্য্যের চরণতলে পড়িয়া মার্জ্জনা চাহিতেছে। চিত্তরঞ্জন আসিয়া মাতামহের পাদ স্পর্শ করিতে না করিতে, আচার্য্য বলিলেন "বৎস! ঐ তোমার মাতৃদেবী! প্রণাম কর, দেখদেখি কুষ্টিয়াতে বৈদ্যনাথের গৃহে মোক্ষদা নাম্নী পরিচারিকাকে দেখেছিলে, ইনিই তিনি কি না?"

চিত্তরঞ্জন বিস্ময়াভিভূত ভাবে একবার তাকাইয়াই বলিল, "তুমিই আমার মা। তাই জীবনপণ করিয়া, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, দিবারাত্রি আমার রোগ শয্যার শিয়রে বসিয়া আমায় বাঁচাইয়াছিলে? তুমিই আমার মা! তাই আমাকে বিদায় দিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে আত্মহত্যার আয়োজন করেছিলে? তুমিই আমার মা? তুমিই

আমার মা? তুমিই আমার মা!' আজ এই মহামূল্য মাতৃসম্ভাষণে মাতোয়ারা হইয়া বিংশতি বর্ষীয় যুবক একবারে মাকে গিয়া জড়াইয়া ধরিল! এ সংসারে সর্ব্বদা যাহা ঘটে না, লাখের মধ্যে কেন, অসংখ্য কোটী ঘটনার মধ্যে যাহা সহজে ঘটে না, আজ ঠাকুর পুকুরের মাঠে বেদাচার্য্যের চরণতলে আচার্য্য-কন্যা নীরবে স্নেহের ধন—সাত রাজার ধন মাণিক, মহামূল্য রত্ন বক্ষে চাপিয়া ধরিতে ধরিতে পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা জননীর মাতৃভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছেন; যেন বৎসরেক বয়স্ক শিশু সন্তানের—সেই কাড়িয়া লইবার পূর্ব্ববর্ত্তী, অবস্থা অনুভব করিয়া বালকের কমলমুখে ঘন ঘন চুম্বন দিতেছেন, আর আপনার নয়ন-নীরে বালকের উভয় গণ্ড প্লাবিত করিতেছেন। অন্নপূর্ণা আজ প্রৌঢ়া যুবতীর লজ্জা শরম বিস্মৃত হইয়া, বালিকা মাতার ন্যায়, আপন পুত্র ক্রোড়ে লইয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন, সকলেই দেখিল, আচার্য্য ইঙ্গিতে দুর্গানাথকে দেখাইলেন, অন্নপূর্ণার বক্ষে ক্ষীর সঞ্চার হইয়াছে। দুগ্ধ ক্ষরণে বক্ষবস্ত্র আর্দ্র হইয়াছে, ক্রমে সে সুধা ধারায় পরিণত হইতে দেখিয়া, সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছে। অন্নপূর্ণা পুত্র ক্রেড়ে পাইয়া আজ লজ্জা, ভয়, সংযম সকলই ভুলিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য, অধীরা কন্যাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য বলিলেন, "মা! শান্ত হও, সবই ত পাইলে, যাহা চাহিয়াছিলে, তাহা ত পাইলে, এখন শান্ত ভাব অবলম্বন কর।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "বাবা, কিসে শান্ত হব? শান্ত হ'তে এখন বিলম্ব আছে, আজ কুড়ি বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া হৃদয়ে দাবানল জ্বলিতেছে, এই পাষণ্ড আর ইহার বাপ, আমার নির্ম্মল হৃদয়টাকে অসহায় পাইয়া মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছিল, আজ তোমার স্নেহ দৃষ্টির ফলে ও আশীর্ব্বাদের বলে, এই সবে মাত্র সান্ত্বনা ও শান্তির সূচনা—এক কথায়

কি জুড়াইবে? বলিতে বলিতে এতক্ষণ পরে অন্নপূর্ণার দৃষ্টি নিজ ক্ষরিত বক্ষের উপর নিপতিত হইবামাত্র সহসা স্তম্ভিত, লজ্জিত ও পরে কুণ্ঠিত হইয়া শান্ত ভাব ধারণ করিলেন।

তৎপরে চিত্তরঞ্জন পঞ্চাননের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাইয়া ক্ষণকাল পরে বলিল, "তুমি এখানে কেন?" বিপন্ন পঞ্চানন নীরব। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তুমি ও পাষণ্ডকে চেন?" আচার্য্য বলিলেন, "উনি তোমার খুল্লতাত, তোমার পিতার খুল্লভ্রাতা।" "তাই বটে, সেই জন্য চা বাগানে তোমাকে দেখে অবধি, সর্ব্বদাই তোমাকে আপানার জন ভাবিতে ইচ্ছা হইত।" অন্নপূর্ণা পুনরায় শান্ত ভাব ত্যাগ করিয়া উত্তেজনা সহকারে বলিলেন, "ঐ নরাধমকে তোমার ভাল বাসিতে ইচ্ছা হইত? ঐ ত আমার সর্ব্বনাশের মূল, ঐ ত তোমাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টায় ছিল। ও আপনার জন! হা ভগবান!" চিত্তরঞ্জন বলিল, "উনি আমাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টায় ছিলেন, সে কথা কেবল আমি আর বেল সাহেব ছাড়া আর কেউ জানে না। মা! তুমি কেমন করে জান্‌লে?" অন্নপূর্ণা বলিলেন "বেল সাহেব জানেন কি কথা? মেরে ফেলবার কথা?" চিত্তরঞ্জন বলিল "থাক্‌ ও কথায় আর কাজ নাই?"

অপরাহ্ন কাল সমুপস্থিত দেখিয়া বেদাচার্য্য বলিলেন "এখন যে কাজটুকু বাকি আছে, সেটুকু সম্পন্ন করিয়া, পরে অনেক নূতন কাজের কথা ভাবিতে ও অনেক কাজের সূত্রপাত করিতে হইবে।" এই বলিয়া চাবিটি দুর্গানাথের হাতে দিয়া বলিলেন, "কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এই বাক্সের চাবি বন্ধ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেহ খুলে নাই। এখন গ্রামের প্রধান তুমি নিজের হাতে সর্ব্ব সমক্ষে বাক্সটি খুলিয়া ফেল। প্রবীন প্রাচীন ও গ্রামের প্রধান দুর্গানাথ ন্যায়রত্ন কম্পিত হস্তে বাক্স খুলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দীর্ঘ কাল ব্যবহারাভাবে, মরিচা ধরিয়া আছে বলিয়া, খুলিতে বেগ পাইতে হইল। অনেক তেল খরচ করিয়া

অনেক কষ্টে বাক্সটি খোলা হইল। কতক গুলি অলঙ্কার বাক্সে রহিয়াছে। দীনবন্ধুর মা, দুর্গানাথকে, পুত্রের দ্বারা ঐ সকল গহনার মধ্যে যে গুলি অন্নপূর্ণার বিবাহের সময়ে নিজেরা দিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া দিলেন। অপর গুলি তাহার শ্বশুরালয়ের দেওয়া। গহনাগুলি উঠাইতে বাক্সের তলায় কতকগুলি টাকা ও চিঠিপত্র পাওয়া গেল। সে গুলি দুর্গানাথ সযত্নে বাহির করিলেন। পত্র গুলির অধিকাংশের উপর শিরোনামা লিখিত। ঐ সকল পত্রের মধ্যে একখানি পত্রের পাঠ ও হস্তাক্ষর দেখিয়া দুর্গানাথ বলিলেন, "এখানা শঙ্কর নাথের লেখা। পাঠ হইতে বুঝাযায় গুরুজনের লেখা, আর হাতের লেখা দেখে শঙ্করেরই বলিয়া বোধ হইতেছে।" আচার্য্য বলিলেন "ঐ পত্র খানাই আগে পড়। পাত্র পাঠ :—

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

শুভাশিষসন্তু

তুমি পঞ্চাননের মারফত তাহার গর্ভধারিণীর নিকট বধূমাতার সন্তান সম্ভাবনার সংবাদ পাঠাইয়াছ। সে সংবাদে আমরা সকলেই যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। তিনি বধূমাতাকে এখানে আনার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আর এরূপ অবস্থায় বধূমাতার একাকী বিদেশবাস কোন মতেই সঙ্গত নহে, অতএব আমাদের সকলের অনুরোধ যে সুবিধামত দুই চারি দিনের বিদায় লইয়া বৌমাকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইবে। অত্রপত্রে এ বাটীর সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল জানিবে। ইতি তারিখ ২২ চৈত্র সন ১৩৫৩ সাল।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীশঙ্করনাথ শর্ম্মা।

সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের লিখিত পত্রও পাওয়া গেল। সে পত্র :—

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্!

পরম কল্যাণবরেষু—

বাবা দক্ষিণা, তুমি দীনবন্ধুর মারফত তোমার খুল্লশ্বাশুড়ীর নিকট যে সংবাদ পাঠাইয়াছ, তাহাতে বাড়ীর সকলেই অতিমাত্র আনন্দ সহকারে অন্নপূর্ণার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সন্তানসম্ভাবনা কালে কন্যার বিদেশবাস কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। ঈদৃশ অবস্থায় কন্যার পিত্রালয়েই নিরাপদে বাস করিবার কথা, সুতরাং তুমি নিজে আসিয়া অন্নপূর্ণাকে এখানে রাখিয়া গেলে ভাল হয়। তোমার আসা অসম্ভব হইলে, সংবাদ দিবামাত্র দীনবন্ধু গিয়া অন্নপূর্ণাকে বাড়ী আনিবে। এ বাটীর কুশল জানিবে। ইতি তারিখ ১৭ চৈত্র সন ১৩৫৩ সাল।

একান্ত শুভার্থী
শ্রীশিবনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

বেদাচার্য্য বলিলেন, "আর কিছুই জানিবার বাকি রহিল না। এখন এই কন্যাকে তোমাদের যে বাড়ীতে ইচ্ছা পাঠাও।" ভট্টাচার্য্য-পুত্র পঞ্চানন মাতৃআদেশ জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "বৌদিদি আমাদেরই বাড়ীতে যাইবেন"। এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভট্টাচার্য্য গৃহিণীর সুবিবেচনার জন্য সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নির্ব্বাসিত হওয়ার কুড়িটি বৎসর পরে অন্নপূর্ণা পুনরায় শ্বশুর বাড়ীতে পদার্পণ করিবেন।

উপসংহার

পঞ্চানন পরিচয়ে কাকা, এই সংবাদ অবগত হইয়া, চিত্তরঞ্জন এখন মাতৃশত্রু পঞ্চাননকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে, এবং বেল সাহেবের সাহায্যে পাছে আবার সেই পুরাতন ব্যাপারের নূতন অভিনয় সূচিত হয়, এই ভয়ে পঞ্চানন ব্যাকুল হইয়া পড়িল ও কাতর দৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ চিত্তরঞ্জনের দিকে তাকাইতে লাগিল। চিত্তরঞ্জন পঞ্চাননের কাতর দৃষ্টিপাতের তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া বলিল "একদিন তোমাকে আপনার জন মনে করিয়া ভালবাসিতে গিয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলাম, আজ আবার তোমাকে আমার শৈশবশত্রু ও মাতৃমর্য্যাদা হরণপরায়ণ জানিয়া হৃদয়ে অবিমিশ্র ঘৃণার সঞ্চার হইলেও, আমি তোমাকে একবার যখন ভাল বাসিয়াছিলাম; তখন তোমাকে ক্ষমাই করিব, আর তোমার প্রতি পূর্ব্বভাব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব।" এই উদার ভাবের আশাবাণী শুনিয়া পঞ্চানন চিত্তরঞ্জনের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে যাইতেছিল। চিত্তরঞ্জন সাবধান হইবামাত্র পঞ্চানন চিত্তরঞ্জনকে কোলে তুলিয়া, বক্ষে ধরিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে ক্ষমা চাহিয়া বারবার বলিল "বাবা আমায় ক্ষমা কর, আমি না বুঝিয়া নরাধমের মত কাজ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর।"

পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে হরিনাথ, মালতী ও মালতীর মাকে দীনবন্ধুদের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থায় অনুমতি দিয়া, বেদাচার্য্যের সদনে উপস্থিত হইয়া নমস্[illegible]ন্তে আসন গ্রহণ করিয়াছেন ও সঙ্গে সঙ্গে বেদাচার্য্য কর্ত্তৃক গ্রামের প্র[illegible]র সহিত পরিচিত হইয়াছেন। বেদাচার্য্য হরিনাথের ও তদীয় পরিজনের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, পরে অন্নপূর্ণাকে

তাঁহার শ্বশুরালয়ে যাইবার জন্য অনুমতি করিবামাত্র, কন্যা পিতাকে বলিলেন," আপনার আদেশ পালন করিব, কিন্তু আপনার বিচারে এ গ্রামে ইহাদের বাড়ী অপেক্ষা কি আর কোন উত্তম স্থান নাই ?" বেদাচার্য্য বলিলেন "মা, যদি এ অবস্থায় শ্বশুরালয়ে যাইতে আপত্তি থাকে, তবে তুমি তোমার পিতৃবন্ধুদের যে কোন বাড়ীতে অবস্থিতি করিতে পার ;" দুর্গানাথকে দেখাইয়া বলিলেন "ইঁহাকে চিনিতে পার ত ? ইনি আমার বড় ভায়ের মত, ইনি সম্পর্কে তোমার জ্যাঠামহাশয়, ইচ্ছা করিলে, ইহার গৃহে তোমার জ্যাঠাইমায়ের নিকট কয়েক দিনের জন্য বাস করিতে পার। তাহার পর আমার সঙ্গে পুনরায় কাশী যাত্রা করিবে।"

পঞ্চানন ভ্রাতৃজায়াকে বলিল "বড় বৌদিদি, মা তোমাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন !" উত্তরে অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তাঁকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবে, যে তিনি যেন নিজে জ্যাঠামশাইদের বাড়ী আসিয়া আমাকে লইয়া যান, তবেই যাইব। তোমার সঙ্গে যাইব না।" চিত্তরঞ্জনও মাতৃ আদেশে মায়ের সঙ্গে দুর্গানাথের গৃহে গমন করিল। দুর্গানাথ, অন্নপূর্ণা ও তদীয় পুত্র সঙ্গে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। বেদাচার্য্যের আদেশে দীনবন্ধু ও জগবন্ধু বৃদ্ধ হরিনাথকে সঙ্গে লইয়া গৃহে গমন করিলেন ও ত্বরায় তাঁহার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হইলেন। উভয় ভ্রাতার মাতৃদেবী ও অন্যান্য পরিজনেরা মালতীর মায়ের ও মালতীর পথক্লান্তি নিবারণে ও বিশ্রামের ব্যবস্থায় পূর্ব্বেই নিযুক্ত হইয়াছেন। পুরমহিলারা মালতীর মায়ের পরিচয়ে জানিতে পারিলেন যে তিনি ঐ অঞ্চলেরই মেয়ে। বড়ায় বাপের বাড়ী ও শ্যামনগরে শ্বশুরবাড়ী। তিনি ঘোষালবাড়ীর কন্যা ও গাঙ্গুলীবাড়ীর বধূ। মালতীকে দেখিয়া বাড়ীর সকলেই মোহিত হইয়াছেন ! চিত্তরঞ্জনের সৌম্য সুন্দর মূর্ত্তির পার্শ্বে এই সৌন্দর্য্যের তরঙ্গতুফান এই লাবণ্যের বিজলীলীলা মানাবে ভাল, এইরূপ ধারণা

গৃহ হইতে গৃহান্তরে, ক্রমে পল্লী হইতে গ্রামান্তরে প্রচারিত হইতে বহু বিলম্ব হইল না। গ্রাম ও গ্রামান্তরের মেয়েরা, এই সংবাদে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, দলে দলে ক'নে দেখিতে আসিতে লাগিল। ফল এই হইল, দীনবন্ধুদের বাড়ীতে সর্ব্বদাই দলে দলে মহিলাগণের পদার্পণ হইতে লাগিল।

মালতীই মালতীর মায়ের প্রথম ও শেষ সন্তান! মালতীর মা সময়ে সন্তান লাভে বঞ্চিতা ছিলেন বলিয়া প্রথম সন্তান সাগর-সঙ্গমে দান করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কন্যা হইলে, সূতিকাগারে কন্যার প্রাণ সংশয় হইয়াছিল। বারাকপুরের ঠাকুরবাড়ীর পল্লীতে যে চিকিৎসক সূতিকাগারে ঐ কন্যার চিকিৎসা করিয়াছিলেন তিনি বাসুদেবপুর-নিবাসী। সেখানে কর্ম্মসূত্রে অবস্থিতি করিতেন। জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য ও তদীয় পত্নীর সে সময়ের সংস্কার জড়িত ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবল আস্থা ছিল। তাই জগন্নাথ পত্নী লইয়া সাগরে গিয়াছিলেন। রাজাদেশ উপেক্ষা করিয়া গোপনে কন্যা সমুদ্রজলে ভাসাইয়াছিলেন। কিন্তু জলেশ্বর সে অপূর্ব্ব রত্ন গ্রহণ করিয়া পরে তাহার মাকে ফিরাইয়া দেন। শেষে লোকে রাষ্ট্র হয়, যে এটি পরের মেয়ে। কিন্তু আজ বৃদ্ধ ডাক্তার গোবিন্দ বাবু কন্যাটির পিতৃমাতৃ পরিচয় বিষয়ে পূর্ব্ব প্রমাণ নিবন্ধন সাক্ষ্য দেওয়ায় সকল গোল মিটিয়া গেল। প্রমাণ এই যে ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কন্যার নাসিকার অগ্রভাগে, একটি কৃষ্ণবর্ণ তিল, সূতিকাগারে মশা বলিয়া ডাক্তার বাবুর ভ্রম জন্মাইয়াছিল। আজও মালতীর সুগঠিত নাসাগ্রভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র মক্ষিকাবৎ তিলটি বিরাজ করিতেছে! আর আজ সেই বিকৃতি মালতীর সুকৃতির চিহ্নে পরিণত হইয়া তাহার কোমল কমনীয় মুখের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। যে দেখে, সেই বলে "কি সুন্দর?"

বৈশাখের অষ্টম দিবসে কালীঘাটের গঙ্গাতীরে চিত্তরঞ্জনের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইল। ইত্যবসরে শঙ্কর ভট্টাচার্য্যের গৃহিণীর অত্যধিক

বিনয় সৌজন্যের পীড়নে পীড়িত ও তাঁহার অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া অন্নপূর্ণা পুত্রসহ শ্বশুরালয়ে গমন ও তথায় বাস করিতে বাধ্য হইলেন। বৈশাখের অষ্টাদশ দিবসে মাতৃ আদেশে পঞ্চানন বরকর্ত্তারূপে বর ও বরযাত্রী লইয়া আচার্য্য গৃহে উপস্থিত হইলে পর, শুভলগ্নে শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। মালতীর মা খুল্লতাতের পৌরহিত্যে অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে, তাঁহার সংসার জীবনের পরম সম্পদ কন্যারত্ন পরের ছেলের হাতে তুলিয়া দিলেন। বিবাহান্তে উত্তেজনাপূর্ণ উপবাসে ক্লান্ত ও বিষাদভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি শয়ন করিলেন। অন্নপূর্ণা পূর্ব্বেই পিতৃ আদেশে পিতৃভবনে পুত্রের বিবাহ দেখিতে আসিয়াছিলেন। নিজের অলঙ্কারগুলি ভাঙ্গিয়া তাহার দ্বারা নূতন ধরণের অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়াছেন। বিবাহান্তে বধূকে ক্রোড়ে লইয়া সেই অলঙ্কারগুলি পরাইতেছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন, বধূর মাতা অবসন্ন শরীরে শয়ন করিয়াছেন। ত্বরিতপদে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, পিতা স্বয়ং পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। বেদাচার্য্য বলিলেন "এখানে সকলের সমবেত হইবার প্রয়োজন নাই। যে যার কাজে মনোযোগ দিন, আমি ইহাকে ত্বরায় সুস্থ করিয়া তুলিতেছি।" বহু গুরুজনের উপস্থিতিভয়ে মালতী তখন আর মাতৃদর্শনের সুযোগ পাইল না। সকলে বরক'নে নিয়ে বাসরঘরে প্রবেশ করিলেন।

সম্পূর্ণ

বহু-চিত্র-শোভিত

৪র্থ সংস্করণ বিদ্যাসাগর-জীবনী। মূল্য ৩৲ টাকা।

(বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্য)

প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মন্তব্য।

Extract taken from Dr. Rabindra Nath Tagore's letter :—Babu Chandi Charan Banerjee has done a valuable service to Bengali Literature by writing an excellent and exhaustive Biography of the late Pundit Iswara Chandra Vidyasagara.

Extract from Dr. Brajendra Nath Sil M, A. Ph. D's. letter :—"Babu Chandi Charan Banerjee's contributions to Bengali literature as a biographer, a novelist and an essayist have gained for him a well meritted recognition in the ranks of Bengali men of letters * * his life of Vidyasagara a standard biographical work, which presents a living portrait of that great personality and exercises a healthy influence on rising Bengali youth."

And from another letter of Doctor Sil. "It may be fairly claimed, that what Boswell was to the great English Doctor, this biographer has been to our Vidyasagara."

বিদ্যাসাগর-সুহৃৎ সুপ্রবীণ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মন্তব্য :—তোমার প্রণীত জীবনচরিতের বিশেষ গুণ এই দেখি যে, ইহাতে এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের সংবাদ লওয়া হইয়াছে, যাহাতে চরিত-নায়কের নিগূঢ়প্রকৃতি বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ অন্য কোন বাঙ্গালা জীবনচরিতে দেখিতে পাই না।"

শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাইট মহোদয় লিখিয়াছেন :—"গ্রন্থখানি সর্ব্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য্য এবং আলোচনার গভীরতা উভয় গুণই ইহাতে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

৺ রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের মন্তব্য :—"আপনার 'বিদ্যাসাগর' অতি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে। আপনি তাঁহাকে চরিতালেখ্যে চিত্রিত করিয়া বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা সাহিত্য উভয়েরই গৌরব বৰ্দ্ধন করিয়াছেন। "আপনার গ্রন্থ বিষয়ের গৌরবে, বিষয়-বিন্যাসের পারিপাট্যে অতি মূল্যবান বস্তু, (ভাষা) উদ্দীপনায় আনন্দপ্রদ এবং রসপূর্ণ।"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন :—"তুমি যথেষ্ট পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-সহকারে এই মহৎ কার্য্যটী সম্পন্ন করাতে আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি।

R. C. Dutt Esq. C. S. C. I. E. "You have performed a great task with a great amount of industry and I hope your labours will be appreciated by our countrymen."

সংবাদপত্রের অভিমত।

Administration Report, Bengal Govt for 1895-96 Biography—one at least makes an approach towards a European standard :—Vidyasagar by Babu Chandy Charan Banerjea is a very readable biography of the late Pandit Iswar Chandra Vidyasagar showing an intimate acquaintance with the details of the various movements :—religious, social and educational in which that eminent philanthropist took part.

"বস্তুতঃ বস্‌ওয়েল্‌ না থাকিলে জন্‌সনের প্রকৃত চিত্র আমরা দেখিতে পাইতাম না, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গের আদর্শ পুরুষ বিদ্যাসাগরকে চিনিবার ও জানিবার উপায় করিয়া দিয়া বঙ্গবাসী জনসাধারণকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। * * যে প্রণালীতে চণ্ডী বাবু এই জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা বঙ্গদেশে নূতন, এমন রীতিক্রমে বিন্যস্ত সুবিস্তৃত সুন্দর জীবনবৃত্তান্ত বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থকারের উদ্যোগ, যত্ন, পরিশ্রম ও অনুশীলনশক্তি অসাধারণ। তিনি এই পুস্তকপ্রণয়ন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন সন্দেহ নাই।"—**হিতবাদী**।

নব্যভারত।—তাঁহার এই কাজের জন্য আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি। এই পুণ্যসরসীতে নিমগ্ন করিতে তিনিই আমাদিগের প্রধান সহায়। তাঁহার নাম অক্ষয় হউক।

বামাবোধিনী—বিদ্যাসাগরের জীবনের সকল বিভাগের ঘটনাবলী অতি সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম, গবেষণা, সহৃদয়তা ও দেশহিতৈষিতা সহকারে গ্রন্থকার পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে ইহা অতিশয় হৃদ্য হইয়াছে।

সাধারণের হিতার্থে বিদ্যাসারের দুঃখ-কাতর হৃদয়খানি কিরূপ উন্মুখ ছিল, গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাহার বিশদ আভাস পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি মনোজ্ঞ হইয়াছে। **ভারতী**,

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যতগুলি জীবনী আছে, তাহার মধ্যে ইহাই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ যাচনদারেরা যাচাই করিয়া বহুপূর্ব্বেই রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক গৃহে গৃহে ধর্ম্মগ্রন্থের মত পঠিত হইবার উপযুক্ত। **প্রবাসী**।

স্থন্দর-চিত্র-শোভিত।

সামাজিক উপন্যাস কমলকুমার ২য়, সং, মূল্য ১।॰ পাঁচ সিকা।

সংবাদ-পত্রের অভিমত।

The Amrita Bazar Patrica says :—KAMAL KUMAR a novel by Babu Chandi Charan Banerjee. Babu Chandi Charan Banerjee is the author of the life of Vidyasagar which has become one of the standard biographies in Bengali. As a novelist he is not unknown to fame,—his "Manoramar Griha" and the "Two Pictures" having been very favourably received by the Bengali reading Public. The present volume fully sustains his reputation as a novelist. much tact is shown in handling the character of Beelasini a kind of *demi* monde whom love raises to the full dignity of a woman. We have derived much pleasure from a perusal of the novel and we recommend it to all lovers of Bengali fiction.

The Unity and The Minister :—He has, indeed, wonderfully succeeded in depicting some of the beautiful pictures, both good and bad, of the Bengali village life in their true colours. We have read this novel with profit and pleasure. It is a first class book in the department of fiction.

নব্যভারতঃ—কমলকুমার, সামাজিক উপন্যাস, চণ্ডীবাবু বিদ্যাসাগরের জীবনীকার। সে জীবনী বিদ্যাসাগরের জীবনের উপযুক্ত জীবনী। কি ঘটনার সমাবেশ, কি ভাষার মধুরতা, উৎসাহ ও গবেষণা, বিচক্ষণতা ও লিপিকৌশল উপযুক্ত ধাতুর প্রকৃষ্ট সংযোগে বিদ্যাসাগর-চরিত অল্প সময়ে বঙ্গসাহিত্যে উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে এবং চণ্ডীবাবু ধন্য হইয়াছেন।

ভবানীপতির চরিত্র সাত্ত্বিক হিন্দু চরিত্র, নিষ্কাম পরোপকারী হিতব্রত সাধু চরিত্র। আর কোন বিখ্যাত আখ্যায়িকাকার চিত্রিত করিলে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইত কি না সন্দেহ। বিলাসিনীর নামটী ভাল হয় নাই! সে সংযমে তপস্বিনী, যে প্রেমে পিশাচকে দেবতা করে, বিলাসিনী তাহার আদর্শ। ভবানীপতির চিত্র বিদ্যাসাগর চরিত্রকারের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, এ মহা চিত্র হিন্দুর আদরের ধন।

হিতবাদী :—এখানি উপন্যাস। ইহাতে পল্লীগ্রামের ও প্রাচীন কালের কয়েকটী সুন্দর দৃশ্য এরূপ সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে, পাঠ করিলে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

বসুমতী :—চণ্ডীবাবু বিদ্যাসাগর লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসাদি সুনীতি ও সুরুচিবর্দ্ধক। কমল-কুমারে তাঁহার সুনাম আরও বাড়িয়াছে।

সঞ্জীবনী :—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত কমলকুমার পাঠ করিয়া আমরা বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছি। মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের বিস্তৃত জীবনবৃত্ত লিখিয়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কমলকুমার বঙ্গভাষায় একখানি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস, যে তিনটী গুণে এই পুস্তকখানি এত মনোহর হইয়াছে তাহা এই :—

(১) পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশের পল্লীগ্রামে ইংরেজী শিক্ষার যখন বিশেষ প্রচলন হয় নাই, সেই সময়ের উচ্চ শ্রেণীর নিষ্ঠাবান্ বাঙ্গালী হিন্দুগার্হস্থ্য জীবনের অতি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষণকারী চিত্র এই গ্রন্থে অঙ্কিত হইয়াছে। গার্হস্থ্য ও সামাজিক উপন্যাসে হিন্দুজীবনের এমন অটুট চিত্র প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

(২) দ্বিতীয় গুণ এই যে ইহা পড়িতে পড়িতে ফুরাইয়া গেল

বলিয়া ক্ষোভ হয়। একখানি উপন্যাসের পক্ষে ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। পুস্তক যতই পড়িতেছি, নায়ক নায়িকার চরিত্রের সৌন্দর্য্য ততই ফুটিয়া উঠিতেছে।

(৩) এই গ্রন্থের তৃতীয় বা প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে প্রেমের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। যে প্রেম অশাসিত উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি বিপথগামী যুবা-পুরুষকেও পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে, যেরূপ প্রেম চণ্ডালকে ব্রাহ্মণত্ব দান করিয়া, অবলাকে বীরত্ব দান করিয়া, মহাজ্ঞানীর জ্ঞানগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিতে পারে, সেইরূপ প্রেমের মহিমা প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থের উপসংহার হইয়াছে। কমলকুমারের মত উপন্যাস আদরের বস্তু সন্দেহ নাই।

নায়ক :—"পল্লী সমাজেই হিন্দুর বিশিষ্টতা, কমলকুমারে পুরাতন হিন্দু পল্লীসমাজের একটি আলেখ্য কনক লেখায় লিখিত হইয়াছে। কমলকুমারের ভাষা ভাল, চরিত্রবিন্যাস সুন্দর, গল্পের উন্মেষভঙ্গী অতি মধুর।

মনোরমার গৃহ

মনোরমার গৃহ সম্বন্ধে ৺কালাপ্রসন্ন ঘোষ রায় বাহাদুর মহাশয়ের মন্তব্য "মনোরমার গৃহ প্রকৃতই অতি মনোরম পুস্তক হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :— মনোরমার গৃহ পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য অতি সাধু ভাষা সুমিষ্ট ও ভাবগুলি অধিকাংশ স্থলেই উন্নত ও হৃদয়গ্রাহী।

"An excellent moral preceptor"—*Indian Mirror.*

"Has fairly succeded in bringing out an ideal."—*Hope.*

"আমরা গ্রন্থখানি পড়িয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। ভাষা প্রাঞ্জল ও মনোহর। তিনি বেশ মিষ্ট করিয়া গল্প বলিতে পারেন। আমারা বঙ্গীয় মহিলাগণকে এই পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করি।"—সাহিত্য।

আমোদ জন্মাইবার জন্য অনেকেই উপন্যাস লিখিয়া থাকেন, কিন্তু মানুষ জন্মাইবার জন্য ত কাহাকেও উপন্যাস লিখিতে দেখি না। * * * আশা করি, বঙ্গগৃহগুলি শরৎচন্দ্র ও মনোরমার মত স্বামী, স্ত্রী, ও বসন্তকুমারের মত পুত্রের দ্বারা সুশোভিত হইবে।"—সঞ্জীবনী।

"আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। চণ্ডীবাবুর ভাষা পরিষ্কার, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল।"—হিতবাদী।

দুখানি ছবি

দুখানি ছবি সম্বন্ধেঃ—"বস্তুত পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। এরূপ পুস্তক যত অধিক প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল।'—সময়।

"Beautiful little novel."—*Hope.*

"বিধবা প্রেমমালাকে তিনি দেবী করিয়াছেন।"—সঞ্জীবনী।

"ইহাতে বিধবা প্রেমমালার ব্রহ্মচর্য্যের যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছে তাহা সুন্দর।— বামাবোধিনী"

"প্রেমমালাকে স্বভাবআদর্শ ভাবে গ্রহণ করিলে বঙ্গসমাজের যথেষ্ট উপকার হয়।"—ভারতী।

মা ও ছেলে

মা ও ছেলে সম্বন্ধেঃ—স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন:—"আপনার মা ও ছেলে নামক পুস্তক দুভাগ পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। এইরূপ গ্রন্থ যত সমাদৃত হইবে ততই মঙ্গলের বিষয়।"

Late Babu Chandra Nath Bose M. A. wrote. "I am therefore of opinion that books like yours ought to have a preferential clain upon the attention of all who officially or otherwise are engaged or interested in the works of Hindu education in Bengal."